সৃষ্টি রহস্য ভেদ

'মা-মহাজ্ঞান'

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স/৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট/কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র ১৩৭০

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯

প্রচ্ছদ
গৌতম রায়

মুদ্রাকর
মৃণালকান্তি রায়
৩৮ সি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলকাতা ৯

"যারা ভেদাভেদ জ্ঞান না করে বিচারক হয়ে উপলব্ধি করতে চাইবে, এই সৃষ্টি রহস্য ভেদ তাদেরই জন্য।" —'মা-মহাজ্ঞান'

উপক্রমণিকা

"সৃষ্টি রহস্য ভেদ" প্রসঙ্গ, বলা বাহুল্য, কোন সহজ-বোধ্য আলোচ্য-বিষয় নয়। অসংখ্য জটিল জিজ্ঞাসায় কোন সুপণ্ডিত বা মহাসাধকেও সার সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বিশেষ চিন্তিত হবেন। শিক্ষার ধারায় কিছু বুঝে তেমন ভরসা না পেলে হয়তো বা মনে হবে, যত মীমাংসা অবশ্যই যোগ সাধনায় সিদ্ধি-লব্ধ প্রাপ্ত-ফল। যথার্থ বটে এমন মনোভাব। হ্যাঁ, কি যে অসাধ্য সাধনের পথ ধরে ধীরে ধৈর্যে 'মা-মহাজ্ঞান' সমস্ত রহস্যের কিনারা করতে পেরেছেন, সে পড়ে বুঝবার বা বলে বোঝাবার নয়। যে যার অন্তরে অন্তরঙ্গ হয়ে ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর মহাভাব বুঝে নেওয়া চাই। সবই সময় সাপেক্ষ। দীর্ঘ বিশ বাইশ বছর কেন, সাধক গোষ্ঠীর যুগ যুগের নিগূঢ় সাধনাও কি আদৌ স্পর্ধা ধবে, তাঁর বিচার-বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম করে সার-সূক্ষ্মতা উপলব্ধির প্রশ্নে। সাধনার সাধ্যে—আমরা যত আদা-ব্যাপারী; সাধনের অধিকারী—তিনি অনন্য-দিশারী। 'সাধন' সে যে শতগুণ গুরুত্ব ধরে সাধনার মান বুঝে।

'মা-মহাজ্ঞান' একাধারে শত ঝামেলার ফেরে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা যথার্থ গৃহী, আবার সত্যাশ্রয়ী আদর্শ সন্ন্যাসীও একজন বটে। তাঁর সংসার ও সাধনার নিগূঢ় সমন্বয় নিত্য শ্রীক্ষেত্রে ও মন্দিরে দাঁড়িয়ে একান্ত হৃদয়ে অনুভবের বিষয়। অসংখ্য গুলি সুতোর গিঁট খুলে ধারায় ধারায় পর পর সব লম্বা মেলে ধরেছেন তিনি। তাই না তাঁর 'সজ্ঞান সমাধি'—কথা-গান বিষয়-বিচার ইত্যাদি অদ্বিতীয় সাধনারই স্বাক্ষর। সমন্বয় সূত্রে শ্রীমণ্ডিত অনন্য প্রতিভা তাঁর, দেশ কালের সকল সীমা ছাড়িয়ে যায়। সাধারণ অসাধারণ সর্বস্তরে 'মা-মহাজ্ঞান' অবদান তাই পরম বিস্ময়কর।

সংসারে খুঁটিনাটির ফেরে কত কথাই'তো বয়ে যায়! কে আর

তার হিসাব রাখে! তবে কষে দেখলে যে কেউ আপনাকে বুঝে পাবে। বুঝবে বৈ কি, তত্ত্বের জন্ম হয় কত না সাধারণ তথ্যের কোলে! আদৌ যে-সব গতিবিধি গ্রাহ্য করার মত নয়, কি ভাবে সবার অলক্ষ্যে নিয়ত তা 'মা-মহাজ্ঞান' সমীক্ষায় অংশ নিয়ে, অপরিহার্য বিষয়-বস্তু বলে পরিগণিত হয়েছে! সেই সব ক্ষুদ্র তুচ্ছ তিল তিল করে মূল্যায়ন হয়েছে। দিনে দিনে মান পেয়ে দিয়েছে তা অসাধারণ বিচার বিধান। সেই সূত্রে সুবিশাল ফলশ্রুতির কথা কল্পনায় আনা যায় না।

সংসারে ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে যা, তাই দেখেছি দর্শনের দুর্গম দূরত্ব অতিক্রমে। যেমন সহজ লৌকিক জগতে কোন সমস্যার মোকাবিলায়, তেমন স্বাভাবিক পারলৌকিক সমাধান দানে। প্রশ্ন করে সামান্য উষ্ণ হওয়ার অবকাশ না দেন কখনো 'মা-মহাজ্ঞান'। এ ভাবে কে তাঁর মুখে মুখে উত্তর জোগান! কেউ তো কোথাও নেই। তিনি যে বলেন! তাহলে?

শুধু কি পুণ্য তিনি প্রবন্ধ উপন্যাস কথায় গানে, তাঁয় ধন্য মানি প্রতিটি অধ্যায়ের নামকরণে। নিবেদন করে কখনো কোন কাল গুনতে হয় না। এখানেও পর পর দিয়ে গেছেন ছ'টি অধ্যায়ের ধার ধরিয়ে। 'ভূত-ভগবান' হয়তো বা মনে হবে তেমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নয়, কিন্তু কেউ কি অস্বীকার করতে পারবে, 'অনন্ত আবিষ্কার', 'বিস্ময়-বিচার' বা 'সবের সমাধান শান্তিময়' নাম?

যা তিনি খুঁজে বুঝে পেয়েছেন, তাই তিনি খুলে মেলে ধরেছেন সবার সমুখে। নিঃসঙ্কোচে নির্দ্বিধায়! কেউই যখন তাঁর সে সব কথায় কোনরকম গ্রাহ্য করে নি, তখনো তিনি যে নিষ্ঠা নিয়ে আলোচনার সময় ও শ্রম গুনেছেন, পরে দেখেছি, বহু বিদগ্ধ পরিবৃত হয়ে, তাঁর সেই একই রূপ। সংসারে পতি-সেবা পুত্র-পরিচর্যায়, পূর্বে যে ধারায় তাঁকে দেখেছি আত্মনিয়োগ করতে, আজও তাঁর সেই একই পরিচয়। এই যত বৈশিষ্ট্যই যা কিছু দুজ্ঞের্য় রহস্যের কিনারা করতে পেরেছে।

যত যাবতীয় ঘিরে তাই তাঁর কথা বলার অন্ত নেই। সে সবের

মর্মোদ্ধার আবার তিনি না করলে নয়। কার গর্ভে এখন কে লুকিয়ে আছে কে জানে। কারণ 'মা' মূলতই যে রত্নগর্ভা। উপলব্ধি তাঁর প্রথম সন্তান। অবিচ্ছেদ্য সেখানে অদ্বিতীয় প্রতিভা।

●

মায়ের বলার বিরাম নেই। প্রতিটি বাক্যই অর্থপূর্ণ—যথার্থ যুক্তি-বহন করে। লোকশিক্ষার খাতিরে অবশ্য প্রায়ই তিনি বাধ্য হয়েছেন, প্রশ্ন ছেড়ে প্রসঙ্গান্তরে যেতে। হলে হবে কি, অপূর্ব ধারায় অলক্ষ্যে কেমন যেন একটা সুসঙ্গতি আজো নিত্য টানা হয়ে যায়। বিচার কোন এক-কথার-কথা নয়। বিস্তারিত বয়ে যায় নানা-মানা-প্রসঙ্গ প্রশ্ন পরম্পরায়। কখনো বা গড়িয়ে গিয়ে প্রসঙ্গান্তরে, তিনি সহজেই প্রমাণ করেন, তাঁর আলো ও আলোচনায় কোন প্রভেদ নেই।

সংসারে কাজের কথাই কত! এক একটা বিষয় শুরু হয় বটে, কিন্তু শেষ হতে চায় না। এ অবশ্য খুবই স্বাভাবিক। পৃথিবীর গোড়ার কথাই সমস্যা। যেখানে গতি সেখানে সহসা অমাবস্যা নেমে আসে। খানিক সামলে উঠলে দেখা দেয় 'দ্বিতীয়ার চাঁদ যেন কাস্তা সরু'। তাই বলে পূর্ণিমা কখনো নয়। আর উষায় দিগন্তে সূর্যোদয় সে তো একেবারেই অবান্তর চিন্তা।

অজ্ঞতার গর্ভে আকাঙ্ক্ষা। জ্ঞানের ঔরস্ পেয়ে থাকলে আশা রূপান্তরিত হয়। আদর্শের বয়ান মেনে ধাপে ধাপে উঠে যায় শূন্যতার শিখরে। সৃষ্টির সকল রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় তাঁর কাছে। তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল 'মা-মহাজ্ঞান' প্রণীত এই অনবদ্য সৃষ্টি। এখানে প্রতি ছত্রে তাঁর নিগূঢ় উপলব্ধি স্ব-মহিমায় সমুজ্জ্বল।

জীবন মাত্রেই সমস্যা জড়িত, সমাধান মেলে কৈ! দেবেই বা কে? ক্ষমতা তো মানুষের এই। শান্তি চায় সকলেই। হায় ভ্রান্তি না ঘুচে। আপন শক্তিতে ভর করে চিরস্থায়ী সুস্থ বন্দোবস্ত বুঝে নেওয়া রীতিমত সময় ও সাধনা সাপেক্ষ। সর্বত্র গোড়ায় গলদ—সহ্য ধৈর্য ত্যাগ তিতিক্ষা আমাদের একেবারেই নেই।

সত্য লাভ—সে তো বহুদূরের কথা। আর আদি সত্য? সে তো

কল্পনার সুদূর অতীত। আমরা সর্বদাই আলাপরত, প্রলাপ বকি। কতটুকু সময় আর জ্ঞানের কথা বলি! আমরা আমাদের ধারায় চলি। একটু অন্যরকম শোনার কান বা মন আমাদের যেন জন্মসূত্রেই নেই। যদিও আমরা হলাম জীবের শ্রেষ্ঠ—মানুষ।

কিছু একটা শুরু হতেই শেষ হয়েছে কি না-হয়েছে, আমরা ইতি টেনে দিয়েছি। নইলে সামান্য কথা যে কি বিশাল তত্ত্বে নিয়ে পৌঁছে দিতে পারে, ধীরে ধীরে সে সম্পর্কে ধারণায় আনা যেত। তারই এক নজির এখানে তুলে ধরছি। এরকম কতই না মায়ের প্রতিদিনের কাজে কথায় বয়ে যায়। কটি আর ধরা আছে। তবে যে কটি বর্তমান, তাঁর অংশ বিশেষ বুঝতে একটি মানুষের সমগ্র জীবন যেন নিতান্তই অল্প সময়।

একদিন মায়ের মুখ নিঃসৃত কয়েকটি কথা, মনে ছুঁয়ে-বুলে যেতে, ঝপ করে কাগজে লিখে নিই।—"দুর্বল মনেই ভয়, যা ভয় তাই ভুত। আর সবল মনেই শক্তি, যা শক্তি তাই ভগবান।" ক'টি কথায় মা কত কি বুঝিয়ে দিয়েছেন। এবার গবেষণা প্রয়োজন। কিন্তু সময় হলেও আমাদের সে সূক্ষ্মতা কোথায়! মাথা মাত্রে মস্তিষ্কের অধিকারী হলেও মেধার দাবী নিশ্চয় কোন মস্তিষ্কেই করতে পারে না। নাঃ, কোন প্রতিভাবানেও নয়। কোথায় সে সমন্বয় সাধনা।

জননী আমাদের সকল অক্ষমতাকে মানিয়ে নিয়ে আবার একদিন খানিকটা ধরিয়ে দেন—"দুর্বলতা থেকে ভয়ের সৃষ্টি। যার দুর্বলতা আছে তার বুক ভয়-কম্পিত হবেই। দুর্বলতা না থাকলে ভয় হবে কেন? এবার দুর্বলতা সৃষ্টি হয় কি থেকে? না, যত নিকৃষ্টতা, ক্লীবত্ব, অলসতা, অন্যায়, অপরাধ, কপটতা ইত্যাদি ইত্যাদির জন্য। একের সঙ্গে এক জড়ানো সব সময়। কেউ বিচ্ছিন্ন নয়। একের জন্য আরেক হয় দায়ী। অবশ্য আত্মরক্ষার খাতিরে যে ভয় তাকে জ্ঞানই বলতে হবে। তবে দেখতে হবে বৈকি আত্মরক্ষাটা বিচার করে।"

পরে 'মা' একসময় ছুঁয়ে দেন—"ভুত বলতে অজ্ঞতা, আর ভগবান বলতে জ্ঞান। এ কথা নিশ্চয় আর খুলে বলতে হবে না।

দুর্বল স্নায়ুই জানবি যত ভয়ের কারণ। তার সঙ্গে মা দিদিমা পাড়া-প্রতিবেশীর অজ্ঞতা জোগান দেয়।”

‘ভয়ের দরুন মানুষ ভূত দেখে, আর ব্যক্তির নিজের অজ্ঞতার জন্য যে দুর্বলতা—‘তথা ভয়ের সৃষ্টি হয়,’—তার উত্তরে “দুর্বলতা থেকে ভয়ের সৃষ্টি” প্রসঙ্গে কিছু বলে ‘মা-মহাজ্ঞান’ আগে পরে বক্তব্যের সহজ-সঙ্গতি এনে দেন। (‘ভূত-ভগবান’ অধ্যায়ে এ বিষয়ে তিনি বিস্তারিত বলে গেছেন।)

এ এমন কি নূতন কথা। ঠিক মন ভরল না। মা মনোভাব বুঝতে পারেন। অনায়াসে মনের প্রত্যন্ত প্রদেশে চলে গিয়ে আনমনা মন, ঘুমন্ত মন, মরা-মন—সবের খবর নিয়ে আসতে পারেন তিনি। এ মায়ের শুধু শ্রেষ্ঠত্ব নয়, সেই সঙ্গে অলৌকিকত্বও প্রমাণ করে।

জ্ঞানই মায়ের সব কথা। তবে সে জ্ঞান কোন্ জ্ঞান? তা কি আয়ত্তে আনা যায়? কতটুকু কি অর্জন করার পর কোন্ স্তরে গিয়ে কে যে কোন্ প্রয়োজন মিটান! জ্ঞানী কি কভু কখনো অসহায়ত্ব বোধ করেন? এ সব জটিল তত্ত্বের মীমাংসায় মা ধীরে ধীরে উর্ধ্বে উঠে গেছেন।

মায়ের সঙ্গে খানিকটা উঠে গেলেও স্থির থাকতে পারিনি, পারা সম্ভবও নয়। মুহূর্তে গড়িয়ে গিয়ে নীচে এসে পড়েছি। তাই সকলের সঙ্গে এবার আলোচনায় বসতে চাই। আমাদের মতন করে আমরা বুঝেছি, কিন্তু আমাদের বোঝাই তো সব নয়।

মা আজীবন স্ব-ধারায় চলে একটা সাধারণ তত্ত্বকে নিজের জীবন দিয়ে পালনও প্রমাণ করে সকলের সামনে তুলে ধরেছেন। তা হল এই —সকলের মতামতের একটা মূল্য আছে—তা সে যত ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ হোক। তাই ‘বুঝবে না’, এমন বলব কেন? বলা বাহুল্য, এ সব কথা বলে কাউকে কোন কটাক্ষ অবহেলার প্রশ্ন ওঠে না।

একটু অন্য প্রসঙ্গে চলে আসতে হয়েছে। যাই হোক পরক্ষণেই মা একটা কথা বলে একটু হকচকিয়ে দেন—“হলে ভাব, না হলে ভাবাও। তুমি কি করছ? ভাবছ। আমি ভাবাচ্ছি। যখন তুমি রিপুর দ্বন্দ্বে

পড়েছ তখন তুমি ভাবছ, ভাবাতে পার নি। যখন তুমি রিপু জয় করেছ তখন তুমি ভাবছ না, ভাবাচ্ছ। বুঝেছ? অর্থাৎ তুমি আগে রিপু বলি দিয়ে দাঁড়াও। সাহস আপসে আসবে।"

এবার ব্যাপকে ছড়িয়ে দাও। তুমি যখন পারদর্শী হয়ে উঠেছ তখন তুমি আমাকে ভাবাচ্ছ।—'তাই তো, এর পর একে কি দেওয়া যায়, কি দিলে এ সন্তুষ্ট হবে? এ তো বসে থাকার ছেলে নয়। কাজ শেষ করেই এ তো কাজ খুঁজবে। কাজের মত কাজ করবে, ভুলবে না তো কোন কিছুতেই।' দেখেছ, তুমি ভাবাচ্ছ?

"যখন তুমি ভাবছ—আমি দেখছি, যেটুকু দিয়েছি সেটুকুতেই হিমশিম। শুধু কি ভাবছ, সেই সঙ্গে ভয়। ভেঙে পড়ছ। ভয় ভাবনার দোলায় দুলছ।"

ভাবানোর কথা চিন্তা করতে পারি না। হয়ত আজীবন আমাদের ভাবাই সার হবে। তা সে যাই হোক সে কথা বড় নয়। আমরা না বুঝলে কি হবে, মানুষ বুঝবে বলেই মায়ের এই সত্য বিতরণ—জ্ঞান-গর্ভ সকল প্রসঙ্গ উত্থাপন। এখনি এখনি সর্বসাধারণে না বুঝলেও প্রকৃত সত্যের তো অনাদর হতে পারে না।

সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কত কত মনীষী ও মহাপুরুষ যে যার নিজের ধারায় কতই না জ্ঞান বাণী শুনিয়ে গেছেন। অসাধারণ চরিত্র ও মনোবলের জন্য যে তাঁরা একরকম ত্রিকালজয়ী, এ কথা তো মানতেই হবে। একটা প্রশ্ন অবশ্য মায়ের জ্ঞানের আলোয় দাঁড়িয়ে আজ আমাদের সকলের মনে উঁকি দেয়—তাঁদের বাণী-বিচার-বক্তব্য নিয়ে কদাচ কারো কি কোন দ্বন্দ্ব ছিল না, না নেই? হয়ত অনেকই আছে। আগাগোড়া অনেকেরই গতিবিধি সাধারণের তর্ক-সাপেক্ষ, কটাক্ষপুষ্ট আলোচ্য-বিষয়।

অসাধারণ ব্যক্তি মাত্রের এই যা মহৎ গুণ—কাউকে ঘাঁটানো কেউ পছন্দ করেন না, না হন ব্যক্তিগত ভাবে অন্যের সমালোচনায় পক্ষপাতী। সর্বদাই একটা আপাত উদাসীন ভাব। এইখানেই যা মায়ের সঙ্গে সকলের বিশেষ তফাৎ। মা বরাবরই তাঁর জীবন ও বাণী

নিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজে বিচার করে দেখতে বলেছেন, এবং আজো সকলকে সেই ধারায় প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন। কোন মহাপ্রাণের সমালোচনায় তাঁর বিশিষ্ট অধিকার সত্ত্বেও তিনি সন্তান-স্নেহে পারতপক্ষে বরাবরই এড়িয়ে যেতে চান।

আশা করি অদূর ভবিষ্যতে কত কত উন্নতমনা মুক্ত-অন্তর নিয়ে এগিয়ে এসে বুঝে নিতে চাইবেন "মা-মহাজ্ঞান" প্রচ্ছন্ন বিচার ও নিগূঢ় উপলব্ধি। সে দিন সমাগত। শুধু সাহিত্য দর্শন নয়, বাণিজ্য বিজ্ঞান প্রযুক্তি—সর্বস্তরের মানুষের আবেদন নিবেদনে চির-সমুজ্জ্বল অনুভূত হবে মায়ের অনন্য প্রতিভা। এখানে আলোচ্য বিষয়-সূচী লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলে পরম বিস্মিত হতে হয়। কত না কথায়-গানে, সূচনায় সাধনায়, পূর্ণতা লাভ করেছে তাঁর অসামান্যতা!

●

এ সংসারে সাধারণ কত সমস্যারই কোন সুরাহা সহজে বুঝে পাওয়া যায় না। তায় আমরা করব রহস্যের কিনারা! সব ছেড়ে আবার যখন "সৃষ্টি রহস্য ভেদ"-এর প্রশ্ন ওঠে, তখন অতি বড় পণ্ডিতও থমকে দাঁড়ান। খুন-খারাপির রহস্য উদ্‌ঘাটনই সময় বিশেষে অসম্ভব ব্যাপার বলে দাঁড়িয়ে যায়। রহস্য যে এক বিচিত্র জটিলতা, এ কথা বলা বাহুল্য। এখন সূত্র খুঁজে না পেলে যত সূত্রধরের তো, বংশের ধারায় গর্বিত হয়ে বাইশ বাটালি বাগিয়ে নিয়ে, দামী কাঠ নষ্ট করাই সার হবে। ভাল কোন আসবাব তৈরী করা আদৌ সম্ভব হবে কি? এবার সূত্রধর যদি হন বাজ ছত্রধর কোন চারু চক্রবর্তী, তবেই তো তাঁর কাছে সকলি হাস্যকর মনে হবে। সাধনা ব্যতিরেকে বংশপরম্পরায় এদের যত প্রচেষ্টা প্রমাণিত হবে আত্মপ্রবঞ্চনা।

সমস্যায় আর রহস্যে তফাৎ কি? পৃথিবীর গোড়ার কথাই হল ঝুট ঝামেলা। যেখানে জীবন যেখানে গতি, সেখানেই সমস্যার সৃষ্টি হয়। জড় পড়ে থাকে, তার কোন সমস্যা নেই। অথচ জড়ের বিচিত্র ভাবরূপ অবস্থান নিয়ে অহরহ চলে জীবনের ভাঙা-গড়া।

আলোচনার এমনই এক সুদাপ্ত প্রহরে 'মা-মহাজ্ঞান' জ্ঞান-সান্নিধ্যে যে কটি কথা পাই, এখানে তা লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন।

মা-মহাজ্ঞান—সমস্যাটা এক জিনিস আর রহস্যটা এক জিনিস। রহস্য হচ্ছে—যাকে আমি সম্পূর্ণভাবে বুঝতে বা ভেদ করতে পারছি না। তাকেই বলে রহস্য। আর সমস্যা হচ্ছে—যাকে আমি জানতে বুঝতে পারছি, অথচ কিছু করতে পারছি না।

প্রসাদ—তাহলে সমস্যার বহু ঊর্ধ্বে রহস্য। সৃষ্টি রহস্য তো চিন্তাই করা যায় না। একটা ডাকাতির কিনারা করতে পারছে না, খুনী বেপাত্তা—ব্যাপারটা খুবই যেন রহস্যজনক। কিন্তু ওটা কি—রহস্য, না সমস্যা?

মা-মহাজ্ঞান—কিছুটা রহস্য কিছুটা সমস্যা। অনুমান করছে বুঝছে, অথচ ধরতে পারছে না। কিছু রহস্যজনক—কিছুটা। ষোল আনা নয়। কেন? না, ওখানে রহস্যের সঙ্গে 'গাফলাতি' আছে। 'গাফলাতি' আছে বলেই রহস্যের কিনারা করতে পারছে না। সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে, সমস্যায় রহস্যে মিশে আছে। ঠিক ঠিক মত কাজ করে হদিস পাচ্ছে না। ঐ মুখে বলছে, 'আমরা নাজেহাল হয়ে গেলাম' এই দলটা ধড় পাকড় করতে!' হয়রানি হওয়া কি কম কথা!

ঠিক এই মুহূর্তে আমরা সমস্যা ও রহস্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে তুচ্ছ কিছুর কিনারা করতে না পেরে খাবি খেতে খেতে অনায়াসেই উপলব্ধি করতে পারব নিশ্চয়—সৃষ্টি সমস্যার গুরুত্ব গভীরতা ইত্যাদি কি ভীষণ, ভয়াবহ ও দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়। কত ক্ষুদ্রের ফেরে আমাদের নিরন্তর দ্বন্দ্বের কোন অবসান সহসা হয় কি, যে এক জীবনে প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে যত পার্থিব অপার্থিব ভেদ করব! শুধু ভেদ নয়, ভেদ যদি না সুষ্ঠুভাবে বুঝিয়ে দেয়—প্রভেদ কোথায় কার কেমন ছিল, আছে বা থাকবে, তাহলে আর কিসের কি শান্তি।

সব তর্কের মীমাংসা এখন এক জীবনে, যৌবন অতিক্রান্ত হওয়ার আগে যখন কারো কাছে স্বাভাবিক ধারায় পাই, তখন তাঁর বিশালত্বে বিস্মিত হতে হয় বৈকি। এ কোন মানুষের খোলে আদৌ সম্ভব

নয়। নয় কখনো এমন কি, কোন দৈবাদেশ বা ঐশ্বী আশীষে। সে হলে তেমন নজির নিশ্চয় ভূ-ভারতে মিলত। বিস্তর বলি না, তবে কিছু তো বটে।

পৃথিবী 'ভাব' বুঝতে হিমশিম খায়, তায় হৃদয়ঙ্গম করবে 'সজ্ঞান সমাধি'! 'সমাধি' আবার 'সজ্ঞানে'? হ্যাঁ হ্যাঁ, 'বাহ্যজ্ঞান শূন্য' নয় কভু কখনো। সজ্ঞান তাঁর যত ভাব সহজাত বোধের ধারায়, সজ্ঞান তাঁর মহাভাব অসাধারণ জ্ঞান ও মহাজ্ঞানের সন্ধিস্থলে।

সমন্বয় চেতনায় নিয়ত উদ্‌বুদ্ধ হৃদয় স্বতস্ফূর্ত ভাবে ব্যক্ত করে চলেছে শত সহস্র ধারায়। তাঁর বিচিত্র বিধান তাই কোন জটিলতার সৃষ্টি করে না। স্বচ্ছ সহজ সাবলীল ভাব ধনী-নির্ধন অজ্ঞ-পণ্ডিত দেশী-বিদেশী সকলকে একাসনে উপবিষ্ট অবস্থায়, তৃপ্ত পরিতৃপ্ত হতে সাহায্য করে। সেই সূত্রে এই পরম বিস্ময়কর সৃষ্টি, বলা বাহুল্য, সর্বযুগের সৃষ্টি সভ্যতা ও শিল্প সাহিত্যের উপর একটা প্রচণ্ড আলোড়ন তুলবে! তবে হে বিজ্ঞানী, ভেবে দেখেছ কি, তুমি কোথায় দাঁড়াবে? 'মা-মহাজ্ঞান' সূক্ষ্ম-যুক্তি, নিগূঢ় উপলব্ধি সর্বাগ্রে একান্ত হৃদয়ে তোমারই তো অনুধাবনের বিষয়। তোমার আসন তাই সবার আগে, আন্দোলনের পুরোভাগে। তবে একটা কথা—আপনাকে 'মন-বিচারী' বলে অনুভব করেছো কি? তোমায় না যেন পেয়ে বসে কোন সংস্কারে।

অবশ্য হবে আর কি, ক্ষুদ্র আন্দোলন কখনো কি বৃহৎ বিপ্লবের জন্ম দিতে পারে? যুক্তি' মহাযুক্তি নিয়ে বিপ্লব ঘটাতে তিনিই নিয়েছেন সর্বস্তরে প্রচ্ছন্ন ভূমিকা। তাঁরই এক নাম 'মা-মহাজ্ঞান। উঁহু, তবু কি তোলপাড় কিছু কম হবে। আঃ হোক না কেন এখনি কিছু। যা হবার হবে জানি। তবে যা কিছু ভাঙা-গড়া জননী বর্ত্তমান হলেই মঙ্গল। শ্রীখোল লক্ষ্য করে এগিয়ে এলে অচিরে পথ পাবে খাল গর্ত্ত ভিটিয়ে দিয়ে যত খল।

●

এ সংসারে কথা তো বিস্তর বুঝে পাই, আখ্যায় অনুশীলনে। ব্যাখ্যা

কে দেবে শুনি, সেই সে চির অব্যক্তের? এখানে বিস্তারিত সেই তারই বিচার বিশ্লেষণ। এবং সেই সূত্রে এ অনন্য প্রতিভার বিশালত্বের কোন পরিমাপ করা যায় না।

প্রথম পরিকল্পনায় "সৃষ্টি তোমার মিষ্টি বটে..." গানটিকে কেন্দ্র করে প্রশ্ন, প্রসঙ্গ ও প্রসঙ্গান্তর হয়ে দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আমরা 'মা-মহাজ্ঞান' সুমহান আদর্শ সম্পর্কে বিশেষ কিছু অবহিত হই। প্রকৃত সত্যের গভীরতা আমাদের অন্তর মন স্পর্শ করে। গানের ব্যাখ্যা ধরে আমাদের কার কি আখ্যা উপাধি সবই যেন ব্যক্ত হয়ে পড়ে। প্রশ্নোত্তরে এমন পরম প্রাপ্তির কথা কাউকে বুঝিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। তবে না-বোঝার মত কিছু কি রইবে অবশেষে?

অতঃপর প্রস্তুতি পর্বে আরো তিনটি বিভিন্ন সময়ে 'মা-মহাজ্ঞান' শ্রীকণ্ঠে গীত সমাধি-সঙ্গীত এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে। সঙ্গীত-কথায় বিষয় বস্তুর বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য 'মা-মহাজ্ঞান' বিশালত্ব সম্পর্কে সবিশেষ অবগত হওয়ার সুযোগ দেয়। 'দু'শো পাঁচশো বছরের একটা পুরনো গাছ 'এক দু'টো শিকড়ের উপর সে দাঁড়িয়ে আছে'—এ রহস্যের কিনারা করবে কে! সে যাই হোক, গভীর ধ্যান-মগ্ন হওয়ার অবকাশ, অধ্যায়ের শেষ পর্যায়ে এসে আপাততঃ না খুঁজে, আমরা একটু অন্য ধারায় এগিয়ে যাই।

এখানে দ্বিতীয় গানে তাঁর প্রশ্ন উত্তর কি ভাবে যে নির্মল অশ্রু ওজন করে দিয়েছে এবং সকলকে কাঁদিয়েছে! 'যে কাঁদে সেই কাঁদায়' —অবশ্য নিগূঢ় উপলব্ধির বিষয়। সে না হৃদয়ঙ্গম হলে, শেষ গান 'তাই তো ভাবি ক্ষণে ক্ষণ' কতখানি অর্থপূর্ণ, আমার তা বুঝব কি? তাঁর অন্বেষণ মনুষ্যত্বের চরম অবমাননা লক্ষ্য করে, ধিক্কার দিয়ে শেষ হচ্ছে। বেদনা ও বিদ্রূপ একাকার হতে তাঁর কষাঘাত হাহাকার করে উঠেছে। মূর্ত তা প্রতিটি ছত্রে—প্রাঞ্জল ভাষায়, হৃদয়গ্রাহী গভীরতায়।—

"বিধি হে, বিধি হে—
পশুরূপী মানব দেখে যাই যে আমি।

মনে ছিল বল—কত যে আশা
সৃষ্টি মাঝে শ্রেষ্ঠ তোমার
মানবের মাঝে পাব দেখা।"

এই প্রস্তুতিই সব নয়, এটা মোটামুটি একটা ছক। না জানি কত অসংখ্য প্রশ্নোত্তর তাঁর পথ গড়েছে! রহস্য ভেদের সূচনায় তাই 'ভূত ও ভগবান' নিয়ে তোলপাড় করলে, 'মা-মহাজ্ঞান' লিপিবদ্ধ করে দেন তাঁর অকাট্য যুক্তি। আলোচনা প্রসঙ্গে অভেদানন্দের গবেষণা চলে আসে অবিচ্ছেদ্য ভাবে। এই 'অভেদানন্দ-ভেদ' অধ্যায়, বলা বাহুল্য, সমুন্নত ভাবনা-চিন্তায় বিস্তর খোরাক জোগায়।

এর পর আসে শক্তিকে স্বীকার অস্বীকারের প্রসঙ্গ। জীবনে নাস্তিক হওয়ার অবকাশ কারো কি থাকে? হলেও আজীবন কি সে থাকতে পারে তাই? অতঃপর জ্ঞান, প্রেম ও শক্তি নিয়ে আলোচনায় বড় ভায়ের ভূমিকায় জ্ঞানের বোবা ও কঁকা পরিচয় আমরা অস্বীকার করতে পারি না। আখ্যায় ব্যাখ্যায় সর্বত্র আমাদের কার কেমন গুরুত্ব, পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন মা। অত্যন্ত সহজ ভাষায় ধাপে ধাপে উঠে গেছেন তিনি সেই সব নিগূঢ় তত্ত্বে 'সর্বদিক নিখুঁত বিচার করে যা সত্য তাই জ্ঞান' 'জ্ঞানের কোন ভাঙ্গটা নেই' ইত্যাদি সার-সিদ্ধান্তে। যা জ্ঞান তাই কিন্তু সব সময় সত্য নাও হতে পারে, সত্য হল জ্ঞানের একটি রূপ। এমন অন্বেষণই তাঁকে সৃষ্টির বিভিন্ন ভাবরূপ নিয়ে তোলপাড় করিয়েছে। তিনি 'মা'য়ে 'না'য়ের ধ্বনি একাকার করেন নি। আবার আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নও হৃদয়ঙ্গম করেছেন ভরপুর স্পৃহার মাঝখানে। তাই সার্থক তাঁর উপলব্ধ অধ্যাত্ম-নির্যাস—

"একে একে সাজিয়ে তাই
দাঁড় করানু বস্তু দিয়ে
আকারে আনিনু
ঈশ্বর তুমি শক্তি তোমার তুমি কৃপাময়
দাসত্ব তোমারে চাই।"

ব্যস আর তো কিছুই জানার বাকী থাকতে পারে না। মুহূর্তে ভেঙে ফেলেছেন সর্বকালের যুক্তি বুদ্ধি বিচার বিবেচনা। ঠিক এই মুহূর্তে পৃথিবীর নব যাত্রা 'শুভ' বলে চিহ্নিত হল।

অতঃপর দিয়েছেন তিনি সর্ব সমস্যায় সার্থক সমাধান।—'একটা শক্তি আছে। সে শক্তিটা কি? একটা 'ভেপার।'......'সৃষ্টির পূর্বে কোন এক লগ্নে সংঘর্ষের মূলে যে যেভাবে টানতে পারে।' সৃষ্টির গোড়ায় এত স্বাভাবিক যুক্তি! উঃ আর তাই নিয়ে যুগে যুগে কত কথাই না বয়ে গেছে!

এখন প্রশ্ন হল, 'মা-মহাজ্ঞান' প্রদত্ত পথ স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি আমাদিগে কোন্ দিগন্তে পৌঁছে দেয়? সেখানে কি মেলে অনন্তের ঠিক ঠিকানা? পথ পড়লে তবে তো যথাস্থানে পৌঁছনোর প্রশ্ন। এতদিনে সেই পথই পড়েছে। এখন যে যার মনে জবাব গুছিয়ে রাখি—

"দিয়েছিল স্বর যে রে
কেন চাইলি না রে দেখতে তারে?
নয় ভগবান, ঈশ্বর জানি।
শুধু জ্ঞানের আলোয় নয়ন মেলে দেখেছিলাম;
দেখলি না রে কেন শুনি?

খুঁজে দেখে জেনে বুঝে শেষ ঘোষণা মায়ের, শোনায় বটে বজ্র নির্ঘোষ—

"দুঃখ বেদন ভুলে
শুধু সত্য নামের পরো মালা
জ্ঞান বিচার
দেখবে তোমার ঘরে।"

জ্ঞান স্থিত হলে তবে না তফাৎ করবে স্বার্থ ও সার্থে। 'তত্ত্ব' ও 'সার্থ'সহ দ্ব্যর্থক 'অর্থ' সম্পর্কে সচেতন হবে দিক দিগন্ত।

এর পর 'সজ্ঞান সমাধি'র রাশ টেনে ধরে ধরে 'মা-মহাজ্ঞান' লিপিবদ্ধ করে দেন—আত্মা পরমাত্মা থেকে শুরু করে 'ব্রহ্মজ্ঞান' হয়ে ভেপারের বিভিন্ন ভাবরূপ ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিষয়ে। অবিচ্ছেদ্য

ভাবে চলে আসে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত মহাশক্তি ও মহাজ্ঞানের বিশিষ্ট ভূমিকা। সার সিদ্ধান্ত অস্বীকারের কোন পথ থাকে না। একবাক্যে সকলকে মেনে নিতে হয়—জন্মান্তর বলে কিছু নেই। হুড়মুড় করে মাথার উপর ভেঙে পড়ে রাজ্যের প্রতিবাদ, যত বজ্র-যুক্তি। অনবদ্য কথায় গানে নিখুঁত করে সবেরই মীমাংসা দিলেন 'মা-মহাজ্ঞান'। সার্থক পথ পেলো সর্বকালের শ্রী-শান্তি।

তবে জন্মান্তর নেই বললে তো আর এক কথায় কেউ মেনে নেবে না। অবিচ্ছেদ্য ভাবে জুড়ে আছে যে জাতিস্মর ভবিতব্য ইত্যাদি নানান পর্ব। সেই সূত্রে যা কিছু ভেদাভেদ বুঝিয়ে দেন 'মা-মহাজ্ঞান' 'স্পৃহার আকার'কে কেন্দ্র করে। অতঃপর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে চির-নিরুত্তরকে জানার বাসনাই কেবল ধারায় ধারায় প্রশ্রয় পেয়েছে।

জন্মান্তর 'আছে' বললে আর্তনাদ করতে বিশেষ কেউ দাঁড়ান না। তবে 'নেই' বললেই যত উৎপাত আঘাত হানে। এখন কোন আঘাতই যাঁর কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে না, তিনি নিশ্চয় সকল ঘাত প্রতিঘাতের সুদূর অতীত।

'মা-মহাজ্ঞান' অনন্য অদ্বিতীয় প্রতিভা সম্যক্ উপলব্ধি নিশ্চয় অসাধ্য সাধনের দাবী জানায়। যোগ্যতা যার যেমন করা হোক না কেন, ধার করা ছাড়া কোন উপায় মহাপুরুষেও দেখি, পান নি বা পান না। ধারায় ধারায় ধার কর্জ করে বর্তমান এমনই অবস্থায় এসে অধ্যাত্মবাদ দাঁড়িয়েছে যে, সেখানে সত্যের নামে শাশ্বত বলে আর কিছু নেই। ঠিক এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে পৃথিবীকে যাবতীয় সূক্ষ্ম বিচারের অধিকার দান করে যখন জননী বলেন—'অভিনব মনোমত করে পাবি', তখন কোন বিরোধ কি গতি পেতে পারে?

●

"মা-মহাজ্ঞান" রচনা সম্ভারের বৈশিষ্ট্যই হল 'সজ্ঞান সমাধি'। সমাধি, বলা বাহুল্য, সাধারণ কোন অধ্যাত্ম-বিষয় নয়। সজ্ঞান-বোধ নিগূঢ়-তত্ত্ব বিচারে সদা ব্যস্ত থাকে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মের বিচিত্র বিকাশ শ্রীক্ষেত্রে নিয়ত পরম বিস্ময়ের কারণ বলেই, আমাদিগে সর্বধারায়

সচেতন হতে উদ্‌বুদ্ধ করে। সৃষ্টির অন্তরালে স্রষ্টাকে অদ্বিতীয় হৃদয়ঙ্গম করার প্রশ্নে 'মা-মহাজ্ঞান' 'সজ্ঞান সমাধি' অনুধাবন তাই একান্ত অপরিহার্য।

মানের 'সজ্ঞান সমাধি'র ছত্রে ছত্রে যে সমন্বয় বোধ পরিস্ফুট, তা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার। সমন্বয় কোন সাধারণ ব্যাপার নয়, নয় কিছু অসাধ্য সাধন। তবে মানুষ মাত্রেই পদে পদে সমতা হারায় বলেই আজীবন নানা ব্যাপারে তার হয়রানিই সার হয়। লাভ কিছু হলেও দেখা যায় সে লাভের গুড় পিঁপড়ায় খেয়ে যায়। কেউ কিছুই রেখে যেতে পারি না। সর্বস্তরে অমরত্বের দাবী যেন নিছকই অবান্তর চিন্তা।

যা কিছু কেবলমাত্র যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বিতরণের প্রশ্ন। সুতরাং সবযুগের সর্বকালের শান্তি স্বস্তয়ন প্রসঙ্গ উত্থাপন না করাই ভাল। এখন তা আড়াল বুঝলে বেড়াল হবে এবং সুযোগ পেলেই ঘর ঘর হেঁসেলের দুধে মুখ দেবে, মাছ নিয়ে পালাবে—এ তো খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। অমরত্বের অধিকার কোন প্ররোচনা বা প্রবঞ্চনা গ্রাহ্য করে কি? অন্যকে কোন মহৎ উদ্দেশ্যে প্ররোচিত করাও এক ধরনের প্রবঞ্চনা। এ কথা অবশ্য সাধারণ ভাবে বোঝানো অসম্ভব। আদর্শের কথা শুধু জানিয়ে কেউ কবে ক্ষান্ত থেকেছে কি? প্রচার প্রতিষ্ঠা প্রতারণার পথ গড়ে।

যুগের চাপ মহা সাধকের ধাপ খসিয়ে দেয়। বাস্তবের কোন চাপেই 'মা-মহাজ্ঞান' নতি স্বীকার করেন নি। সমতার খাতিরে সত্যের প্রয়োজনে ক্ষেত্রবিশেষে তাঁকে হয়তো কিছু বিকৃতি মানিয়ে নিতে হয়েছে। কিন্তু তাঁর ;সৃষ্টির সর্বত্র আমরা তাঁকে অবিকৃত বুঝে পেয়েছি বা পাই। সমন্বয়েব ধারায় তিনি ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে সমস্ত রহস্য উদ্‌ঘাটন করে চলেছেন। তাই এত স্বচ্ছ তাঁর 'সৃষ্টি রহস্য ভেদ'।

নানান কথার মাঝে আগে পরে গান ধরে ধারায় ধারায় 'মা-মহাজ্ঞান' যত কথা বলে গেছেন, তা বড়ই বিস্ময়কর। যত প্রশ্ন তত

উত্তর—কথার কামাই নেই। প্রসঙ্গান্তর কতই তো কেটে রাখতে হল। আরো চাইলে আরো ছিল। সেই সূত্রে চিরকালই সবাই সকলকে সাদর আহ্বান জানায় এবং জানাবেও। তবে মা থাকতে যা কিছু প্রত্যক্ষভাবে পাওয়ায় যে লাভ, তাঁর অবর্তমানে ভবিষ্যতে কার কি স্বভাব নিয়ে আমরা পরস্পর বুক ভরব, সে তো আমরা খুব ভাল রকম জানি।

আমার জীবন ধন্য তাঁর সেরেস্তায় কেরানীর ভূমিকায়। অনর্গল মুখে বলে যান মা, ঘুরে একটি অক্ষরও সংশোধন করা প্রয়োজন মনে করেন না। যাবতীয় নির্ভুল পেলেও, সংগ্রহ ও সংরক্ষণে আমাদের দায়িত্ব অনেকখানি। এখন কথা হল, দায়িত্ব ঠিক ঠিক পালনে কে কতখানি যোগ্যতার পরিচয় দিতে পেরেছি, তা মা-ই বলবেন। আর বুঝবে যুগে যুগে যত সাধকে ও সৎ-পাঠকে।

কথা প্রসঙ্গে আমার শেষ শুধু এইমাত্র যা বলবার—এখানে কোন ভুল ত্রুটি কখনো কাউকে তিলেক বিচলিত করবে না বলেই আমার বিশ্বাস। হলে, সামান্য ভূমিকায় আমার অজান্তেই আমি হয়তো সম্পূর্ণ দায়ী হব। তবে বিভ্রান্তির কোন প্রশ্ন ওঠে না। কারণ 'সজ্ঞান সমাধি' লব্ধ অধ্যাত্ম-নির্যাস একান্তই জননীর শ্রী-সম্পদ। যা কিছু লিপিবদ্ধ করে নেওয়ার সুযোগ তিনি দিয়েছেন, প্রশ্ন নিবেদন করেছি বা উত্তরাউত্তরের নামে মায়ের সামনে বসে কাপচিয়েছি, সব লক্ষ্য করে ঘর ঘর প্রত্যেকে কেবল এইটুকু বুঝে দেখবেন—কি ধারায় জননী আমাকে প্রশ্রয় দিয়ে গেছেন। এ শুধু আমি বলে নয়, সকলকেই মা দেন, সবার কথাই শোনেন তিনি—বাচ্চা বুড়ো ধনী নির্ধন অজ্ঞ মূর্খ জ্ঞানী পণ্ডিত—সবার সবার। কত অসারের ভিড় ঠেলে সর্ব রহস্য ভেদ করেছেন, সেইটি এখন নিগূঢ় মন নিয়ে একান্তে বসে সাধনায় গবেষণায় প্রত্যেকেরই বুঝে দেখবার এবং জেনে নেওয়ার।

সময় সময় জিজ্ঞাসুর বিচিত্র-বিকার (প্রশ্নবাদী মন) যে কি ধারায় মাকে বিব্রত করেছে, আজ তা ভেবে অবাক হতে হয়। তবে

এমন এলোমেলো আবোল-তাবোল অনুসন্ধিৎসায় সদুত্তর দিয়ে সুসঙ্গতি সংস্থাপন, "মা" মূলত মহাজ্ঞানী বলেই যেন সম্ভব হয়েছিল। সকল প্রশ্ন-প্রসঙ্গ অভাব-অসঙ্গতি আজ আমাদের কানে তীক্ষ্ণ ভাবে বিঁধলেও, জননীর সত্য-সঙ্গতি সমীক্ষা-সমন্বয় যাবতীয় একান্ত হৃদয়ে সবার অনুধাবনের বিষয় যেন। অতঃপর নিগূঢ় সাধনার ধারায় ঘরে বাইরে যে যার জোরে পথ পেরবো।

হ্যাঁ, যথার্থ ই পথ পড়েছে বটে এতদিনে। কেবল ব্যক্তিগত ভাবে সব কিছু খুঁজে বুঝে প্রত্যেকে মিলিয়ে দেখব, তিনি কতদূর অভ্রান্ত বলে গেছেন। তবে সংস্কারের 'সার' নিয়ে সাধনার 'সত্ত্ব' হৃদয়ঙ্গম করা চারট্টিখানি কথা নয়। বিকার পদে পদে বিভ্রাট বাধাবে, কেবলি চোখ ধাঁধাবে আঁধারে আলোয়। তবে কিসের কি ভয়, খেই খুঁজে পেয়েছি যে।

মন্দিরের যুক্তি-বিচারী ও সত্য-পিপাসুবৃন্দ।

পরিকল্পনা

[এ পরিকল্পনা কাল্পনিক ও অকল্পনীয় যত স্তর-ভেদ বুঝতে মনকে তৈরী করে। তাঁর সৃষ্টি মায়ের মুখে অমনি কি 'মিষ্টি' নাম পেয়েছে! ত্রিগুণাতীতকে জানা বোঝার প্রশ্নে কি ধারায় যে আপনাকে গড়ে তুলতে হয়, তা তো বলে বোঝাবার নয়। একযোগে একান্ত হৃদয়ে ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধির বিষয় আবার কত কি। নিয়ত সর্বত্র জীব ও জড়ের ধর্ম বা ধারা হৃদয়ঙ্গম করার প্রশ্ন। স্রষ্টার স্বরূপ উপলব্ধি হলে, সৃষ্টির সকল রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়।

সেই দুর্গমে সত্য অন্বেষণে প্রথম 'মা-মহাজ্ঞান' মন্তব্য স্মরণ করি—'সৃষ্টি তোমার মিষ্টি বটে' বলতে জানবি, 'তাজ্জব বনে যাই'। অতঃপর বড় বিস্ময় জাগে, 'ছুয়ে ছুয়ে' শূন্যতা' অনুভবের প্রশ্নে অনন্য বৈশিষ্ট্য স্বীকার করায়। পাঁক তুলে পুকুর কেটে ঝর্ণার জোগান পেয়ে বিশুদ্ধ জল বিতরণের বাসনাই যথার্থ ফলপ্রসূ হয়। গানের ব্যাখ্যা ধরে যুগ যুগের সাধন স্মৃতিবিজড়িত বিস্তীর্ণ এলাকা আলোকিত বুঝে পাই।

এক সময় পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে আবারও পাঁক তোলার কাজে নিযুক্ত হই। খনন করবে কে? না জানি কোন্ গভীরে সেই ঝর্ণা! হতাশায় পেয়ে বসার আগেই যে কেউ এদিকে ওদিকে হাত বাড়িয়ে দেবে। সেই শিক্ষাই চলছে যুগে যুগে গুরু শিষ্য পরম্পরায়। সে ধৈর্য কার আছে? আজীবন যিনি নির্বিকার খুঁড়ে যাবেন একমাত্র তিনিই বুঝবেন সত্যের নামে বিশ্বে সর্বত্র সর্বযুগে কি প্রহসন অভিনীত হয়েছে।

'হাতের কর্ম বজায় রেখে গুপ্ত ঘরে চলে যাও—'সন্ধানে' মায়ের এই উপদেশ, নাম যশ অর্থ ও প্রতিপত্তির জগতে, কারই বা জীবনে নিগূঢ় ভাবে প্রযোজ্য হবে শুনি? সর্বার্থক 'সমন্বয়-সাধনা' যে অসাধ্য-

সাধন জানি। সাধন ব্যতিরেকে কোন সাধনাই যে মহাজ্ঞানের নাগাল না-পায়। মানবতা সোপান বিশেষ মাত্র। প্রচার চারা ফেলে চাপ সৃষ্টি করলে, সাধারণে টোপ গিলতে বাধ্য। তবে সে গ্রহণ অন্তঃসারশূন্য। স্বতঃস্ফূর্ত আত্মনিবেদন ব্যতিরেকে সত্যের জগতে কোন ভূমিকাই অর্থপূর্ণ হয় না। টানতে যাকে হয়, মানতে সে কি পারে?]

সৃষ্টি তোমার মিষ্টি বটে!
নেই যে বুদ্ধি আমার ঘটে।
তল খুঁজে না পাই গো তাহার
করি হাহাকার।
জানাই তোমায় তাই তো আমি—
আমি বারে বার।
সৃষ্টি তোমার মিষ্টি বটে!

যতই দেখি ভাবি তাকে।
কূল কিনারা নাই গো যাহার
কেমন করে গড়লে তাকে!
সৃষ্টি তোমার।
আমি অবাক হয়ে তাই
বারে বারে ভাবি গো তোমায়;
কেমন করে গড়লে তুমি!
যেথায় যেমন তেমনি জানি।

সবার আগে তাই
আমি আমার আপন বাগিচায়।
সুন্দর গো সুন্দর,
কেন এমন করে মন হর?

তোমায় আমার চাই—তোমায় আমার চাই।
হায় মিথ্যা আমার এ বুলি জানি,
আমি পারব না গো তাই।
তোমার কথা যত না ভাবি
আমি কারে ভেবে পথ হারাই!

দিয়েছ এমনি তুমি
শুধ্ আমায় দেয় যে তাড়া
ছুটে যাই তারই কথায়।
তারই বাণী বাজে আমার সদাই কানে
সদাই জানি ;
পারি না ভাবতে তোমায়।
এমনি তোমার সৃষ্টি ওগো
আমি ভেবে আকুল তাই।

জ্ঞান হারায়ে দাঁড়াই গিয়ে
আমি কাটব সাঁতার কেমন করে
এই সাগরে ;
জল তো মাপা নাই।
বল গো আমায় তুমি
আমি কেমনে তোমারে পাই!

ভুলাতে পারি না আমি।
যত ভাবি ভুলে যাব
ভুলিতে দেয় না—দেয় না আমায়।
শুধ্ জানায় কেবল বারে বারে,
'আমি ছেড়ে যাব নি।'
কেমনে ডাকব তোমায়!

আমি দিনে দিনে তাই
হাল হয়ে যাই।
ডাকছি ভাবি তোমায় ওগো—
তোমায় ডেকে আমি হারিয়েছি
জানি আমায়।
হায় গো আমার মিথ্যা ছলনা,
আমি নিজের ভেবে নিজে যে গো
কূল কিনারা কিছুই পেলাম না!

তাই তো আমার দিনে দিনে
এমনি-এমনি দেখছি আমায়।
কতটুকু তোমায় ভাবি
জান গো আমায়,
তোমায় জানাতে হবে না।

সৃষ্টি তোমার মিষ্টি ভেবে
আমি চেয়ে থাকি
নির্বাক অবাক হয়ে।
ওগো কোথায় পাব—
কোথায় পাব ধরতে আমি ?
আমার শীঘ্র বলা চাই।

সন্ধ্যায় লোকশিক্ষার আসনে 'মা-মহাজ্ঞান'। শনিবার : ৯ই আশ্বিন, ১৩৩৭।

"সৃষ্টি তোমার মিষ্টি বটে......" —গানটি সম্পূর্ণ পাঠ পর 'মা-মহাজ্ঞান' শ্রীচরণে নিবেদন করি—"সৃষ্টি রহস্য ভেদ" এই দুর্মূল্য গ্রন্থের সূচনায় মা, আপনার এই গানটি চিন্তা করছি। এখন এই ধরে বিস্তারিত জানতে বুঝতে হলে প্রথমেই বলতে হয়—সৃষ্টির মধ্যে মা

আপনি এক মিষ্টতা অনুভব করেছেন। এক কথায়, দুয়ে দুয়ে চার হয়—এটি বিলক্ষণ উপলব্ধি করেছন বলেই যেন বলছেন—মিষ্টি বটে। 'মিষ্টি' বলতে যেখানে যেমনটিপ্রয়োজন ঠিক যেন তাই দিয়ে সাজানো। হে ঈশ্বর, তোমার সৃষ্টি সার্থক।—এই কথাই কি বলছেন মা?

মা-মহাজ্ঞান—না, তা বলছে না কিন্তু। কটাক্ষ করছে। 'সৃষ্টি তোমার মিষ্টি বটে।' মানে, এমন তুমি উপরে সাজিয়ে দিয়েছ আবরণ যার দ্বারাতে কিছু বলবার নেই। কিন্তু একটু ঢাকা খুলতে গেলেই বোঝা যাচ্ছে, তার দ্বারাতে—কি দিয়ে তুমি সাজিয়েছ।

'সৃষ্টি তোমার মিষ্টি বটে'—তাহলে আমি আমার অন্তরীণ সাধনাতে, আমি আমার উপলব্ধির ধারাতে যা বুঝলাম—হ্যাঁ, তুমি সৃষ্টি করতে পার বটে,—কঠিন সৃষ্টি একটা। কিন্তু এত মিষ্টতা তাতে দিয়ে রেখেছ যে কারো কিছু বলবার নেই।

প্রসাদ—কঠিন সৃষ্টি বলতে?

মা-মহাজ্ঞান—যখনই সৃষ্টির মধ্যে আমি ডুবতে যাচ্ছি তখনই দেখছি যে, সেই সৃষ্টির মধ্যে—মানে, কোনরকম করে সৃষ্টি করে দিতে হয় করে দিয়েছ। তার মধ্যে চৈতন্য সূক্ষ্মতা আদি অনন্ত অনেক দূরে। সেই জন্যই বলছে—সৃষ্টি তোমার মিষ্টি বটে—খুবই ভাল। কিন্তু সেই ভালটা যখনই আমি ধরতে যাচ্ছি না, তত দেখছি—আরেঃ, এ তো সেই মৃন্ময়ী। চিন্ময়ী নয়। কেন? না, আসতে আসতে করে—যখন হঠাৎ যেয়ে একটা প্রতিমাকে দেখ—চমৎকার প্রতিমাটি। এই 'চমৎকার' বলে উঠ। কিছু নিন্দা করবার থাকে? কিন্তু একটি একটি করে আবরণ খুলতে গেলেই শেষ ওর কি পাওয়া যায় বল দেখিনি? খড় আর কাদা।

তেমনি মানুষের মধ্যেও তাই—শেষ ভুয়া। এই ভুয়ার উপরে কতকগুলো আবরণ দিয়ে সাজিয়ে রেখেছ। যে ভুয়াতে ঐ আবরণগুলো খুলে খুলে আর থাকে না কিছু। কিন্তু প্রকৃত যেটা জ্ঞান—যার দ্বারা অনন্তে পৌঁছনো যায়, এঁ্যা, সেটাই খুঁজে পাচ্ছি না। সব তো একটি একটি করে অলংকার খসে যাবে। কিন্তু আদি? আদি তো আর

খসতে পারে না।

অর্থাৎ, তুমিও মানুষ আমিও মানুষ। তোমার মধ্যে লোভ কাম ক্রোধ আমিত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি সব রয়েছে। আমার মধ্যেও সব রয়েছে। কি সুন্দর মিষ্টি! এ্যাঁ, ব্যবহারী জীবনে মিষ্টি। কিন্তু যখনই সেই ব্যবহারের যোগ্যতাটা কমে যায় তখন আর তার মধ্যে কিছু থাকে? কি ফেলে রেখে যাচ্ছ? হাজারে হাজারে লাখ লাখ কোটি কোটি সৃষ্টি হচ্ছে আর যাচ্ছে। কিছু মনে থাকে? তার পরিচয় কোথায়? এ্যাঁ অর্থাৎ সূক্ষ্মতা জ্ঞান এত কম দেওয়া আছে যে, যার ফলে তাকে ধরে গুঁড়াতে গেলে কিচ্ছু থাকছে না। ক'জন অমরত্ব লাভ করেছে?

সেইজন্যই বলছে 'সৃষ্টি তোমার মিষ্টি বটে'। কোথাও ধরবার নেই কিচ্ছু। এমন সুন্দরটি করে সাজিয়ে দিয়েছ না তুমি, যে ধরবার কোথাও নেই। যখনই ধরতে যাবে তখনই বর্তে যাবে। ধরতে গেলেই বর্তে যাবে যে, কিচ্ছু নেই। ভুয়া প্রমাণ হয়ে যাবে।

কটাক্ষটা করছে ঐজন্যই তো। খুব চিবিয়ে এটা উপলব্ধি কর, দেখবে পাবে। সৃষ্টি তোমার মিষ্টি বটে। আনন্দের কথা বলছে না ওটা কিন্তু। ওটা জ্ঞানে বিচার করে খুলে ইচড়ে দেখে গিয়ে জানাচ্ছে।

কোথায়, জ্ঞান তুমি সর্বত্র কতটা পাচ্ছ?

প্রসাদ—না, আমি সর্বত্র দুয়ে দুয়ে চার, সেইটিকে লক্ষ্য করেছিলাম।

মা-মহাজ্ঞান—মিলিয়ে দিয়েছ? কেমন সুন্দর দু'য়ে দু'য়ে চার মিলিয়ে দিয়েছ! উত্তরমালা দেখে সব মিলে যাচ্ছে কিন্তু অঙ্ক। দু'য়ে দু'য়ে চার, এ্যাঁ?

প্রসাদ—তাহলে মা একদল বলছে, দু'য়ে দু'য়ে চার হয় না কোথাও। আর একদল বলছে—দু'য়ে দু'য়ে চার সর্বত্র হচ্ছে। আর আপনি তার উপর দিয়ে বলছেন, দু'য়ে দু'য়ে চার তো না হয় মিলে

গেল, কিন্তু—।

মা-মহাজ্ঞান—মিলিয়ে দিলেই হয়ে গেল। বুঝলে কি অঙ্কটা? দু'য়ে দু'য়ে চার—তুমি একটা অঙ্ক কষলে—একজন কষে দিয়ে গেছে, সেই কষা দেখে তুমি কষে দু'য়ে দু'য়ে চার বললে। এবারে গোটা অঙ্কটা কষে এসোদেখিনি। দু'যে দু'য়ে চার কি করে হচ্ছে দেখ তো।

দু'য়ে দু'য়ে চারও হবে না। দু'য়ে দু'য়ে সাড়ে তিনও হবে না। কিছুই হবে না। উঁ? খুব চিন্তা করে ধরতে গেলে, দু'য়ে দু'য়ে শূন্যতা অনুভব। সাড়ে তিনও হয় না, আর চারও হয় না দু'য়ে দু'য়ে। শূন্যতা। যে শূন্যতা আকার ধারণ করবে—শূন্যে যেয়ে বিতরণ করবে। সেই জ্ঞান। সব তো পড়ে যাবে। এ্যাঁ?

তবে দু'য়ে দু'য়ে চারটাই হচ্ছে সুন্দর, মিষ্টি, দেখতে ভাল। আর দু'য়ে দু'য়ে সাড়ে তিন যেখানে হচ্ছে, আড়াই যেখানে হচ্ছে, সেখানেই বড় কটাক্ষের বস্তু হয়ে যাচ্ছে। অত্যন্ত জাল জুয়াচ্চুরি মিথ্যা—মিলিয়ে দিচ্ছে এনে দু'য়ে দু'য়ে।

মঞ্চে দাঁড়িয়ে দারুণ লেকচার দিলাম। সত্য আদর্শ ন্যায় নীতি ধর্ম। কিন্তু আমি বোতলের পর বোতল উড়িয়ে দিই, একটির পর একটি নারী হরণ করি। একের পর এক কালো-বাজারী করে চলেছি। অথচ মঞ্চে উঠে আমি দারুণ সত্য আদর্শের কথা বলে থাকি। সেখানেই দু'য়ে দু'য়ে সাড়ে তিন করে দিচ্ছে। কোথাও বা দেড় বাদ দিয়ে আড়াই করে চার দেখিয়ে দিচ্ছে। মুখে যা বলছে তাই কাজে করছে না। আর যেখানে দু'য়ে দু'য়ে চার করছে—

প্রসাদ—মানে ঠিক ঠিক সংসার করে যাচ্ছে ন্যায় ধর্ম মতন—

মা-মহাজ্ঞান—সেটা মোটামুটি মানিয়ে যাচ্ছে।

প্রসাদ—কিন্তু বিচারের ধারায় পা কেউই ফেলছে না। আপনি যে কথা প্রথম থেকেই ধরিয়ে দিচ্ছেন।

মা-মহাজ্ঞান—সেইখানেই শূন্যতা।

প্রসাদ—কিন্তু মা আপনার জীবন দর্শনে—আপনি বলছেন,

সর্ব দিক নিখুঁত বিচার করে যা জ্ঞান তাই জ্ঞান। জ্ঞানযোগ কিন্তু মা, তা বলছে না। জ্ঞানযোগ একটা এমন কিছু ধরতে চাইছে—বা অন্বেষণ তার লক্ষ্য, সেটা সংসারের উর্ধ্বে। আমার যা মনে হয়। কিন্তু আপনি বলছেন প্রতি পদক্ষেপে বিচার নিয়ে এসো—সবদিকে নিখুঁত বিচার।

মা-মহাজ্ঞান—সেইটা হলেই এইটা পাবে। জ্ঞানযোগ যেটা বলছে না, সেটা এই নিখুঁত করে বিচার করে যেতে যেতে সেইখানে গিয়ে—এইটিই তো জ্ঞানযোগ। এই যোগ করে করে যাচ্ছ তুমি।

প্রসাদ—সেটা আপনার জ্ঞানযোগ বলছে মা। কিন্তু যে জ্ঞানযোগের কথা বিবেকানন্দ বলেছেন বা আজ পর্যন্ত চলে এসেছে বেদ বেদান্ত ধরে, তার সঙ্গে, আমার বর্তমান যা মনে হচ্ছে, আপনার বিরাট তফাৎ এইখানটায়। আপনার কথা হল—প্রতি মুহূর্তের পদক্ষেপকে বিচার কর। কি কেন কবে কোথায়—অষ্টপ্রহর এই প্রশ্নে নিজেকে জর্জরিত কর।

মা-মহাজ্ঞান—এই কথা বিবেকানন্দকেও বলতে হবে, এই কথা সব নন্দকেই বলতে হবে। প্রতি পদক্ষেপে বিচার কর। প্রতি সেকেণ্ডে, প্রতি মিনিটে বিচার চলবে।

প্রসাদ—না, যদি এই ধারায় তাঁরা চলতেন না মা, আজকে যে ধারায় আপনি আমাকে বাধ্য করেছেন—বাধ্য ঠিক নয়, উদ্বুদ্ধ করছেন, তাহলে তাঁরা এত ভুল করতেন না। যদি প্রতি মুহূর্তে বিচারের একটা মনোবৃত্তি তৈরী করে দেওয়া যায়—না, শিষ্যের মধ্যে, তাহলে তার এতো—

মা-মহাজ্ঞান—সেই জ্ঞানের খনি খোলে নি তখনো। এই জ্ঞানের উন্মেষটা আসে নি তখনো। যে পর্যন্ত জ্ঞানের উন্মেষটা এসেছে, সেই পর্যন্তই করেছে।

প্রসাদ—না আমি কি ঠিক ধরছি মা? বেদ বেদান্তের সঙ্গে আপনার বোধহয় গোড়াতেই একটা তফাৎ এই। আপনি তো সব ধর্মই বুঝেছেন। বেদ চোদ্দ আনা সত্য বলেছেন। কিন্তু আপনি আশী

আনায় দাঁড়িয়ে আছেন তো, কি তার অতীত—তাঁদের নাগালের বহু ঊর্ধ্বে।

মা-মহাজ্ঞান—আমি এখন সেটা কি করে বলব। সেটা বিচার হবে।

[এমন কত না 'প্রশ্ন' প্রসঙ্গ ধরে প্রসঙ্গান্তরে গড়িয়ে যায়। তবে মহাপুরুষ প্রসঙ্গ উঠলেই সযত্নে এড়িয়ে যান 'মা-মহাজ্ঞান': কেবল একটা কথাই তিনি বলেন, তুমি বললে তো হবে না, সেটা বিচার হবে।' হ্যাঁ, যুগ যুগ ধরে বিচার হবে বৈ কি। বিচার বিশ্লেষণের ধারায় তন্নতন্ন করে খুঁজে বুঝে দেখে, তবে তো শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকারের প্রশ্ন। সত্যকে কি অত সহজে মেনে নেওয়ায় যায়? বেদ বেদান্তও তো আর ব্যক্ত হয়েই শক্ত খুঁটি পায় নি। আর এখানে তো মাটি ভেড়ে বুনেদ তৈরীর প্রশ্ন। আটচালা আর অট্টালিকা উভয়ে একই দক্ষিণা দাবী করে কি?]

প্রসাদ—এখন বেদ উপনিষদ যে সত্য নিয়ে—মা, আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত বুঝেছে বা বেদ বেদান্তকে ভাঙিয়ে প্রাচ্য প্রাশ্চাত্ত্যে পাঁচজন মনীষী যে ধারায় পাঁচটা বক্তব্য রেখেছেন বা রাখছেন, আমার তো মনে হয় মা, তাদের অসহায়ত্ব এইখানটায়। কারণ উপরে অন্বেষণ করতে গেলে খুবই ভুল হয়। না যদি নীচে গুছিয়ে যাওয়া যায় তাহলে এ হাটে কিনে নিয়ে, কালে যে কেউ, ও হাটে গিয়ে বেচে দেবে। আপনার জীবন দর্শনের আলোয় দাঁড়িয়ে এ কথা মা, পরিষ্কার—

মা-মহাজ্ঞান—প্রথম কথাই হচ্ছে নীচকে খুঁজে যাও। আপসে উপর ধরা দেবে। একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝা যাক।

পুকুরে যদি পাঁক তুলতে হয়, উপরের জল তো আগে মারতে হবে। কোন ডুবুরী পুকুরের পাঁক তুলতে পারে, জল না মেরে? পারে কি?

প্রসাদ—নাঃ।

মা মহাজ্ঞান—তুমি বলছ তোমার পুকুরটা ভিটে আসছে।

তোমার পুকুরটা ফারাক করবার দরকার। মানে পুকুরটাকে কাটিয়ে বড় করবার ইচ্ছা। সেই বড় করতে হলে তোমাকে তো আগে জল ছেঁচতে হবে, এঁ্যা ? আগে ফলিক জলটা তুলে ফেলতে হবে। ফলিক জল তুলতে তুলতে কাদা জল উঠবে। কাদা জল উঠতে উঠতে কাদানী জল উঠবে। কাদানী জল উঠতে উঠতে শুধু কাদা উঠবে। শুধু কাদা উঠতে উঠতে শক্ত কাদা উঠবে। এঁ্যা, এ তো পর পর পর পর তুলে যেতে হবে। তারপর তো তাকে গভীর করতে পারবে তুমি।

না তোমরা করছ কি জানো ? করে গেছে বা করছে—করছে কি। ঝপ করে পুকুরে ডুবে পড়ছে। ডুবে লোট ধরে ধরে কাদা তুলছে। উপরের জল ঠিকই রয়েছে মাঝের জলও ঠিক রয়েছে। তলায় গভীরেও যেতে পারছে না। ছ'চার লোট তুললেই—জল খেয়ে নিচ্ছে। জল খেয়ে নিয়েই আঁকপাঁক আঁকপাঁক করছে। করলে পরেই মনে হচ্ছে—আর যাবার নয়, ঐ পর্যন্তই। এই অবস্থাটা হয়েছে তাড়াতাড়িতে।

প্রসাদ—না, পাঁক তুলে কি লাভ ! যদি এই প্রশ্ন আসে মা ?

মা-মহাজ্ঞান—আরো গভীর করবে। এবার গভীর করলেই—সেই পুকুরটা যখন গভীর করতে যাবে না, তখনই তো পর পর সব ধরা পড়বে। তাহলে পাঁকমাটির পর কি মাটি তুমি দেখতে পাচ্ছ ? তারপর কি মাটি তুমি দেখতে পাচ্ছ ? তারপর জলটা আসছে। কি জল সেটা এবার প্রমাণ হয়ে যাবে। কোথ্ থেকে সেই ঝর্ণাটা আসছে। তাহলে ঝর্ণাটা কত তলায়। সেই ঝর্ণায় শুদ্ধ জল তোমার বেরিয়ে আসবে। সেই শুদ্ধ জলে তুমি বসে রইলে। সেইখানের জল তোমার বিচারক। অবর্ণনীয় জল একটা আসছে।

প্রসাদ—সেই পানীয় জলই না বিতরণের প্রশ্ন ?

মা-মহাজ্ঞান—এই। বিশুদ্ধ জল বিতরণ করা চাই।

প্রসাদ—আর এঁরা যুগে যুগে উপর উপর যেমন পেয়েছেন বিতরণ করেছেন, তা হয়তো রোগের সৃষ্টি করেছে পরে পরে। পাঁক না তুলেই জল বিতরণ করেছেন। ঝর্ণার আশায় শ্রম সাধনায় বিস্তর ঝঞ্ঝাট যে।

প্রসাদ—যদি টিপ্পনীই কাটছ মা 'মিষ্টি বটে' বলে তাহলে 'নেই যে বুদ্ধি আমার ঘটে' বলছ যে!

মা-মহাজ্ঞান—আমার ঘটে বুদ্ধি নেই! সৃষ্টি তোমার খুব মিষ্টি লাগছে। তুমি যা সৃষ্টি করেছ দারুণ চমকিত সৃষ্টি। কিন্তু হায়, ঈশ্বর, ঘটে কেন বুদ্ধি নাই!

যখনই অশোকানন্দ প্রসাদ নিজেকে খুঁজতে গেল তখনই খান খান হয়ে ভেঙে যাচ্ছে। কি সুন্দর মিষ্টি বলদেখিনি তুমি। তুমি তোমাকে চিনতে পারছ তো, এ্যাঁ? তুমি এত বড় একটা শিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার পাস, দেখতে এমন সুপুরুষ, অর্থ আছে, চারদিকে খেলায় ধুলায় চাম্পিয়ান—সব তুমি করলে। দেখেছ, এ বুদ্ধির খুব একটা দরকার হয না। একটু ঘষা মাজা কবতেই পেয়ে গেছ তুমি এ বুদ্ধিটা। কি সুন্দব মিষ্টি?

এবার অশোকানন্দ, তোমার ঘটে কেন সেই বুদ্ধি নেই? কেন তুমি আমাকে অনুকরণ করতে এসেছ? কেন বলছ—'আমি বহু দূরে বহু নীচে, কোনদিনই তোমার নাগাল পাব না।' কোথায় তোমাব হাহাকার, এ্যাঁ? 'নেই তো বুদ্ধি আমার ঘটে'—সেই আদি বুদ্ধিকে খুঁজছে।

প্রসাদ—তল খুঁজে না পাই গো যাহার করি হাহাকাব।

মা-মহাজ্ঞান—এই আ। হল? হল? একটু চিবিয়ে পড়লেই বলে দিয়ে যাচ্ছে ঐখানেই। তল পাচ্ছ কি? দেখ তুমি তোমাব সৃষ্টিকে মিষ্টি বল কি না। হাত পা চোখ কান—কোনটা তোমার অভাব আছে? নেই। শিক্ষার অভাব আছে? নেই। বহির্জগতে মিশতে পেছপাও? না। লোভ কামের অভাব আছে? নেই। কোন্‌টার অভাব আছে, বল? সবগুলো পবিপূর্ণ।

তুমি আমাকে সবই দিয়েছিলে। কি মিষ্টি সৃষ্টি। কিন্তু ঘটে আমার বুদ্ধি কেন নেই? তলকে কেন খুঁজে পাচ্ছি না। সেই তলের কাছেই উনি কৃপণ। ঐখানেই 'লিমিট'। এত—এত লিমিটে দেওয়া আছে না, যে তাকে আয়ত্ত করতে বা অর্জন করতে, সমস্ত ধসিয়ে

খসিয়ে দিয়েও পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রসাদ—'কূল-কিনারা নাই গো যাহার / কেমন করে গড়লে তাকে!' সেই সৃষ্টির তো কোন কূল-কিনারা নেই। তাই তো? তা তাকে নিয়ে বিস্মিত হবার কি আছে! যে সৃষ্টিকে লক্ষ্য করে কটাক্ষ করছ—

মা-মহাজ্ঞান—আর সৃষ্টিকে কটাক্ষ করছে না।

প্রসাদ—না এ'র সেই স্রষ্টাকে বলছে লক্ষ্য করে। যতই দেখি ভাবি তাকে। তাকে বলতে—স্রষ্টা? তোমাকে আর কি।

মা-মহাজ্ঞন—নিজের সৃষ্টির সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছে তখন। একই সৃষ্টির সঙ্গে মিলিয়ে দিল।

প্রসাদ—কি রকম?

মা-মহাজ্ঞান—আর বলতে পারব না।

প্রসাদ—পারব না বললে তো মুশকিল। আমরা আরো আতান্তরে পড়ে যাব!

মা-মহাজ্ঞান—আতান্তরে পড়লেও অনেক জিনিস ভাঙা বা বুঝানো যাবে না।

প্রসাদ—না তবু একটু ছুঁয়ে দাও। 'যতই দেখি ভাবি তাকে / কূল কিনারা নাই গো যাহার / কেমন করে গড়লে তাকে!'—এই 'তাকে'ই বা কে, 'যাহার'ই বা কি?

সেই সন্ধ্যায় গানের ব্যাখ্যায় 'মা-মহাজ্ঞান'—

'সৃষ্টি তোমার মিষ্টি বটে / নেই যে বুদ্ধি আমার ঘটে।'—তোমার সৃষ্টির মধ্যে তুমি যে কি ধারায় আত্মগোপন করে দাঁড়িয়ে আছ, তা আমি এখন সেই তলে যেতেই বুঝতে পারলাম। এত সুন্দর করে তুমি সাজিয়ে দিয়েছ সৃষ্টিটা, যে কিছু বলবার নেই। কিন্তু যখনই আমার মনে হল, এ তো অসার এ তো অসার তখন অসারের পাঁক থেকে উঠে আসবার আমার আর রাস্তা নেই। এ তখনই বুঝতে পারছে—বাঃ চমৎকার সৃষ্টি! এটা তাজ্জব বনে বলছে। খোঁচা একটা।

'নেই যে বুদ্ধি আমার ঘটে'—আমার ঘটে বুদ্ধি নেই বলেই আমি এই মিষ্টতাকে নিয়ে এতদিন আঁকাড় করে রেখেছিলাম বা রেখেছি। কেন না, যখনই তুমি বহির্জগতে খুঁজতে যাচ্ছ তখনই অন্তর্জগতও তোমার কাছে ধরা পড়ছে। এই বহিঃ আর অন্তর দুটোকে মিশাতে যেতেই দেখতে পাচ্ছ—এ নিছকই একটা ডোবা। তাহ'ল? সে সাগরে পৌছাতে অনেক দেরী। নদীতে পৌছতেই ঢের দেরী, তা সাগর তো বহুদূরের কথা।

'তল খুঁজে না পাই গো তাহার করি হাহাকার।'—তাহলে তার তল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বৎস, তুমি কি তল খুঁজে পাচ্ছ? বহির্জগত থেকে যখনই কিছু কিছু ছেড়ে এলে এখন কি মনে হল? আমি একজন বৃহৎ ত্যাগী। কিন্তু আজ সতর বছর ধরে 'ত্যাগ কাকে বলে' বুঝতে পারছ তো? তাহলে বহির্জগতের একটা জামা খুলে দিলেই হল না। ধীরে ধীরে দেখ বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন পয়সা-কড়ি বাপ-মা ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক ইত্যাদি আছে। তারপরেই নিজের দীনতা ধরা পড়ছে।—তাই তো, খাব না বলে খেলাম না, তা তো হল না। সেই তো খেয়ে ফেললাম। করব না বললেই করব না, তা তো পারলাম না। হয়ে গেল।—এই দীনতাগুলো এবারে ধরা পড়ছে। তাহলে? সৃষ্টির মধ্যে কি মিষ্টি বলদেখিনি?

কি সুন্দর সাজানো সৃষ্টি! মিষ্টতা তার মধ্যে কত। এ্যাঁ, 'কুইনান' বড়ির সুগারটা যখন ধুয়ে দিয়ে খাবে তখন কি মুখ দিয়ে খেতে পারবে? এই 'কুইনানে'র সুগার ধুয়ে দেওয়া হয়েছে তোমার কাছে। তখন এবারে আর ঘিঁটতে পারছে না। এ সেই মিষ্টিকেই বলছে। আমার ঘটে বুদ্ধি থাকলে আমি এত মিষ্টি বলতাম না। প্রথম থেকেই খুঁজতে যেতাম।

প্রসাদ—'যতই দেখি ভাবি তাকে'—'তাকে সে তুমি আমারই মত একজন। কূল কিনারা নাই গো যাহার কেমন করে গড়লে তাকে।—তুমিও তো সেই এক আমারই মতন সৃষ্ট মানুষ। কি, এই অর্থে যাবে?

মা-মহাজ্ঞান—হুঁ। আর না হলে কোন অর্থের কিছু পাচ্ছ কি?

প্রসাদ—অবাক হয়ে তাই—সেই স্পৃহার জগতের আমরা সবাই, কিন্তু পরম নিস্পৃহ তিনি হলেন কি করে। কেমন করে গড়লে তুমি যেথায় যেমন তেমনি জানি।—এ্যাঁ, সর্বরূপেরূপিণী। কিন্তু কোন একটি রূপ কি অবান্তর মনে হচ্ছে, এক সময়ের জন্যও? তোমাকে দেখেই তখন আমার মন অন্তর্মুখী হল। সবার আগে তাই / আমি আমার আপন বাগিচায় / সুন্দর গো সুন্দর / কেন এমন করে মন হর?'—ভাল লাগছে কিন্তু খেতে পাচ্ছি না।

মা-মহাজ্ঞান—এ কাকে বলছে 'সুন্দর গো সুন্দর'?

প্রসাদ—তাহলে তুমি যে জ্ঞানে গুণে মহিমান্বিত, সেই সুন্দর তুমি তো। তুমি আমাকে আকর্ষণ করছ, তোমাকে আমার চাই। তোমার মত হতে চাই। কিন্তু সেই চাই বললেই তো হয় না। "হায় মিথ্যা আমার এ বুলি জানি / আমি পারব না গো তাই।"—বৃথাই আমার আয়ত্ত চিন্তা।

তোমার কথা যত না ভাবি / আমি কারে ভেবে পথ হারাই—তাহলে এই প্রতিভা এই জ্ঞান গুণ—এইটি তো আমার ভাববার বিষয়। কিন্তু আর একটা অধ্যায় যে আছে আমার মধ্যে। সেই স্পৃহা তার কথা ভাবতে গিয়ে আমি পথ হারিয়ে ফেলছি বার বার। 'দিয়েছ এমনি তুমি'—সেই লোভ কাম তুমি এমনই দিয়েছ, তাদের কাছে আমার দাসত্বই সার। আমি তার বাইরে কিছুই চিন্তা করতে পারছি না। 'এমনি তোমার সৃষ্টি ওগো'—সেই রিপুদিগে চিন্তা করেই বলছে তো? তাদিগে কি করে আয়ত্ত করব!

মা-মহাজ্ঞান—'জ্ঞান হারিয়ে দাঁড়াই গিয়ে'—এ জ্ঞান থেকে ছেড়ে যেয়ে ও জ্ঞানে পা দিতে চাইছ, ও জ্ঞান তখন পাচ্ছ কোথায়! এখন কোন জ্ঞান পাচ্ছ কি? হারিয়ে গেছে সব জ্ঞানই তো। শুধু বিশাল সেই জল রাশিকে দেখতে পাচ্ছ। কি করে সাঁতার কাটব!

প্রসাদ—'ভুলাতে পারি না আমি'—আশ্বস্ত করতে পারছি না তাদিগে। তারা বলছে, তারা আমাকে ছেড়ে যাবে না! তাহলে

আমিই বা তোমাকে ডাকব কি করে! আতান্তরে পড়ে গেছে। 'আমি দিনে দিনে তাই হাল হয়ে যাই'—হালমারা হয়ে যাচ্ছে একেবারে। ধড়সিয়ে যাচ্ছে।

'হায় গো আমার মিথ্যা ছলনা'—সেই ত্যাগ তিতিক্ষা কোথায় আমার মধ্যে! কাকে বলে ত্যাগ! তোমাকে জানাতে হবে না, তুমি সব ভাল করেই জান, তোমাকে কতটুকু ভাবি।

'কোথায় পাব ধরতে আমি / আমার শীঘ্র বলা চাই।—আমাকে তাড়াতাড়ি ব্যক্ত করতে হবে। তাহলে এতই যখন দীনতা মা, তাহলে 'আমার' বললে কেন, 'আমায়' না বলে?

মা-মহাজ্ঞান—কোথায়, দীনতাকে কেটে কেটে যাচ্ছে যে। যে কাটবার মুখ নিয়েছে, কাটছে, সেই বক্তব্য রাখছে। যে বলছে একই সৃষ্টি, কেন অন্যরকম দেখছি আমি। যে বলেছিল, 'আমার ঘটে বুদ্ধি নাই।' তাহলে সে বিচার করতে পারছে।

হয়েছে কি, সাগরে নেমে পড়েছে। নেমে কিন্তু পাড়টা ধরে আছে। এবারে তার অজান্তেই কখন হাত থেকে পাড়টা ছাড়া হয়ে যাবে। তলায় চলে যাবে। সে কি ছাড়ব বলে আর শেষকালে পাড়টা ছাড়বে।

প্রসাদ—না ডুবুরি না হয়ে মা, ডুব দিলে তো মরে যাবে।

মা-মহাজ্ঞান—মরে যাবে। মরেই যেতে তো এসছে। এবার সে ভিতরে ঢুকে গেলে—জল নাকে মুখে ঢুকলে আপসেই সে উঠতে চাইবে। আর না উঠতে চাইলে সেইখানেই মিলিয়ে গেল, হাঙ্গরে কুমীরে খেয়ে নিল তাকে। কিন্তু পাড়টা ধরে থাকবে আর কতক্ষণ! এ 'চাই' যখন বলছে, আর পাড় ধরে থাকতে পারে!

পুনরায় 'মা-মহাজ্ঞান' শ্রীচরণে নিবেদন করি—'না' তবু একটু ছুঁয়ে দাও। যতই দেখি ভাবি তাকে/কূল কিনারা নাই গো যাহার/কেমন করে গড়লে তাকে।'—এই 'তাকে'ই বা কে, 'যাহারই' বা কি?

ঐ যেখানে আটকে গিয়ে খাবি খাচ্ছিলাম। মা সস্নেহে সেই

প্রসঙ্গ ধরে প্রসঙ্গান্তরে বেরিয়ে যান।

মা—দেখেছ ? কাদা তোলার পর এলে গেছ কিন্তু। পাঁক তুলেছ, তারপরে এলে গেছ। এই পর্যন্তই এর। 'এই পর্যন্ত' বলেই রয়ে গেলে। কাদা খুললে তারপরে কি বেরোবে আর খুঁড়তে পারছ না। দেখেছ ঐ পর্যন্ত যেয়ে আটকে যাচ্ছে। জ্ঞানই বল বুদ্ধিই বল যা কিছু বল, আটকে যাচ্ছে। তাহলে আটকে গেলে এবার মনে কর—কি করবে ? তোমার মতন করে—তোমার যে পর্যন্ত যেয়ে জ্ঞানটা আটকেছে তুমি সেইখান থেকে লাইন নিয়ে আর একটা রাস্তা করবে তো ? এবং সেই রাস্তায় আর পাঁচজনকে তুমি উদ্বুদ্ধ করবে। এই-রকমই ধারায় ধারায় করে গেছে।

প্রসাদ—আর লাইন যদি না নিই তাহলে কি বলব ?

মা-মহাজ্ঞান—ঐ পর্যন্তই বলবে তুমি। একটা কিছু তো বলতে হবে তোমাকে।

প্রসাদ—স্থবির তো হয়ে যাব। কিছু তো বলতে পারব না। আমি বলতে গেলে তো আমার মনে হবে, আমি ভুল বলব।

মা-মহাজ্ঞান—তুমি যা বললে এতক্ষণ ধরে, তোমার বলা তো হয়ে গেল। এইটিই পাঁচজনে এসে শিখবে।

প্রসাদ—তাহলে এই বলাটা যখন আমি বুঝতে পারছি ভুল তখন ?

মা-মহাজ্ঞান—হ্যাঁ, প্রথমটায় তুমি স্থবির হয়ে গেলে। ভুল কোথায় বলছ ? কোথায় ভুল করলে তুমি ?

প্রসাদ—না, পাঁকটার পরেই যে মাটি সেখানে গিয়ে যদি আটকে যাই না—আমার তো এই জ্ঞানটা হয়ে গেছে গুরুকে দেখে যে, পাঁকটাই শেষ নয়।

মা-মহাজ্ঞান—আবার হয়ে গেছে কেন জ্ঞানটা। গুরুটা কৈ ? যে পর্যন্ত গুরুকে নিয়ে জ্ঞানটা হয়েছে সেই পর্যন্ত গুরু—

প্রসাদ—সে বাদ দাও মা, সে সব গুরুর কথা। আমি যে গুরুকে আমার জীবনে পেয়েছি। আমার ব্যর্থতার কি ?

মা-মহাজ্ঞান—তোমাকে নিয়ে তো নয়। আমাকে নিয়েই যেটা—আমাকে নিয়ে যে পর্যন্ত তুমি আসছ সে পর্যন্ততেই। তোমার আটকে গেল। এই আটকানো অবস্থায় সরে গেলাম আমি।

প্রসাদ—সরে গেলে! তোমার জ্ঞানটা গেছে কোথায়!

মা-মহাজ্ঞান—এবার সেই জ্ঞানটা নিয়ে খুলে বের কর।

প্রসাদ—খুঁজে পাব না তো। আমি বলতেও পারব না কিছু।

মা-মহাজ্ঞান—না বলতে পারলেই তুমি প্রথমটা স্থবির হবে। স্থবির হয়ে বেশীদিন থাকতে পারবে না কিন্তু। না থাকতে পারলেই—এই পর্যন্ত—এই এতটা থেকে এতটা তুমি যাওয়া আসা করবে। ঠিক শিষ্যবর্গও তোমার সঙ্গে এই এতটা থেকে এতটা, এতটা থেকে এতটা —এই করতে করতে এইটায় হবে বদ্ধমূল!—এর পরে আর নেই। গুরুদেব যখন করছেন, এর পরে আর নেই।

বুঝেছ? স্থবিরটা কতক্ষণ থাকবে। বেশীক্ষণ থাকতে পারবে কি? লাইন না পেলে, এই পর্যন্তই এর লাইন। যতট, পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারে ততটাই। তারপরে যা আবিষ্কার করতে পারলাম না, জ্ঞান তো সে রয়ে গেল।

প্রসাদ—আবিষ্কার না করতে পারলেও মা, সেখানে একটা জ্ঞান তো গিয়ে স্পর্শ করবে বার বার—আমি যখন স্থবির হয়ে বসে আছি, আমি যখন লাইন নিই নি—পাঁক সরিয়েছি, মাটি যেটা পেয়েছি, গুরু বলে গেছেন, তারও গভীরে—আরো আরো গভীরে সেই ঝর্ণা।—ঝর্ণার সন্ধান পেতে হবে।

মা-মহাজ্ঞান—এই 'ঝর্ণা পর্যন্ত' বলল বলে গুরু এখন। বলল বলে ঐ পর্যন্ত'পেয়ে গেলে। ঐ পর্যন্ত নিয়েই কাপচাবে। যে পর্যন্ত যে গুরু বলে যাচ্ছে সেই পর্যন্ত সেই শিষ্য নিয়ে কাপচাচ্ছে। আর গুরু বলার পরে গুরু একটা নিজে তো খোঁজে। এই যেমন একটা কথা তোমাকে বললাম—আমি তো খুঁলাম। খুঁজে বললাম। আমার কথা বাদ দিয়ে দাও। ছেড়ে দাও আমার কথা।

গুরু যখনই শিষ্যকে শিক্ষা দিচ্ছে তখনই জানবে, সে তার নিজেকে

খুঁজেছে আর শিক্ষা দিচ্ছে। আমি যা সাধনা করেছি যা পেয়েছি তাই আমি বলছি, এবং বলার সঙ্গে সঙ্গে গুরু সম্পূর্ণ তার কাছে খাঁটি হয়ে থাকতে চাইবে তো। প্রত্যেক গুরুই। যত বড়ই যে লুচ্চা হোক আর যত বড়ই যে মাতাল হোক—চোর হোক চামার হোক। এঁ্যা, সে ঠিক থাকতে চাইবে তার শিষ্যের কাছে। এবং শিষ্যও দেখবে যে গুরুর গাঁজার কল্কেটা এমনি ধরা আছে কিন্তু এমনি দিকে বুঝাচ্ছে। শিষ্যও ঠিক এমনি করেই গাঁজাব কল্কে ঘুরিয়ে রাখবে এমনি করে শিক্ষা দিবে। প্রতি জায়গায় প্রতি মুহূর্তে প্রতি সেকেণ্ডে তাই হচ্ছে। বুঝেছ? যে পর্যন্ত যে যেতে পেরেছে সেই পর্যন্ত সে শিক্ষা দিয়েছে। তার বাইরে আর কোথা থেকে দেবে বল।

কোথায় তার দ্বন্দ্ব থাকবে? না, সে যদি কোন মিথ্যা বলে। যদি তুমি ঝর্ণা পর্যন্ত যেয়ে থাক এর বাইরে এখানে যদি তোমার কাপচাবার ইচ্ছা থাকে না, তোমার দোমনা শিষ্যকে শিক্ষা দেওয়া হবে। কিন্তু তুমি সেই দোমনাটা বেশীদিন রাখতে পারবে না। কেন? না, ঝর্ণা পর্যন্ত তুমি গেছ। তারপরে আর যেতে পারছ না। কতক্ষণ তুমি স্থবির হয়ে থাকবে। কতক্ষণ তুমি খেলো হয়ে থাকবে। কতক্ষণ তুমি আমি-শূন্য হয়ে থাকবে? পারবে না। তখন তোমাকে দল ঘেরতেই হবে। এঁ্যা?

সামান্য তিনদিন ধরে নিয়ে বসে থাকতে কি কষ্টটা হচ্ছে চিন্তা করছ, এঁ্যা? এটা সতের বছর মানে সতের দিন। সতের দিনের কষ্টটা কি রকম বেদনা বল তোমার। যেখানে সতের বছর ধরে তোমাকে কষ্ট করতে হবে? পারবে? পারবে না। ত ন তুমি চাইবেই কিছু শিষ্য করে নিতে। এই পর্যন্ত।

আর তারপরে কি? ঐ বলার পরে সব শিষ্যদিগে দেখবে যে, কে কি বলতে চায়, কার বক্তব্য কি আগিয়ে আসে। দেখলে যে, সবাই করজোড়ে তোমার দিকেই চেয়ে আছে। তখন বলল—'নাঃ নেমে পড়া যাক। এই পর্যন্তই।' বলবে, তবে দাঁড়িয়ে যাবে। দাঁড়িয়ে যেয়ে পিছন দিকে চাইবে। দাঁড়াবে, পিছন দেখবে। বার কতক

চাইবে পিছন দিকে। তারপরে আর পিছনে চেয়ে দেখবে না।

ঝর্ণা পর্যন্ত! ঐ পর্যন্ত পেয়েছিলে, ওর পরে কিছু আছে, ঐ যে মনেটা হয়েছিলো? এই 'মনে হওয়া' নিয়ে বেশীক্ষণ গবেষণা করতে পারবে না। যদি বেশীক্ষণ গবেষণা কর তাহলে একদিকে শিক্ষা চলবে একদিকে গবেষণা চলবে। কিন্তু সেই শিক্ষার মধ্যে থাকবে না ভিত্তি। ঐ 'পর্যন্ত' 'যদি'—এই রকম ধরনের শিক্ষা চলবে।

আলবাত এটা হবে, বলে যাচ্ছি এটা হবে—এ ধরনের গলাটা আসবে না। কেন না, তোমার ইচ্ছা আছে, এটা গবেষণা করে আমি বের করব। কিন্তু সেই গবেষণায় যদি দেখ যে তুমি নাগাল পাচ্ছ না, নাগাল পাবে না, তখন তুমি বলবে—আলবাত এটা হবে।

'এই হয়। মা রূপেই পূজা করতে হয়। নইলে কাম দমন করা যায় না। উঁ? মাতৃত্বে তাকে পূজা করলেই আর কোন দমনের প্রশ্ন আসে না। সব নারীই আমার মা।'—দেখবে যে আর গবেষণা করে বার করবার তোমার কিছু নেই।

তখন এই কথাটাই মনে আসবে—তাহলে হস্ত-বন্ধনের কারণ কি? তাহলে হস্ত-বন্ধন হয়েছিল কেন? কিন্তু তুমি এমন ভাবে প্রলেপ দিয়ে চলে যাবে যে, এ হস্ত-বন্ধন খুলবে কে, কার ক্ষমতা। বুঝেছ?

তখন এইটেই তোমার জ্ঞানে আসা উচিত—আমি অতি অধম—নরাধম আমি। আমার পরেও আসিতেছে। তার যদি ক্ষমতা থাকে, হস্ত-বন্ধন খুলে দেবে। তার অস্ত্র সে যদি নিয়ে আসে? কিন্তু সে কথা তুমি ভুলেই যাবে। তখন আপাত মধুর দাঁড়াবে এসে। বুঝেছ? ঐ 'আপাত'র জন্যে ছুটে যাবে। দূর বাবা, আর দরকার নেই। বুঝ। ঝর্ণাটা কোথায়?

প্রসাদ—না মা, শিষ্য পরিবৃত হয়ে যদি এখন জগদ্দল পাথরকে নড়াতে পারছি না বলে আমি হামবাড়িম দেখাই, শিষ্যেরা কি বুঝবে না?

মা-মহাজ্ঞান—বুঝতে পারবে না। পাথরটা নাড়ানোই যায় না।

প্রসাদ—সেই সারেণ্ডারই করব আমি।

মা-মহাজ্ঞান—না নাড়ানো যায় না কি, এ নাড়াবার নয়। এ রকমই। এইখানেই তোমরা সবাই পূজা কর। (হাসি)

স্বীকার! এত সহজ! 'সৃষ্টি তোমার মিষ্টি বটে নেই কো বুদ্ধি আমার ঘটে।' না হলে আর এই কথাটা বলবে কি করে! ঐ করেই তো আঁক্ষেপের বাণী ছুঁড়তে থাকবে।

মা-মহাজ্ঞান—কি সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে আরো যাও আরো পাও। ও যাওয়ার শেষ নেই। তখন লোভ কাম! রাখ একধারে, দাও ছেড়ে আমাকে—আমি খুঁড়ি খুঁড়ি। আমি খনন করতেই এসেছি আমি খনন করি খনন করি। সে খনন করা নিয়ে বসে থাকতে দেবে না কি তোমাকে? এ্যাঁ, তুমি সৃষ্টির কি উন্নতি করলে আমার? এ্য-হ্য-হ্য-হ্য-হ্য অফিসারবাবু, তোমাকে যে মাসে মাইনা গুনব—কিসের জন্যে গুনব? এ্যাঁ?

মূলতঃই তোমার হাতে আমি একটা প্রেস দিয়ে রেখেছি, আমার মাসে পাঁচ হাজার দরকার। পাঁচ হাজার বুঝিয়ে দিয়ে বাবা তুমি খননটা কর তো। পাঁচ হাজার তোমাকে বুঝাতে হবে। যে পাঁচ হাজারের মধ্যে তোমার কোন ব্যক্তিত্ব কর্তৃত্ব থাকবে না, সেই পাঁচ হাজার আগে আমার হাতে ফেলো। ফেলে তুমি খনন কর। ছেড়ে দেবে তোমাকে, না?

প্রসাদ—না, সেই পাঁচ হাজার ফেলা হলেই তো মা খনন করা হয়ে গেল। ওর সেই পাঁচ হাজারের মধ্যে কোন ব্যক্তিত্ব থাকবে না—ঐ অবস্থাটা মানেই তো খনন করা হয়ে গেল!

মা-মহাজ্ঞান—তাই নাকি? ও খননটা কি আসল খনন হচ্ছে নাকি? পাঁচ হাজার টাকাটা যখন গুনছে? যদি পাঁচ হাজারের একটা টাকা কম হয়? সেই কমটা আমি নেব কেন? তাহলে টাকা গুনার দিকে লক্ষ্যটা রেখেছে। টাকা গুনায় লক্ষ্য থাকলেই খননে অবহেলা আসছে। খননে অবহেলা আসতেই হবে।

প্রসাদ—তাহলে বলছ মা, সে নিগূঢ় কর্মী হলে পরেও—নিরলস

নিগূঢ় নিখুঁত কর্মী হলে পরেও মা, সেই নাগালের দিকে তার লক্ষ্য নেই।

মা-মহাজ্ঞান—না। আছে, বারো আনা। ষোল আনা লক্ষ্যটা কোথায়? আমি কিন্তু সেই পাঁচ হাজারের পাঁচ হাজারই গুনে'নেব। পাঁচ হাজারের একটি কম নেব না। তোমাকে যে কাজ দেওয়া হয়েছে। তুমি আগে সৃষ্টির কি উন্নতি করলে আমার? এ্যাঁ, আমার কারখানায় তোমাকে আমি কর্মচারী রাখলাম। রাখলাম মানে? তুমি থাকতে চাইলে। তুমি চাইলে মানে? আমার ইচ্ছা ছিল। নইলে তুমি চাইতে পার না। সেইজন্যে আমার কারখানায় তোমাকে বেঁধেছি আমি। তুমি সেই কারখানার কাজ বুঝিয়ে দাও। বুঝিয়ে দিয়ে তুমি আমার কাছে এসে বস। তুমি না বুঝিয়ে দিয়ে বসবে কি করে!

তোমার ইচ্ছাটা আমার পাশে বসার। উঁ? তাহলে তোমাকে বুঝাতে বুঝাতে আসতে হবে। ওখানে অমনোযোগী হলে পরে তো এখানে বসতে পারবে না তুমি। সেটা আমাকে বুঝিয়ে দাও। না হলেই তো বলব, তুমি এইখানেই তো কাজেই অবহেলা করেছ। এ্যাঁ, তুমি সাধারণ কর্মীই নয়। আর তুমি কি না আমার পাশে বসে অফিসার হতে চাচ্ছ! বুঝেছ, সব কর্ম বুঝিয়ে দিতে হবে ভগবানকে।

খনন করে চল খনন করে চল। টাকা গুনছ বটে কিন্তু খননের দিকে লক্ষ্য আছে। আমি টাকা গুনে দিয়ে দিলাম। টাকা গুনার দিকে আমার লক্ষ্যটা কম নেই। টাকা গুনার দিকে লক্ষ্যটা—হিসাবে ঠিক মিলিয়ে দিতে হবে আমাকে। ঠিক পাঁচ হাজারই দিতে হবে।—বাবাঃ বলেছ পাঁচ হাজার লাও বাবা, আমায় খনন করতে হবে। বাবা বলেছ পাঁচ হাজার লাও বাবা, আমায় খনন করতে হবে। বাবা বলেছ পাঁচ হাজার লাওপাঁচ হাজার—এই হাতগুলো লক্ষ্য কর। বাবা বলেছ হাজার লাও পাঁচ হাজার। বাবা বলেছ পাঁচ হাজার লাও পাঁচ হাজার। অস্বাভাবিক ব্যস্ততা ফুটিয়ে তোলেন মা। এইটা আমার বেশী চলছে। লক্ষ্যটা ঐখানে যেয়ে পড়ছে। তখনই ধরে ডেকে নিল

—এসো বৎস, পাশেই বসো। তখন পাশেও বাপ ভাতারী, জায়গা দিতে পারবে নি আর। তখন বলবে, এত তাড়াতাড়ি তুই 'এসবি' বলে আমি জানিনি, আমার কোলে বসে পড়।

তা খন•টা তোমাব ঠিক রাখতে হবে।

প্রসাদ—তাহলে মা, মানব কল্যাণই বলি বা সংসারই বলি, এক কথায় বলতে হবে—সকলকে তৃপ্ত কর। সকলকে তৃপ্ত করে তুমি তোমার নিজে গবেষক হও। তৃপ্ত করার পর অবকাশ কোথায় মা যে গবেষক হব ? সেই গবেষণার তো একটা সময় দবকার।

মা-মহাজ্ঞান—কেন অবকাশ নেই। সব আছে। কেন নেই ? দিয়েছেই তো। খননও করতে পারবে গো তুমি এ-ও করতে পারবে। তুমি এক হাত খোল না। তুমি যখনই—ঐ যে টাকা গুনে দিচ্ছে না, সেই যে তৃপ্ত—প্রত্যেককে যে তৃপ্ত করছ প্রত্যেককে ওখানে ভুলিয়ে দিচ্ছে জান ? প্রত্যেকের অস্ত্র ছাড়িয়ে নিচ্ছ তুমি। ঐ তৃপ্ত করা মানেই তার অস্ত্র ছাড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে। প্রত্যেকের তোমার খননের দিকে লক্ষ্য পড়ে যাচ্ছে। ঐ তাদের পাঁচটা অস্ত্র এসে তোমার এক হাত খোলা, আরো দেখবে, পাঁচ হাত খুলা হয়ে গেছে।

প্রসাদ—কোথায়। আপনার খননে কেউ কি আহা করছে আজ পর্যন্ত ? আপনি যে ধারায় সংসার মন্দির হয়ে দেশে বিশ্বে সকলকে পরিপূর্ণ দিয়ে যাচ্ছেন।

মা-মহাজ্ঞান—কাকে আহা করতে বলছ ? তারা কি জানে তাদের অলিখিত অস্ত্র এসে আমার এখানে কাজ করছে ? তৃপ্ত। যখনই সে তৃপ্ত হচ্ছে তখনই সে তুষ্ট হচ্ছে। যে সেকেণ্ডে সে তৃপ্ত হল, সেই সেকেণ্ডে এক কোদাল মাটি উঠে গেল। সে তার জানল না। পাওনা কিন্তু তার নয়, এখানে আমার পাওনা এসে যাচ্ছে।

প্রসাদ—তৃপ্ত হলেই সে বাধা দিল না। বাধা না দিলেই তোমাকে সাহায্য করা হল।

মা-মহাজ্ঞান—বাধা সে দিক আর নাই দিক, সে নিয়ে কথা নয়,

সে তৃপ্ত হলেই আমার এখানে মাটি খুলা হয়ে যাচ্ছে।

যখনই তুমি তৃপ্ত হচ্ছ—আঃ কি চমৎকার রান্নাটা হয়েছে। এ রেঁধেছে। ব্যস হয়ে গেল। এ রেঁধেছে, এ কি করছে আমার জানবার দরকার নেই। এ রেঁধেছে। তাহলে তার একটা সংানুভূতি মন—সেই যে মন, যেটা নির্লিপ্ত মন যেটা নিস্পৃহ মন—সেটা এক সেকেণ্ড এসে এখানে পড়ে গেল। যাঁহাতক পড়ে গেল তাঁহাতক এক কোদাল মাটি খুলা হয়ে গেল। আচ্ছা, সে যে দিয়ে গেল সে তো জানে না। সে আবার জানে না কেন? সে জানে। সে তো আহাটা করল ঐখান থেকেই। আশ্চর্যটা তো ঐখান থেকেই হল।

তাহলে তার আহা আর আশ্চর্য সব তো আমি কেড়ে নিচ্ছি। আর সে তো 'আমি'টা নিয়ে পরিপূর্ণ হচ্ছে—'আমি খেতে পেলাম। আঃ কি চমৎকার রান্নাটা হয়েছে! আমি খেতে পেলাম।' ওখানে আমার 'আমি'টা সে নিয়ে নিল। আর তার আহাটা আমাকে দিয়ে দিল। সে কি জানতে পারছে?

তেল সলতে ভর্তি আছে বলেই তো শিখাটা এতদূর উঠেছে। কিন্তু লক্ষ্যটা পড়ছে কোথায়? সেই শিখার দিকে। তেল সলতের দিকে কি লক্ষ্য পড়ে? আলোটাকেই তো লক্ষ্য পড়ে। তেল সলতে দিয়ে জ্বালাব—ও তো জানা কথাই। আলো পড়েছে কতখানি, সেইটিই হচ্ছে কথা। সেই আলোতে কে কি কাজ করেছে। বুঝেছ, আলোটাকেই লোক লক্ষ্য করে, তেল সলতে লক্ষ্য করতে যায় না।

প্রসাদ—তাহলে কোন্ পথ দিয়ে এসেছ কি করে এসছ—এ কোন প্রশ্ন নয়, কি তুমি বিতরণ করে গেছ?

মা-মহাজ্ঞান—কি তুমি দিয়ে গেছ। কোন্ পথ দিয়ে এসেছ, সে কথা উঠবেই তো। জলে কখনো আলো জ্বলে, না জলে-তেলে আলো জ্বালে? পড় পড় করেছিলো ঝড় ঝড় করেছিলো। তাহলে নিখুঁত লেখা দেখতে পেয়েছিলে সেই আলোতে। আলোই তো পথটা দেখিয়ে দিচ্ছে। আলোটাই তো বলে দিচ্ছে। কোন্ পথ দিয়ে—সবই ঐখানেই ধরা পড়ে যাচ্ছে।

[মানুষ হয়ে জন্মে মানবতা দেখাবে কেউ, এ আর কি এমন বড় কথা! মানুষ্যত্বের বিকাশ বৈশিষ্ট্যই আমাদিগে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। মানবকল্যাণের ধারায় মনেপ্রাণে উদ্‌বুদ্ধ সিদ্ধ পুরুষ, বুদ্ধ থেকে বিবেকানন্দ প্রত্যেকে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী বলে পূজা পেয়ে, সসম্মানে নিজ নিজ আসনে অধিষ্ঠিত আছেন। কিন্তু মহাজ্ঞানের ভাবধারা সম্পর্কে সকলে কি ছিলেন সবিশেষ অবহিত? সে হলে তৎকালীন অনেক ঘটনা, নিছক অঘটন বলে, কালে কেন প্রতীয়মান হল?]

প্রসাদ—আপনার দর্শনে এক জায়গায় পেয়েছি, মানবতার বহু উর্ধ্বে মহাজ্ঞান। কোন মানবতাই মহাজ্ঞানের নাগাল পায় না। তাহলে পরে এই যে মানবতার বিকাশ—তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা থেকে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায়, এই মানবতা কি আপনার মহাজ্ঞানকে কোনদিন বুঝতে পারবে?

মা-মহাজ্ঞান—যেতে যেতে বুঝতে পারবে। এইরকম ক্রমোন্নতি হতে হতে যদি যেয়ে দাঁড়ায়। 'যদি'র কথা বললাম। এইরকম করতে করতে হয়তো কারো মধ্যে ঢুকে গেল। সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে সে দাঁড়িয়ে গেল। তাই বলে কি হাজারে হাজারে লাখে লাখে?

প্রসাদ—তবে যুগে যুগে মা, বিচিত্র মানবতার ফেরে বাঁধা মানুষের মন, আমার যেন কেমন মনে হয়, এ গভীর তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না। এই গভীর তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে চাইলে মা, ও মানবতার বাইরে যেয়ে দাঁড়াতে হয়। মানবতাটা কিছুই নয়—এই-টিকে আগে হৃদয়ঙ্গম করা চাই। এখন মানবতা মানবকল্যাণ এই ধারাতেই তো মানুষ উদ্বুদ্ধ চিরকাল। তাহলে পরে মা, এ গভীর জিনিস বুঝবে কি করে!

আপনি বলে যাচ্ছেন—পাঁক তোলো পাঁক তোলো, পাঁক উঠলে মাটি—মাটির পর মাটি—বিভিন্ন স্তরে পেরিয়ে তবে গিয়ে সেই ঝর্ণার সন্ধান পাবে। এই এত দূরের কথা শোনবার অবকাশই মানুষের নেই।

খুব বেশী হলে যেমন তেমন পাঁক তুলে—

মা-মহাজ্ঞান—তুমি বিচলিত হয়ো না। তুমি বলে যাও। নেই কি আছে, সে জানার তোমার দরকার নেই। তুমি পেতে চাচ্ছ সেই ঝর্ণার জল। তুমি পেতে চাচ্ছ, তুমি পেয়েছ, তুমি এবারে সেই পথ নির্দেশ দিয়ে, ফেলে রেখে চলে যাও। নিবে, নিচ্ছে না—এ চিন্তা তোমার কেন!

প্রসাদ— না, মুশকিল কি জানেন মা, আপনার পুকুর নিয়ে আমি বেশ সুন্দর কাজ করে যাচ্ছি তো। কিন্তু দেখছি, সেই পুকুরের দিকে কারো দৃষ্টি নেই। সবাই যার যার পুকুর নিয়ে মেতে আছে। আরে সেই পুকুর যে মূলতঃই পাঁকে ভরা।

মা-মহাজ্ঞান—নাই বা থাকল (দৃষ্টি ছিল)। তাহলে দেখেছ? না, এটা তুমি বড় ভুল করছ। এ বুদ্ধ চৈতন্যের ধারা। কি করে মানব-কল্যাণ করব? আরে, নিজের কল্যাণ কর তো, মানবকল্যাণ করতে হবে না। তোর কল্যাণ করলেই তার কল্যাণ হয়ে যাবে। অর্থাৎ তুমি সেই খনন করেই চলছ। এই দেখে তোমার কাছে ছুটে আসবে। কিন্তু তুমি বলছ—আমি কি করলাম, তোমরা দেখবে এসো। কি করলাম একবার দেখবে এসো। এটা বেশী বলো না।

প্রসাদ—ওরে এটা সেরা পুকুর—দেখবি আয় রে।

মা-মহাজ্ঞান—বেশী বার বলবার দরকার হবে না। তুমি হয়তো মানবকল্যাণের ধারাতে—মানবকল্যাণের ধারা নয়, স্ব-ভালবাসা—সহোদর, আমরা পরস্পর পরস্পরের সহোদর তো? প্রত্যেকে আমরা প্রত্যেকের ভাই তো? সেই স্ব-সহোদর হিসাবে তুমি ডাক—আমি একটা ভাল পুকুরে স্নান করছি, তোরা আয়। আয় রে।

তোরা আয় রে, স্নান করবি ভাল পুকুরে। আচ্ছা যখন দেখলে তাতেও এলো না, তখন তুমি তাদিগে বললে—দেখ, তোরা করছিস তো করছিস, একটা সময় এমন রাখ না, এই পুকুরটায় স্নান করবার জন্যে।

তুমি সে পুকুরে কিন্তু স্নান করছ দিন রাত। তুমি সে মাটি খনন করছ, গুছাচ্ছ, থিতাচ্ছ, সব করছ। আচ্ছা—তোমার প্রথম কথাটা না নিতে পেরে দ্বিতীয় কথাটা নিয়ে নিল। একটা কোন সময় গিয়ে স্নান করলেই তো হয়ে যাবে। বলেই স্নান করতে চলে এলো।

তুমি চাচ্ছ—আমি তো প্রথম ডাকলাম—ওরে তোরা আয় রে আমার সঙ্গে স্নান করবি রে। তাহলে এইটিই তার আদি কথা। আদিতে যখন গেল না, তখন সে নকলী কথাতে গেল—ওরে, তোরা একটা সময় ঠিক করে এইখানটায় স্নান কর। দেখলো যে, একটা সময় স্নান করতে এলেই, এ মধু ছেড়ে কি কেউ যেতে পারবে, আমি যে মধুতে মশগুল! মনে মনে ভাবল স্নান করতে করতে। আর তারা ওখান থেকে ভেবে নিল কি, আমরা যা করছি করে একবার স্নানটা করে নিলেই তো হয়ে গেল। তাহলে তো আমরা ওর দলের দলি হয়ে গেলাম। বুঝলে? বলেই তোমার কথা মত তারা স্নান করতে চলে এলো। সব করল। এই দেখলে তুমি—তারা স্নান করল। করলোও কিন্তু সেই পুকুরে স্নান। তোমার সঙ্গে ঘাটে দাঁড়িয়ে দুটো কথাও বলল। বলে তারা চলে গেছে।

তুমি হয়তো মনে কর সাত দিন পরে আবার স্নান করতে আসতে বলেছ। মাঝে মাঝে স্নানটা করতে বলেছ তো। প্রথমই দেখলে তুমি পনের দিন হয়ে গেল। এ্যাঁ!—ওরে আয় রে, তোদের জন্যে আমি স্নান করতে পারছি নি রে, পারছি নি রে। আয় রে আয় রে—করে তুমি যখন হামলা-হামলি করছ, তখন তারা আর একবার পনের দিন পরে এলো।

দূর গর্ধবচন্দ্র গর্ধব, পনের দিন যখন সময় নিয়েছে, তখন তুই ঐ রকম হামলা-হামলি করে তোর সময় নষ্ট করলি এ্যাঁ? বার কতক চাওয়ার দরকার ছিল—ওরে তোরা এলি না? কিন্তু আমি আমার কাজ করে যাচ্ছি। আর সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝতে পেরে গেছি, পনের দিন যখন হয়ে গেছে—আমি তো সাতদিন বলেছিলাম, আর আমার মনের ভিতর কি ছিল? আমি বলে দিচ্ছি সাতদিন, কিন্তু

আসবে ও কালকেই আবার। এইটিই তো আমার আদি ইচ্ছা। কিন্তু যে জায়গায় হলো, আমার আদিকে তারা—আদির উপরে পা দিয়ে, আদিকে কব্বর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা—পনের দিন পরে এলো। তাহলে এবারে হামলা-হামলি করা। আমার তো সময় নষ্ট হচ্ছে। এ্যাঁ?

আচ্ছা পনের দিন পরে এসে দুটো কথা বলে চলে গেল, স্নান করে। আবারও তুমি হামলা-হামলি শুরু করলে। তখন তারা দেড় মাস পরে দেখা দিল! দেখ তুমি কি মেড়া, তাদের জন্য সময় গুনছ! কিন্তু কথা হচ্ছে যে, তুমি এই রকম করে তোমার কিছুটা সময় নষ্ট করে দিলে। দিয়ে কিন্তু তুমি তোমার মতন স্নান করছ, ধীরে ধীরে এবারে তুমি 'ব্যাক' করতে রইলে। ধীরে ধীরে পিছোবে। কিন্তু তোমার তড়িঘড়ি ঘুরে পড়া উচিত ধীরে ধীরে ব্যাক করবে কি আবার!

আচ্ছা তুমি এসে স্নান করছ, ঘাট গুছাচ্ছ, জল বুঝছ—গুছাচ্ছ, থেতাচ্ছ, মাটি তুলছ—করতে করতে তারা যখন বছরান্তে এসেছে তখন দেখছে—যে ঘাট দিয়ে নামতো সে ঘাটে বুক পর্যন্ত প্রাচীর উঠেছে। নামবার আর রাস্তা নেই। জানে নি রে কোন্ ঘাটটা দিয়ে নামতে হয়! তারা তো ঘাটই গুলিয়ে ফেলেছে। উঁ?

আচ্ছা এবারে এটা একটু ভেঙে দেওয়া যাক। রূপকটাকে!—ওরে তোরা কি করছিস রে, প্রতি রোববারকে রোববার আয়, প্রতি রোববারকে রোববার আয়। ওরে সুভেন্দু ওরে কুঞ্জ ওরে বল্লভ ওরে রমাপদ, তোরা প্রতি রোববারকে রোববার আয়। এ্যাঁ? 'এসবি'নি যখন—ঐ আদি কথাগুলো সব আসছে—এবারে নামকরণগুলো করে দিয়ে যাচ্ছি। তারা রোববারকে রোববারই এলো।

তারপরে শূকরের হাঁড়ি কুকুরে নিতে থাকে। বিরাট একটা কিছু বলা আছে, দেখবে খুঁজে। এ্যাঁ? আচ্ছা, তারপরে তারা ঢিমা তেতালি করতে রইল। এই করতে করতে করতে দীর্ঘদিন ধরে দেখা গেল—ওদিকে ঢিলা যত এদিকে আগিয়ে যাচ্ছে তত। আর

বেশী হামলা-হামলি নয়। বেশী হামলা-হামলি আর 'করার দরকার নেই। তারা ভাবছে—আমরা তো গেছি, পরিচিত তো ও ঘাটে! যখন হোক যাব।

না হলে কখনো এত আত্মবিশ্বাস থাকতে পারে কারো যে বলে, কেবলমাত্র ছাই চাপা পড়েছে! কে বলেছে একথা—ছাই চাপা পড়েছে এঁ্যা? যে ব্যক্তি বলেছে সে সে ব্যক্তি তাকে যেন নতুন করে আবার চিনে। সেই ব্যক্তি এসে দেখল কি—মানুষ প্রমাণ কেন, তিন মানুষ প্রমাণ একটা প্রাচীর উঠেছে। সে ব্যক্তি যে কোথায় স্নান করেছিল, তার গুলিয়ে গেল। আর আসতেই পারল না।

অর্থাৎ সমস্ত তত্ত্বের সমস্ত সত্যের 'লিঙ্ক' কেটে গেছে তার কাছ থেকে। সে কি জানে, সে কি জানে? তখন সেই পুকুরে—প্রাচীর তো উঠে গেছেই, উপরন্তু প্রাচীরের—এ পাশটায় প্রাচীরের ভিতর পড়লে ওপাশটায় প্রাচীরের বাইর পড়ছে—সেখানে বিরাট বিরাট কাঁটা জঙ্গলের গাছ হয়েছে। সেখানে কিছু বাঘ-ভালুক ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। আমার প্রাচীরকে আগলে রাখবার জন্য। তারা সব দাঁড়িয়ে গেছে কিন্তু।

তাহলে ঘর পেরিয়ে রাস্তা, রাস্তা পেরিয়ে জঙ্গল, জঙ্গল পেরিয়ে প্রাচীর, প্রাচীর পেরিয়ে পুকুর। কি তফাৎ—কি বিরাট তফাৎ! জঙ্গলে ঢুকলেই তো বাঘ ভালুকে খেয়ে নেবে। জঙ্গলটায়ই তো ঢুকতে দেবে না। এঁ্যা?

এবারে এটা ভাঙলে কি পাওয়া যাচ্ছে? যখন সে আসতে চাচ্ছে —আসবে বলেছে, তখন দেখা গেল আরো বহু লোক এ নিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। সে যে একদিন এসে দাঁড়িয়ে ছিল বসেছিল, তাকে কে পাত্তা দেবে। কেন পাত্তা দেবে, এঁ্যা? কেন পাত্তা দেবে?

এক বছরের মামলাতে পশুপতি দোকান ছেড়েছে। এক বছর। না, এক বছর হয় নি। এই বৈশাখে এক বছর হবে, ছ'মাস। ছ' মাসের মামলাতে নূতন 'ড্রাগ হাউস' হয়েছে। এঁ্যা? আচ্ছা যেখানে পরিচিত নবকুমার!—বাবা, এইটা করুন। বাবা, সেইটা করুন। গৌতম তো

না হলে আছেই সে দোকানে, বাদ দিয়ে দাও। পশুপতিকে এখন ঘরে ঢুকতে হলে, ছুটো হাতজোড় করে চোখের জল গড়িয়ে ঢুকতে হচ্ছে। চিনতে পারছে? ছ'মাসে তার এই পরিণতি! তাহলে ছ'-বছরে কি পরিণতি হতে পারে! বার বছরে কি পরিণতি হতে পারে, এঁ্যা?

আত্মবিশ্বাসকারীদিগে—আত্মকেন্দ্রিকদিগে ঐভাবেই থাকতে বল। কিন্তু তুমি বৎস, ভুল করিও না।

প্রসাদ—এখন একটা কথা মা, আগে যেমন হামলা-হামলি করে ডাকতে ইচ্ছা জেগেছিল, এখন ধারাটা যদি ঘুরিয়ে দেওয়া যায় এই ভাবে। প্রতিদিন ভোর হলে মসজিদের পুরোহিত দাঁড়িয়ে যেমন বলে, 'আল্লা হো আকবর'—একটা ডাক ছেড়ে দেয়। ডাক ছাড়লাম, কাউকে উদ্দেশ্য করে নয়। ডাক দিয়ে বেরিয়ে যাব।

মা-মহাজ্ঞান—কিন্তু তুমিই তো পারবে না এখন। তুমিই তো পারছ না। তোমাকেই তো তোমার চেনা হয় নি। তোমাকেই তো তোমার খুঁজা হচ্ছে না।

প্রসাদ—না, চেনার মধ্য দিয়েই মা, ঐ ডাকটা কিন্তু।

মা-মহাজ্ঞান—সেই তো। যখন চেনা হয়ে যাবে তখন কিন্তু আর ডাকবে না। চেনা হয়ে গেলে এড়িয়ে যেতে চাইবে।

প্রসাদ—এই যেমন আপনি এড়িয়ে যাচ্ছেন। এক সময় সকলকে ডেকেছেন তো।

মা-মহাজ্ঞান—এই। আমি ডেকেছি চিরকালই। আমি আজও ডাকছি। আমি চিরকালই এড়িয়ে আছি। আমি একটা মাপকাঠির উপরে দাঁড়িয়ে আছি।

প্রসাদ—আমার তাহলে ভুলটা হচ্ছে কোথায়?

মা-মহাজ্ঞান—তোমার ভুলটা হচ্ছে—ঐ যে, 'আমি'কে সেই 'তুমি'র মধ্যে মিশাতে যত দেরী হচ্ছে।

প্রসাদ—'আমি' মারতে পারছি না বলেই বলছেন তো?

(মলি এসে এক গ্লাস জল ধরে দিল মাকে। মা বললেন—বুঝতে পেরেছে জল দরকার।)

এই এখনই দেখ, ভিতরে এখন সেটা আমার সরে আছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি, সে যেন সরে দাঁড়িয়েছে।—'আর বলিস নি, আর বলিস নি' সেইজন্যই বলি যে এমন এক একটা সময় আসবে না যে, আমি পারব। কিন্তু সে সময়গুলো না আসলে, আমি কথা বলতে গেলেই আমার মাথা ধরে যাচ্ছে, আমার গলার স্বর পড়ে যাচ্ছে। আমার ভিতরে খুব কষ্ট হচ্ছে।

প্রসাদ—অথচ এতক্ষণ যে কথা বললে কোন তো অসুবিধা বুঝতে পারলাম না।

(আজ শুধু কথা বলা নয়, সমান পাশে পর পর সরস্বতী পূজা-প্যাণ্ডেলে মাইক বাজছে তারস্বরে চিৎকার করছে প্রতিবেশী। বাস্তব-সত্তা ও সত্য-জিজ্ঞাসার মাঝে দাঁড়িয়ে 'মা-মহাজ্ঞান' অষ্টপ্রহর কত না বিভিন্ন ধর্মী জটিল ক্ষেত্র ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আদি সত্যের বিচার ব্যাখ্যা বিতরণ করে চলেছেন! তা দাঁড়িয়ে উপলব্ধি বা হৃদয়ঙ্গম হলে, সমগ্র সত্তায় শুধুই অনুভূত হয় অপার বিস্ময়।)

মা-মহাজ্ঞান—না, এ বুঝতে পারলাম, সেটা সরে গেছে। ঠিক যেন স্বাভাবিক ধারায় একটা জল তেষ্টা অনুভব করলাম। আরেকটু পরে খেলেও চলত। কিন্তু ঠিক সময়ে এনে জলটা পৌঁছে দিয়েছে।

সেই আমি'কে তুমি চিনতে পারছ না। তোমাকে তুমিতে মিশাতে হবে।

প্রসাদ—তাহলে আমার একটা আমিত্ব আছে বলেই তো আমি চাইছি।

মা-মহাজ্ঞান—আমিত্ব নয় ওটা। ওটা সহানুভূতি মন। বিকারের যে সহানুভূতি। সেই সহানুভূতি মনেই তুমি ডাকছ। তুমি তো সেই বিকার নিয়েই ঘাঁটছ। ঘাঁটছ বলেই ডগবগ করছ বিকারে। বিকার সরবার জন্যে যে ডগবগানি। বিকার নিয়ে ভোগ করার ডগবগানি নয়, বিকারকে ত্যাগ করার যে ডগবগানিটা। সেই ত্যাগের ডগবগানির

সুর থেকে ওদিকে ডাকছ—এই রে, ওরাও তো ডুবে যাচ্ছে, ওরাও তো ডুবে যাচ্ছে! এইটা যখন তোমার কাছ থেকে সরে যাবে তখনই আর ডাকবে না।

যখনই আসবে, পথ খোলা আছে। আরে আসবে তারা কি করেটা! আসবে-টা কি করে! তোমাকে তাড়াতে হবে না। সে আসতে পারে না। সে কি কখনো আসতে পারে! ঘর পেরিয়ে রাস্তা পেরিয়ে জঙ্গল পেরিয়ে ও চিনতেই পারবে না—বিরাট বিরাট প্রাচীরের ভেতর-বাইরে গাছ হয়ে গেছে। আর সেখানে হিংস্র বনজন্তু সব বাস করছে, উঁ? এবারে সেই বনজন্তুগুলো কি? তা এখন আর বর্ণনা দিলাম না, থাক।

কোথায় ধরে কোথায় শেষ করলাম! 'সৃষ্টি তোমার মিষ্টি বটে' ওটা ধরে কোথায় চলে এলাম। ওটাই হয়তো ভাল করে বুঝানো হল না।

প্রস্তুতি পর্ব

[হে ভগবান, কেমন করে কে বা কারা তোমার গুণগান গাইবে। “নয় যে কুসুম সুন্দর শুধু/ওগো সুমিষ্ট গন্ধ যে তার করে আকুল। / অমৃত-ময় মধু।” কিন্তু হায়, ইন্দ্রিয় রস কেউ কি ভুলতে পারে ? সবাই জিভের স্বাদ মিটাতে ব্যস্ত। অভাব না কেহ গ্রাহ্য করে। কিসের কি এত প্রাচুর্যের অহংকার। “দিয়েছ সবই তুমি হরে নিতে লাগবে সময়/ জানে না কি কেউ কতখানি।” এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই বলেই, তুমি-জ্ঞানময়কে স্বীকার করে না কেউ। এমন ভাব বিনিময়ের ফেরে প্রথম দুটি গানের সাধনা ধরা।

মানবীয় যত ব্যর্থতার বুকে দাঁড়িয়ে ‘মা-মহাজ্ঞান’ শ্রীভগবানের দ্বারস্থ হয়েছেন। প্রশ্ন তো অনেকই ভক্ত করতে পারেন, কিন্তু ভগবানের সঙ্গে বোঝাপড়া তো চাট্টিখানি কথা নয়। পরম ভক্তের বিনীত নিবেদন—“কেন এমন করে বাস ভাল/পৃথিবীরে তুমি শুনি ?” এমন প্রশ্ন বলা বাহুল্য বিস্তারিত উত্তরের অবকাশ রাখে। এখানে তারই নিগূঢ় সার-সংক্ষেপ। তবে এ গানের শেষে সামান্য কটি কথা বাথা বাড়ায়।

তৃতীয় গানের প্রশ্নোত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে কি চতুর্থ গানের বয়ান রচিত ? তাহলে কেন ‘মা-মহাজ্ঞান” তৃতীবার সূচনায় গাইছেন—‘জানতে তোমায় কেউ জানে না।’ স্থূল ভাবে বাঁচা-মরার বাইরে কিছু কি এদের ভাববার নেই ? যত ঔদ্ধত্য উপায় না বুঝে পায়। তবে কি ঔদার্য পায় ? পরম পুণ্যবান গাইছেন—“এনেছিনু আমি জানি/আমার সম্পদ করেছি খরচ/কে বুঝাবে আমারে তাই।” অম্লান বদনে হাসি মুখে চরম দুঃখ বরণ করে নিয়েছেন তিনি। সেই সুপ্রাচীন বৃক্ষ কিসের প্রতীক ; তা যে একান্তই গবেষণার বিষয়। কে কি অস্বীকার করবে। মানুষের সাধ্যসাধনা কি-বে ভয়াবহ পরিণতি

টেনে আনে, সে সম্পর্কে আমাদের কারই বা কি অজানা আছে! অগত্যা ধিক্কারই সবার জীবনে মূল পাওনা বলেই দাঁড়িয়ে যায়।]

সন্ধ্যায় বলেন মা—আজ নূতন উপসর্গ। মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করছে। সব ভুলে যাচ্ছি কি? সব দমড়ে বর্ম হয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। এবার আর উত্তর নয়। ফলনে সব দেখতে পাবে।

হে ভগবান,
কেমন করে গাইবে তারা
তোমার গুণগান!
হে ভগবান!
ভাবি সদাই তাই গো আমি
ভরে আছে জঞ্জালেতে
দেখতে না পাই
সুন্দর সুঠাম তুমি।

হে ভগবান,
সদাই কানে প্রতিধ্বনি—
আমার আমার কি আছে আর,
হব মালিক তারই আমি।

হে ভগবান,
দাঁড়িয়ে আমি তাই
দেখি গো, ভাবি সর্বদাই।
গড়েছ তুমি জানি
সৃষ্টি তোমার সুন্দর যে—
তুমি সুন্দর দেখেছি আমি
দাঁড়িয়ে আছে বনের মাঝে
সুন্দর ফুল ফুটেছে সেথায়

অন্ধ নয়ন

কে পায় দেখতে তাকে !
ও ভগবান,

নয় যে কুসুম
সুন্দর শুধু
ওগো সুমিষ্ট গন্ধ যে তার
করে আকুল—
অমৃতময় মধু ।
ও ভগবান ।

এমনি সবার নেশা
ভুলিতে পারে না ইন্দ্রিয় রস
শুধু মেটায় স্বাদ যে জিভের ।
তোমারই তৈরী জিহ্বা
সেই স্বাদেতে স্বাদি তারা ।
গন্ধে আকুল হয়ে রয়েছে
কেমন করে এ রস-স্বাদ
পাবে তারা !

ও ভগবান,
আমি দাঁড়াই তোমার চরণ পাশে
ভাবি গো শুধু অপমান !
চিনিতে তোমায় পারে না জানি—
জানি কেমন করে—
কেমন করে নেই গো বলে
ছড়ায় তাদের মুখ বাণী ।

ও ভগবান,
নয়নের জলে চরণ এঁকেছি
সেই দু'খানি চরণ শুধু
দাঁড়িয়ে বুঝেছি।
কে তুমি—কে তুমি সৃষ্টিকর্তা!
শুধু গো তোমার—
তোমার করে অপমান।

সহিতে পারি না আমি.
বুক ভরা ব্যথা প্রভু
করি নিবেদন চরণে তোমার।
হারায়েছে জ্ঞান—
ওগো কেমন করে ফিরে পাবে,
সেই অনুরোধ—ও ভগবান।
সহে যাই কেবল আমি।
জানি আমার প্রভুর অপমান
কানেতে কেমনে শুনি?

দাও প্রভু দয়া করে
চাই তোমায় বারে বারে।
মিছে মায়ায় রইছে ঘেরে
মিছের আশে ভরিয়ে তোলে
এবার দিই কোথায় স্থান!
ও ভগবান,
গাহিবে কে গো তোমার—
তোমার গুণগান?
সুন্দর জানি তোমারে
তাই তো আমায়—

বলব না।

আট দিন বৈদ্যুতিক গোলযোগ চলছে। আজ আলো জ্বলল। আগের গান লিখে মায়ের কাছে পড়ি। "সুন্দর জানি তোমারে—" থেকে অংশটুকু কেটে দেব বলতে মা বলেন, তাহলে গোটা করে নে।

'অসমাপ্ত অংশ মা'—বলে শেষ উল্লেখ করব কি, 'মা-মহাজ্ঞান' গান ধরেন—

সুন্দর জানি তোমারে
তাই তো আমায় লেগেছে ভাল
দিয়েছি সঁপে চরণে তোমার
আমার মন প্রাণ।
ও ভগবান,
দাও বুঝায়ে তুমি সবারে
আমার মতন চিন্ময় তোমায়
কেন করে গো অপমান!
ও ভগবান, ভগবান।

ডাকুক তোমায় বারে বারে
চিন্মুন তোমায় আপন করে
ভুলে যাক ইন্দ্রিয় স্বাদ
তবে তো দেখা তবে তো সাড়া
দেব গো ফিরে!
ও ভগবান,

নয় যে তুমি নিষ্ঠুর জানি
তবে কেন তারা করে শুধু
আমার আমার!

ভুলে যায় ভুলে যায়
করেছেন সৃষ্টি যিনি।

ও ভগবান,
কেমনে সইব এ ব্যথা
জানাই তোমায় তাই তো আমি,
আমার ব্যথা-ভরা প্রাণ—
ও ভগবান।

দিয়েছ সবই তুমি
হরে নিতে লাগবে সময়
জানে না কি কেউ কতখানি।
তবে তোমায় ভুলে আমার বলে'
কেন বেঁধেছে সেই মহাপ্রাণ।
ও ভগবান।

যার কেহ নাই তুমি আছ তার
দাঁড়ায় সবাই তারই দ্বারে
আসে যায় কেবল বারে বার।
ভগবান।
কেন চিনিতে পারে না তোমায়
চিন্তা আমার তাই যে সদাই।
দাও ফিরে দাও তুমি সবারে
ওগো চিন্তুক তোমায়।

হারিয়েছে সে জ্ঞান তারা
তাই তো ভাবে—
কে আছে কোথায়—

গাহিব কাহার গুণগান
ও ভগবান !

হয়েছে, সমাপ্ত ? (হাসি)

এসেছি তোমার দ্বারে।
শুধাই প্রভু, চাই অনুমতি
দিও গো তুমি—
রেখো গো মনে ভৃত্য বলে।
শুধাই তোমায় আজ গো প্রভু
দাও উত্তর তুমি আমারে।

ওগো প্রভু,
করজোড়ে দাঁড়ামু দ্বারে।
নয়ন দুটি স্থির করেছি
তোমার চরণ পরে।
এবার জেনে নাও
অন্তরযামী তুমি,
দাও উত্তর প্রশ্ন বুঝে—
কেন এসেছি আমি ?

কে চাও উত্তর শুনি ?
দেব উত্তর কি তোমারে !
দিচ্ছি অভয় তোমায় ফিরে
কর প্রশ্ন তুমি।
কি দিব উত্তর
তোমায় আমি !

করবে আমায় প্রশ্ন নানা
তোমায় আমায় বোঝা পড়া
হবে যখন
ফিরে যাবে অমনি তুমি।
'কেন করিতে এসেছিনু
প্রশ্ন নানা!'
দিনু আমি অভয় ফিরে
কর প্রশ্ন—ভক্ত
তুমি আমারে।

ওগো প্রভু,
যদি দিয়েছ অভয় মোরে
তবে দয়া করে করো ক্ষমা।
প্রশ্ন আমার আবোল তাবোল;
শুধু বুঝে নিতে চাই
তোমার কাছে
ও প্রভু, করো না যেন
আমায় মানা।

বলি এবার ধীরে আমি—
কেন এমন করে বাস ভাল
পৃথিবীরে তুমি শুনি?
ও প্রভু, জেগেছে আমার মনে—
কেন বাস গো ভাল তুমি?
সৃষ্টি তোমার দিকে দিকে
তবে নজর কেন সর্বসময়
সর্ব্বক্ষণে!
বল প্রভু, বল আমারে।

একটুখানি দাও সময়,
চাইছি সময় আমি তোমারে।

ও প্রভু,
জানি আমি জানি
কর্তা তুমি সবার হয়ে
কেন অমন করে
হাসলে তবে শুনি ?
বল গো বল আমারে।
আমি মূর্খ অজ্ঞান
তাই করেছি প্রশ্ন জানি
আমার—আমার তুমি বলে।
বলে দাও।

কি দেব উত্তর তোমারে!
ঘুরে ফিরে যাও গে দেখ
পাবে উত্তর তুমি সদাই যে রে।
কেন এসে শুধাও শুনি ?
দিয়ে রেখেছি উত্তর আমি।
কেন বাসি ভাল পৃথিবীরে
দেখবে তখন চিনবে যখন তুমি।
ফিরে যাও
বলব না—মূর্খ বলে।

জানি জেগেছে প্রশ্ন যখন
তখন তোমায় ভাবব আমি।
এখন তুমি অবোধ বলে,
করবে কাঙ্গাল কত জানে।
যখন নিখুঁত করে জানবে তুমি—

বুঝবে ক্ষণে ক্ষণে।
ফিরে যাও ফিরে যাও
দেব না উত্তর আমি।

যাব না ফিরে ওগো,
কি নিয়ে ভুলব আমি!
ঝাঁপ দেব গো কাহার পরে?
ওগো দাও বলে দাও
তুমি আমারে—
দাও গো প্রভু ইঙ্গিত করে।
না দিলে অস্ত্র মোরে,
না দিলে শিখায়ে তুমি
কেমন করে রণ মাঝে
পড়ব গিয়ে আমি!
ও প্রভু, প্রভু।

যদি বলে দিই
আমি তোমারে
অস্ত্র নিয়ে দাঁড়াবে সেথায়,
ক্ষেত্রে জয়ী হবে তুমি—
এ তো জানা কথা জানা ওরে।
জান নাই কিছুই তুমি,
এসেছে দুর্জন জন
আগিয়ে সমুখে তোমার,
নাই যে হাতে অস্ত্র তোমার
না জান যুদ্ধ কেমন।

সেইখানেতে দাঁড়াবে গিয়ে
করবে না ভয় করবে না ডর

নাই যে অস্ত্র নাই যে কিছুই।
তবে 'আমি' দিয়ে করিব যুদ্ধ
হব জয়ী সবারও মাঝারে।

হল? আর বলব?

তখন তোমায় বলবে জয়ী।
না ছিল অস্ত্র, না জানে যুদ্ধ
না চেনে রণ কাহাকে বলে।
সেইখানেতে ধন্য ধন্য
করবে তোমায়
দাঁড়িয়ে ভাববে তুমি—
'কে দিল উত্তর এসে'?

ফিরে চলে যাও
কেন রও দাঁড়ায়ে—
বহাও তোমার সময় হেথায়?
তোমার সময় নিয়ে
রয়েছি দাঁড়ায়ে
আমি যে এইখানে।
সময় তোমার হারিয়ে গেলে
কোথা থেকে দেব আমি
ভাব এখন তাই।
যাও ফিরে যাও।

কেন বাসি ভাল পৃথিবীরে?
সৃষ্টি আমার জানবে তুমি,
জানবে সেথায়
কেমন করে গড়েছিনু

আমি কাহারে।
তেমনি করে গড়বে সেথায়
ভাববে তুমি তোমার
আপন করে।

এসেছ আজ কোথায় শুনি ?
কে তোমার আপন বলে হয়েছে মনে ;
কাহার লাগি কাঁদ তুমি ?
এ ধন তোমার কোথায় থাকে
কেন মাতামাতি কেন এত ভাবা ?
এবার শুধাই তোমায়
আগে দাও উত্তর
তুমি আমারে।

মা-মহাজ্ঞান—এটা রইল এই পর্যন্ত। আর বলব নি কিন্তু। এই বাকীটা তোমরা ভেঙ্গে বের কর এবারে। সবই বলে দিলে তো হয়ে গেল ? এবার বাকীটা তোমরা বলে নাও।

প্রসাদ—তাই তো।

মা-মহাজ্ঞান—'তাই তো' নয়। এ গেলা নয়—বুলবুলি বড় ফল গিললেই হচ্ছে না হজম করতে হবে। তাই তো !

প্রসাদ—ধরে তো রাখি এখন, যে বোঝার বুঝবে।

মা-মহাজ্ঞান—তুমিই বুঝে আমাকে উত্তর দাও। প্রশ্ন তুমি করেছিলে। অন্যে প্রশ্ন করতে আসে নি। তুমিই এ প্রশ্নের উত্তর দাও।
যে কাঁদে সেই কাঁদায়।

সদাই ভাবি ক্ষণে ক্ষণ—
জানতে তোমায় কেউ চাহে না ;
শুধু জানে কেবল
জীবন মরণ।

সদাই ভাবি ক্ষণে ক্ষণ।
তোমার হাতের পুতুল গড়া
জানি—বিধি হে,
এই প্রকৃতির সৃষ্টি করা।

জনে জনে তাই
করছে বিচাব নানা দিকে
হাসছ তুমি দাঁড়ায়ে অন্তরালে ;
ওগো কেমনে বোঝাই !
সদাই মনে করে—
এমনি করে হয় সৃষ্টি,
কে তারে আবার গড়ে !

মানে কেউ,
মানে না জানি।
যখন যায় ফুরায়ে আপন থলি
চিন্তা করে তখনি তিনি।
হয়েছে ভাণ্ডার খালি
তবে কেমন করে যায় যে ভরা
বুঝি ভরার মালিক—
মালিক তিনি।

তখনই তোমায় স্মরণ করে,
আগে ভেবে মনে ধরে,
যদি করতে পারি ভাণ্ড পূরণ,
তবেই তারে জানব আছে—
করব স্মরণ।
নইলে পরে নাই।

এনেছিনু আমি জানি
আমার সম্পদ
করেছি খরচ ;
কে বুঝাবে আমারে তাই !

ছ্যাখ কি দেখতে পাচ্ছি জানিস—একটা বিরাট গাছ, মস্ত বড় গাছটা, সে গাছটা বোধহয়—দু'শ বছর কি না কে জানে !

এটা যেন আধ পোড়া বা কোথায় যেন ঘা অংশ। কিন্তু খুব চিন্তা করলে মনে হচ্ছে। কি ভয়ঙ্কর সে।

তার ভেতরটা এমনই হয়ে গেছে কিন্তু সেটা দাঁড়িয়ে আছে কি করে ! এটাও তো একটা চিন্তার কথা। উঁ ?

আবার এ কথাও মনে হচ্ছে—এই সবে এর রস রক্ত বেরিয়েছে। সেইজন্য একটা লালচানি লালচানি রক্তানী ভাব। কিন্তু পিছন দিকটা মনে হচ্ছে—শিকড় কাঁচা আছে। সেই এক দুটো শিকড়ের উপরেই সে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝলি ?

আচ্ছা উপর দিকটা দেখলে চোখে কুলোচ্ছে না। উপর দিকটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু তলার দিকে মনে হচ্ছে অনেক দূর শিকড় চালিয়েছে। বহু জাল বিস্তার করেছে। বুঝছিস ? যেন মনে হচ্ছে হাত দিয়ে চেঁছে বের করে নিয়েছে না কি ? কি ব্যাপার। হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ, দৈব !

এগুলোকে এরা উড়িয়ে দিতে চায়, না ? এটা কি ? এটা কি কিছু বোঝে এরা ? না বুঝে না। অস্বীকার করতেই এরা জন্মেছে। স্বীকার এরা করবে কখন ! স্বীকার এরা সব সময়ই করে। কিন্তু তবুও এমনি গঠন এদের যে, এদের জিভ কিছুতেই ব্যক্ত করবে না। এই হয়।

তাই তো ভাবি ক্ষণে ক্ষণ
এ কি তোমার সৃষ্টি-ধরণ !
যদি চাই করিতে সত্য পালন
তবে নেই যে সাথী আমার কেহ

ধরে নাই ফুল যে আমার
দেয় না তাড়া আমার যখন।

একা মনে তাই
ভাবি গো তোমায়।
মাঝে মাঝে হয় যে মনে।
তুমি দাও বুঝায়ে
দাও গো এসে সবারে হেথায়।
ভাবি কেবল আপন মনে,
আপন আপনি গঠিত—
ছিন্ন এখানে।

বিধি হে,
আমি দাঁড়িয়ে ভাবি
চিন্তা করি, পাইঁ না কিনার।
বোঝায় আমায়—
আমায় সবাই যে।
আমি কেবল একা জানি
পথ চলি তাই আপন মনে
শুধু বাঁধা আমার—
আমার তুমি।

পারব না,
আপন বোঝা বইতে পাগল—
আনন্দেতে আত্মহারা।
সবাই মজে আছে যে ;
চায় না করিতে স্বীকার জানি।
আসিলে বিপদ সমুখে
সমুখীন করে যায় পিছারে।

কে বলে আল্লা তোমায়
কে বলে গড ভগবান—
তুমি ঈশ্বর এসো গো—
এসো গো ডাকছি আমি।

হায় বিধি,
ভাবি অবাক হয়ে তাই গো আমি!
কেউ বা তোমায় করজোড়ে
বারে বারে প্রণাম করে,
কেউ বা আবার ধূলির পরে
যায় লুটায়ে—
ধরণীকে সে আঁকড়ি ধরে।
কেউ বা আমার অন্তরালে
গোপন করে জানায় ব্যথা—
আছ তুমি স্বীকার করে।

এমনি তোমার সৃষ্টি গড়া
বিধি, অবাক হয়ে ভাবি কেবল
করে যাই পালন আমি
জানি তোমার সত্য ব্যাখ্যা করা।
শুনি শুধু একাই আমি।
চাও না বোঝা বইতে কেন!
বিধি হে, বিধি হে—
পশুরূপী মানব
দেখে যাই যে আমি।
মনে ছিল বল—কত যে আশা;
সৃষ্টি মাঝে শ্রেষ্ঠ তোমার
মানবের মাঝে পাব দেখা।

বিধি হে,
অবলা প্রাণীরে আমি
কেমনে বধিব শুনি ?
বাক সরে,
পায় শুনিতে সবই জানি !
সেইখানেতে শ্রেষ্ঠ তোমার
সেই গড়া মনুষ প্রাণী।
তাদের মাঝে খুঁজি কেবল।
বিধি হে, পশু হতে অধম তারা
দেখে বিচার করি যে।

দাঁড়ায় তারা জনে জন,
জানি নাড়ে নাই সিং যে কভু,
নড়ে না কেশর,
করে না হালুম কভু কখন।
কোথায় তাদের লুকানো ছুরি
বিষ মাখানো রেখেছে ধরি ;
কখন কোথায় দেয় যে ভুবে !

বিধি হে,
অবাক হয়ে চাই মানবের
আপাদ থেকে মস্তক হতে।
এই তো শ্রেষ্ঠ মানব জানি
যদি হত পশু বাসতাম ভাল,
নেই যে জ্ঞান—
বোধগম্য কিছুই মানি।
মানব, বলে যাব আর কি যে শুনি !
শুধু করে যাই
হায় হায় !

ভূত-ভগবান

[পূর্বাভাষে দ্বিতীয় পর্যায়ে উদ্ধৃত অংশ-বিশেষ উল্লেখ** করে বিস্তারিত বুঝে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষায় একসময় 'মা-মহাজ্ঞান' সকাশে প্রশ্ন নিবেদন করি—"মা, দুর্বল মনে ভয়—যা ভয় তাই ভূত। ভূত বলতে বলছ অজ্ঞতা। বেশ বুঝলাম। তা মা, ভয় ভূত ভগবান—এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলা নেই।"

হুঁঃ, সুবিশাল দর্শনের কোথায় কি আছে, সে বিষয়ে বারো বছরে কি এমন ধারণা জন্মাতে পারে! বারো যুগই আর কি এমন বেশী সময়! সেই সূত্রে প্রশ্নটিই অবান্তর। এ কথা আবার অতি সত্য, মায়ের বলতে যত সহজ, আমাদের বুঝতে তত কঠিন। 'ভয় ভূত' নিয়ে বেশ কথা হচ্ছিল, তার মধ্যে 'ভগবান' প্রসঙ্গ এনে অযথা ব্যতিব্যস্ত হওয়ার কোন মানে হয় কি? অর্থ না পেলেও কথায় গানে পরমার্থ বিস্তর মেলে এখানে। যা কিছু তত্ত্ব সার্থক বুঝি গভীরতা-গুণে। তবে তিনি তো অকাতরে বিলিয়ে দেবেন, আমরা এখন ঠিক ঠিক মিলিয়ে নিতে পারব তো।

'মা-মহাজ্ঞান' বৈশিষ্ট্য সকলকে স্তম্ভিত করে বটে। প্রশ্ন যতই কেন অসংলগ্ন বা অপ্রাসঙ্গিক হোক, তাঁর উত্তর কখনো কাউকে এতটুকু বিব্রত করে না। অবকাশ নেই বুঝলে উভয় পক্ষে ব্যস্ততা বেড়ে যায়। সেই সূত্রে নানান্ রহস্য ভেদ করার আশায় ভালবাসায় ধাপে ধাপে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এগিয়ে যান তিনি। আমাদের কার কেমন যোগ্যতা সে তো বিলক্ষণ জানা। যে যার অন্তরে সচেতনতার আভাস বুঝে পাই। আধ্যাত্মিক জগৎ কখনো অবান্তর বা অলৌকিক কিছু বলে মনে হয় না। সূক্ষ্মতা স্বীকার করি, বিচার-বুদ্ধি-গ্রাহ্য যুক্তির ধারায় মুক্তি লাভের পথ সুগম অনুমান করি। যথার্থ উপলব্ধি সমন্বয়ের ধারায় স্বাভাবিক পথ পায়। নিত্য নব নব ধারায় হয় আমাদের চৈতন্যোদয়।]

মা-মহাজ্ঞান—ভয়, ভূত, ভগবান—এই কথা তো ? তা ভয় থেকে আসছে ভূত। আবার ভয় থেকে ভগবানও। কি করে ? ভয় থেকে ভূত হয়, ভগবান হয় কি করে।

যদি বিনয়ী ভক্তিবাদী নম্র মন হয়, তবে সেই ভয় থেকে আসে ভগবান। এবং চলার পথে একটুখানি যদি বাঁক ধরে না যায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় ভূত। ভূত বলতেই আমরা ছায়া বুঝি তো। ভগবানও তো সেই ছায়ারূপী এসে দেখা দেন। ছায়া বলতে যদি উভয়ই বুঝায় তাহলে ভূতে ভগবানে তফাৎ বুঝবি কি করে ?

অতএব বুঝতেই পারছ, রাস্তায় মেপে চলাব একটু গণ্ডগোল হয়ে গেলেই, ভূত ভগবান ভগবান ভূত সব এক হয়ে যায়। খুব লক্ষণীয় পথ চলা হলে পরে, ঐ ভয়টা ভগবানে গিয়ে পৌঁছায়। আর না হলে ভূত ভগবান মিলিয়ে যায়—ভূতকেও ভয় করে ভগবানকেও ভয় করে। তবে কেউ শুধু ভূতকেই ভয় পায়, ভগবান বোঝে না। যাই হোক নানা কারণে বিভিন্ন অবস্থায় এই সব জিনিসগুলো দেখতে পাওয়া যায়।

এখানে বলছে কি, স্নায়ুব দুর্বলতা থেকে আসছে ভয়। এবার দেখ জন্মসূত্রে তার কি পাওয়া হয়েছে। শিশুকে লক্ষ্য কর—ভয়টা তার কোন্‌দিকে। একটা কিছু পড়ে গেলে, সে চমকে উঠল। তার মানেই সে ভয় পেল। কোন শিশু চমকালো না। যখন শিশু কথা বলতে শিখেছে, তখন—'ঐ রে কে আসছে দেখ,' বললে কোন শিশু উঁকি মেরে দেখতে চায়, আর কোন শিশু মায়ের কোলে মুখ লুকায়।

ভয় না পেলে জানবে স্নায়ু দুর্বল নয়, উপরন্তু তার প্রশ্নবাদী মন। বয়স অনুপাতে তাদের যেমন যেমন ভয় দেখাবে তেমন তেমন ভয় পাবে। তবে যখন দেখবে বিশাল ভয়কে সে ভয় করে না, তখন জানবে, সাংঘাতিক তার স্নায়ু।

তাহলে ভয়টা দু'রকম ক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছয়। এইটায় জোগান দেয় কে ? মা, দিদিমারা।—ঐ দেখ ভূত দাঁড়িয়ে, ঐ বাবা জুজু ! এ তো গেল প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা—যখন তাদের বয়স দশ বারো

বছর দাঁড়ায় তখন নানা গল্প কথায় ভয় ভূত বদ্ধমূল হয়ে যায়।

স্নায়ু দুর্বল হলে কানে কথা যাওয়া মাত্রই কারো কারো ভিতরে ভয় ধরে যায়। না হলে ভূত বলে কিছু নেই, ভগবান বলেও কিছু নেই। দুটোর মধ্যে কিছুই নেই। কিন্তু কাজের সুবিধার জন্য দুয়েরই প্রয়োজন আছে।

তবে 'ভূতের ভয় পাওয়া' কাজের সুবিধা হলে হবে কি, ভগবানের ভয় নিয়ে চলা তো একরকম জ্ঞান বলতে হবে। ভগবানের দোহাই দিয়ে শেষ পর্যন্ত মানুষ জয়ী হয়। তবে ভূতের ভয় কোথাও কখনো শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ হয়। না মরলেও মরার সামিল বটে। সেই শিশু, যখন যুবা প্রৌঢ় তখন এমন একটি স্নায়ু শিরার মধ্যে ভূত ঢুকে যায় যে, সে আর কিছুই করে উঠতে পারে না। সব সময় ভূত ভূত ভয়টায় তার আতঙ্কিত মন।

যে শিশু ভগবান-ভয়নিয়ে চলে, সে যদি না খুব প্রশ্নবাদী হয়—মা-বাবার কথা শোনে, (তারা বলছেন—ভগবানকে মনে কর-না তাহলেই হবে। ঐ তো কালীমার ছবি আছে, ঐখানে প্রণাম করো, ইত্যাদি ইত্যাদি) সে একরকম। কিন্তু শিশু শুনবার শিশু নয়! কিছুকাল বাপ মায়েব কোলে এসে মেনে নিল। কিন্তু তার প্রশ্ন—এ তো একটা ছবি! কৈ ভগবানের সঙ্গে কথা বলছি, উত্তব পাচ্ছি না তো? ঠা'মা যে বলল, গড় করতে কথা বলবে, কৈ কিছু তো বলছে না? এই করে তার মধ্যে বিচার বিশ্লেষণ এসে গেল। খুঁজতে খুঁজতে ভগবান রহস্য ভেদ করে ফেলল সে। আর তা না হলে, সে ঐ মূর্তির মধ্যে যেয়ে পৌঁছে গেল।

নিশ্চয়ই আছে, তাকে কি আমরা ডাকলে শুনতে পাবে। সাড়া দিলেই কি আর শুনা যায়। আমাদের সেই কান কোথায়! তিনি অনেক উঁচুতে।'—এমনই সচরাচর চলে। এমন শিশু খুব কমই জন্মায়, যে রহস্য ভেদ করবার ক্ষমতা রাখে। সাধারণতঃ মানুষ পূজা করা, গড় করা এর মধ্যে রয়ে যায়।

ভূতের বেলাতেও তাই। 'মানুষ মরে গেল, তাকে পুড়িয়ে ছাই

করে দেওয়া হল। আবার সেই দাঁড়িয়ে গেছে।' এটা কি জিনিস? এ কি করে হয়?—এ রকম অসংখ্য প্রশ্ন। শিশু জাগ্রত হয়ে উঠল। নিজেকে জাগিয়ে ছুটল ভূত-সৃষ্টি-রহস্য ভেদ করতে।—'ভূত। না হতে পারে না।' মাঝ পথে পড়ে গেল।—'প্রেতাত্মা বলে একটা কিছু আছে। দেবতা থাকলে নিশ্চয়ই অপদেবতা বলে কিছুকে স্বীকার করতে হয়।' ভূত ছেড়ে ছায়া, অশরীরী আত্মা, শেষ মরণের পরে।—ঐ পর্যন্ত রয়ে গেল। শিশু আর রহস্য ভেদ করবে কি, ঐ পাকেই ঘুরতে রইল।

'ভূত নেই'—এইটুকু রহস্য ভেদ করাই বড় কঠিন। তাতে বেশ সময় লাগে। তার সেই প্রশ্নবাদী মন হওয়া চাই। যেমন তেমন স্নায়ুর কাজ নয়। কারণ একটি শিশু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম এসে তাকে বন্ধন দেয়। প্রথম তার খেলাধুলা তারপর লেখাপড়া তারপর রোজগার। সঙ্গে চলে রিপুর খেলা, তারাই ভাবিয়ে তোলে। এ সবের পরে এ রহস্য ভেদ করা তার পক্ষে কি চাট্টিখানি কথা! অতএব মা, দিদিমা, বাপ-ঠাকুরদা যা বলেছেন—'ভূত আছে,' হঁ্যা আছে। 'ভগবান আছে,' হ্যা আছে। ভূতের ভয় তো সব সময় মনে। আর ভগবান? আমাদের সে কান কোথায় যে শুনব! নিজেকে নিয় সে নিজে মশগুল।

কুল খেয়ে সে মশগুল হয়েছে, এখন দাঁতের নিকেল উঠে গেছে। জল পড়লেই শিরশির করে। নিজেকে নিয়েই সে ব্যস্ত। এখন কাকে পাবে বল? এ্যা বুঝেছ, ভূত আর ভগবান? এ কোন্‌দিকে তোমরা যাবে। এক একটা রহস্য জটিল রয়েছে। এ রহস্য-ভেদ—এ, হলে অতি সহজ নইলে অতি কঠিন। একটা জীবন আর ক'দিন। কত রকম ধাপ তার এসে পৌছায়। চিন্তা করার সময় কখন!

প্রসাদ—অতি সহজ কেন বলছ, মা?

মা-মহাজ্ঞান—একজনের অতি সহজেই হয়, সে বলল—'রিপু, তোমরা আমার মধ্যে এ রহস্য আমাকে ভেদ করতেই হবে।' তারা বলল—'তোমার মধ্যে আমরা হলেও তোমাকে ছেড়ে আমরা কথা

বলব না। আমরা ক্ষুধার্ত, আমাদিগে খেতে দিতেই হবে।' তখন বলল—'তোমাদের খেতে দেব, কিন্তু আমার কর্মে তোমরা বাধা দিতে পারবে না। আমার কর্ম আমাকে করতেই হবে। তোমাদিগেও আমি খেতে দেব।'—এই বলে সে নিয়ে এল পরিমিত আহার। উভয়কেই খেতে দিতে রইল। কিন্তু এ যে রিপুরাজ। একটা রাজার কি আর চাষীর খাদ্যে পোষায়। রাজা ঝিমিয়ে পড়ে মারা যায়। হুঁ হুঁ হুঁ, এ তো বেঁচে যায়। এঁ্যা? অতি সহজেই ব্যক্ত হয়ে যায়।

প্রসাদ—দুর্বলতা থেকে ভয়ের সৃষ্টি—এই যে বলছ মা, তারও গোড়াতে তো সেই স্নায়ু?

মা-মহাজ্ঞান—হুঁ, ঐ সৃষ্টির গোড়াতেই এসে যায়। সৃষ্টির সঙ্গে যে যেমন পারল টেনে নিল। তার সঙ্গে জোগান দিল—মা, বাপ, ভাই, বোন, আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সকলে।

প্রসাদ—তাহলে একই স্নায়বিক দৌর্বল্যের জন্য ভূতের ভয়ই বল আর মনের ভয়ই বল—

মা-মহাজ্ঞান—এই যে কিছু ভয়—সব সব। যারা যেভাবে গঠিত তারা সেইভাবে শিশুকে গড়ে। কিন্তু যার যেটা দুর্বার হবে, তাকে আটকাতে কেউই পারবে না। যদি তার প্রবল ভূতের ভয় হয়, তাকে বাঁচায় কে। যাকে লেখাপড়ার নেশায় পেয়ে বসে তার বইয়ের পোকা আখ্যা ঠেকায় কে। যে ভগবান বৈ বুঝে না কিছু, সে অচিরে পাগল নাম পাবেই পাবে। যে যেভাবে নিয়ে এসেছে, সে সেইভাবে যোগানকে গুছিয়ে নেয়। সমস্ত ঝেড়ে ফেলে সে উঠে পড়বে।

অর্থাৎ কি না—একটা রূপকের মধ্যে বলা যাক। দুটি ছেলে রাস্তায় ছুটে যাচ্ছে। একটি সবল, একটি দুর্বল। দেখতে কিন্তু দুটি সমান। ছুটতে ছুটতে একটি পড়ে গেল। পড়ে যেয়ে তার গায়ে যে ধুলো লেগেছিল বা হাঁটু ছুলে গিয়েছিল সে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করল না। আবার ছুটছে—ছুটছে তো ছুটছেই।

আর একটি ছেলেও ছুটছে। কিন্তু সে বারবার তার দেহের প্রতি

লক্ষ্য রেখেছে। কোথাও যদি পড়ে গেছে তো আটকে গেল।—এই তো আমার হাঁটু ছড়ে গেছে। ইস্ গায়ে কত ধুলো লাগল! এই আমি কি করে যাব? এই আর কি করতে পারি।—ব্যস এ ধীরগতি হয়ে গেল। আর ওর উগ্রগতি, ও বেরিয়ে চলে গেল, বুঝেছ?

হেঁ হেঁ (সহাস্যে) একই পরিবেশের মধ্যে, তাহলে কি হয় না?

প্রসাদ—কালকে বলছিলেন মা—"একটা জীবের সম্পূর্ণ শরীর বিচার করলে বুঝতে পারা যায়, ভূত আছে কি নেই।" এই জিনিসটা একটু বুঝিয়ে দেবেন?

মা-মহাজ্ঞান—হুঁ। এটার মধ্যে কি আছে তোরাই বিচার কর না। এটা কোন এমন কঠিন তো কিছু নয়। ভূতটা কেন বলবি বল? কোন্ অর্থে তোরা ভূত বলছিস? এঁ্যা?

একটা শরীর একটা মেশিন। তার ভিতর সূক্ষ্ম কলকব্জা রয়েছে। সেই কলকব্জার একটা নষ্ট হয়ে গেল। হলে, গোটা গাড়িটা চলা বন্ধ হয়ে গেল। অর্থাৎ মারা গেল। তাহলে ভূত কোথা দিয়ে এলো? কি-টায় ভূত হল?

তোর হাতে শক্তি আছে? তুই এই মেশিনটাকে জীবিত করেছিস। এঁ্যা, তেমনি এমন কেউ অদৃশ্যমান রয়েছে, তার হাতে শক্তি রয়েছে, সে আমাদিগে চালাচ্ছে। তাহলে তেমন একটা কলকব্জা খারাপ হয়ে যেতে গোটা মেশিনটা অকেজো হয়ে গেল। তাহলে তার ভূতটা কোথায় হল? ভূতটা কি জিনিস দাঁড়াচ্ছে এবারে? তাহলে ভূত কিছু নয়।

মানুষটা কথা বলছিল, হাত পা নাড়ছিল, খাচ্ছিল, ঘুমাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ মানুষটা আর কিছু করে না। যেদিকে নড়াচ্ছি সেদিকেই নড়ছে। তাহলে একটা জিনিস তার এমন ছিলো যেটা বন্ধ হতেই সব বন্ধ হয়ে গেল। উঁ? কিন্তু তার হাত পা যা আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম সব দেখতে পাচ্ছি। সবই রয়েছে। অথচ সে খাচ্ছে না কথা বলছে না। তাহলে সেই আসল মেশিনটা নষ্ট হয়ে গেল, এঁ্যা?

আচ্ছা তাহলে এবার ভূতটা কি হচ্ছে, কোথা থেকে হচ্ছে? সেইটা আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন দেখছি, আমার চালু মেশিন, তখন ঐ জিনিসটা নিয়ে আমার মেশিনে আমি ফিট করে নিলাম। উঁ?—ঐ যে হাত পা নাড়ছিল, ও যে আবার খেতে চাইবে না, তার কি মানে আছে! ও যে দাঁড়িয়ে থাকবে না, তা কে বলতে পারে? ও যে কাঁদছে না, সে কথা কে হলপ করে বলবে? এ্যাঁ, আমার মেশিনে আমি ফিট করলাম। ডবল করে।

আচ্ছা আমার এই যে মন স্নায়ু ঐটা ওর মধ্যে বুলিয়ে এল। কারো গভীরভাবে বুলে আসে, সেটা তার রয়ে যায় স্নায়ুর মধ্যে। কারো হাল্কা ভাবে ছুঁয়ে যায়। তাব দু'চার দিন পরে চলে যায়। কারো একবারেই বুলাতে পারে না।—হাত পা নাড়ছিল মরে গেছে, ও আর কি আছে! মরে গেছে। এই পর্যন্তই সমাপ্ত। তার মন আর তার বেশী ছুটতে পারে না।

তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি, মানুষটা নড়ছে। আমার মনের মধ্যেই তো সেই মানুষটা ঘুরতে রইল। সে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। চর্মচক্ষুতে আমি দেখছি সে নেই, পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কিন্তু যে জ্ঞানে আমি তাকে লক্ষ্য করেছিলাম সেই জ্ঞান চোখে সে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু। চোখ বুজালেই তাকে দেখতে পাচ্ছি। অন্ধকারে গেলেই তাকে দেখতে পাচ্ছি। একলা হলে তাকে দেখতে পাচ্ছি আমি। আমি দেখছি, দেখাতে পাচ্ছি না। তাহলে ভূতটা কোথা থেকে আসছে? বল?

মা-মহাজ্ঞান—তাহলে যারা ভগবান খুঁজতে যাচ্ছে তারা ভূত দেখছে তো? ভগবানের সঙ্গে ভূত। জড়ানো। ভগবানটাও যেমন একটা বায়ু, ভূতটাও সেরকম একটা বায়ু। আমার মনে সৃষ্টি করছি আমি ভগবান। আমার মনে সৃষ্টি করছি আমি ভূত। তাহলে আমার মনের কল্পনার ছবি ওরা। এ্যাঁ, ভগবানও কেউ কাউকে দেখাতে পেরেছে কোন দিন, দেখাতে পারবে কোনদিন?

ভুত বা ভগবান এই দুটি জিনিস কি কেউ দেখাতে পারবে? কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, দুটি মন এক হলে দেখানো গেছে। মানে তাকে দীর্ঘকাল তৈরী করতে করতে এমন সুন্দর তৈরী করে ফেলেছে যে, সে বলছে—'দেখ, ঠিক দাঁড়িয়ে আছে না কোণে?' 'হ্যাঁ, ঠিক দাঁড়িয়ে আছে'—এ বলছে তখন। সেরকম মন পাওয়া গেছে। খোঁজ করে পাওয়া গেছে কিন্তু।

হ্যাঁ, আমি দেখেছি উনি আমাকে দেখিয়েছেন, আমি দেখেছি।—আচ্ছা দেখো তো, থাবা দিয়ে নাড়ুগোপাল ধরতে যাচ্ছে, সেরকম মনে হচ্ছে কি না? উঁ?

ঐ যে কথাটা সেদিনে এসে বলল—'কাঁদছে প্রতিমা, আমি নিজে হাতে জল মুছিয়ে দিয়েছি।' এই কথাটা হয়তো শতকরা দু'জন হলেও, অবিশ্বাস করেছে। সকলেই বলেছে—সাধু এই পথের পথিক বলে সাধুই দেখতে পাবে। আমরা দেখতে পাই না পাব না। —এই কথা বলে তারা বিশ্বাসী হয়ে সরে এসেছে।

তাব মধ্যে দু' একজন আছে তাদের মনের সঙ্গে মিলে গেছে—"হ্যাঁ, উনি যে বললেন কাঁদছে না, তা ঠিক দেখল কাঁদছে। ঠিক দেখলাম কান্না।" এই কথাই বলতে হবে তখন, 'আমি কাছে দাঁড়াচ্ছি, আমার এই পরিষ্কার কাপড়টি তোমাকে দিচ্ছি, তুমি জলটি মুছিয়ে দিয়ে এসো, কাপড়টি ভিজে উঠুক। বা তুমি গড়াচ্ছে দেখতে পেয়েছ, আমি যেয়ে মুছিয়ে আনছি। দেখাতে পারবে? পারবে না।'

এই মনের কল্পনাতে এইগুলো দেখতে পাচ্ছে। ঐ কল্পনা-স্তর ভেদ না করলে, সত্যিকারের সেই জ্ঞানে পৌঁছানো যায় না। ঐ জ্ঞান পর্যন্তই আটকে যায়। ঐটা গেলেই তারা বৃহৎ মনে করে—এই পেয়েই গেছি। বৃহৎ পেয়ে গেছি।

মা-মহাজ্ঞান—এই যে অভেদানন্দ বলেছে বলছ—অভেদানন্দকে নিয়ে আমার একটা সন্দেহ আছে। সন্দেহ হচ্ছে আমার এই যে, অভেদানন্দ যতখানি বলেছে ততখানি কি সে নিজে বিশ্বাসী ছিল?

না। সে প্রাথমিক বিশ্বাস করেছিলো। কিন্তু প্রাথমিক বিশ্বাস করেই যখন দেখল—না, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, তখন সে অনুমান করে নিল। ভূত তো ধরা যায় না। ভূত কথাও বলে না।

প্রসাদ—কিন্তু কতকগুলো তাঁর যে বিজ্ঞান-ভিত্তিক পরীক্ষা আছে?

মা-মহাজ্ঞান—ঐ রকম পরীক্ষাই দিয়েছে।

প্রথমে ভেবে নিল। এইটিই যখন বুঝতে পারল—বুঝতে পেরেও ও আর অন্য রাস্তা পেলো না। না পেয়ে ঐ রাস্তায় ও 'কালচার' করতে রইল। অনবরত চিন্তা করতে রইল। চিন্তা করে দেখল, ধীরে ধীরে সেই পথের পথিক হচ্ছে মানুষ। যত মানুষ ওর দিকে অগ্রসর হতে রইল ওর কথাবার্তার দ্বারাতে, তত ও লাইন পেতে রইল। মানুষের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে ভূত দেখা ওর বেড়ে যেতে রইল।

কালকে দেখবে আমি যদি জীবিত থাকি, তোমাদের মধ্যে যদি সেই সত্যক্ষুধা দেখতে পাই—অগ্রসর হচ্ছ, তাহলে আমার সত্য দেওয়া আরো বেড়ে যাবে। আমার আজ সত্য দেওয়া গুটিয়ে যাচ্ছে কেন? তোমাদের মধ্যে সেই ক্ষুধাটা পাচ্ছি না বলেই তো। যখন তোমাদের মধ্যে সেই ক্ষুধা দেখব, তখন আমার সেই লোভনীয় মন আগিয়ে যাবে—আমি দিয়ে যাই। এই দেবার জন্য আগিয়ে যাব। আগিয়ে গেলে পরেই তোমরাও নিতে থাকলে, আমিও দিতে থাকলাম। সেইখানেই আমার আরো গভীরতা এলো।

আচ্ছা এই কথাটা শুনে বলবে—তাহলে কি আপনার গভীরতা নেই? এ্যাঁ, আমরা তাহলে সত্য নিলে পরে আপনার সেই গভীরতা আসবে। যে কথাটা আপনি অভেদানন্দকে নিয়ে বলছেন।

অভেদানন্দর যা জানবার ছিল তা জেনে নিয়েছিল। তার উপরে সে ভিত্তি স্থাপন করে সে লক্ষ্য করছিল—কে কি রকম নেয়। সেইখানে জোর করে সে যেয়ে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে দেখল কে কতজন এসেছে। খুব জোরালো লোক যেয়ে যদি তাকে দাবী করে বলতো—ভূত আমাকে আপনাকে দেখাতে হবে, তাহলে দেখতাম কি উত্তর সে

দিত। কিন্তু সে মনোবল কারো ছিল না।

এমন কতকগুলো আওয়াজ শক্তি শব্দ আছে যার দ্বারাতে ভুত তোমার চোখের সামনে বিশ্বাস করিয়ে দেবে। উঁ? দশ-চক্রে ভগবান ভুত হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে বারবার। ও ভগবানকেই ভুত করেছে ভুতকেই ভগবান করেছে—দুইরকম করেছে।

আচ্ছা আমি গুটিয়ে যাচ্ছি কেন? তাহলে তো আমার জিনিসটা বাড়তে পারছে না। তোমরা সত্য নিচ্ছ না বলেই আমাব সত্য বাড়তে পারছে না। এই যে কথাটা বললাম, নিলে নিশ্চয় আমি আরো বাড়িয়ে দিতাম, বলতাম। কি বল, এ কথাটার উত্তর দাও? বল। বল তোমরা।

তাহলে সেই একআনা পাওয়া আমারও। যে অভেদানন্দকে আমি একআনা পাওয়া বলছি, সেই একআনা পাওয়া আমারও সত্য। তাই তো? কি বলবে, বল?

প্রসাদ—তা কি করে হয়!

মা-মহাজ্ঞান—কেন? আমাব বেলায় নয়, আর তার বেলাতেই হ্যাঁ।

প্রসাদ—না, একটা মিথ্যাকে নিয়ে—

মা-মহাজ্ঞান—মিথ্যা! সে তো বলছে সত্যি।

প্রসাদ—তারপবে সংগ্রহ করে সেখানে কিছু কাপচিয়ে বাড়ানো যায়। আর যেটা গভীর তত্ত্ব-সত্য, সেখানে এ কথা হলফ করে বলব কি করে যে একআনা থেকে বেড়ে যেতো। যিনি বলছেন, বলতে হবে, নিশ্চয় তাঁর গভীরতা আছে।

মা-মহাজ্ঞান—নাঃ, এটা ঠিক যুক্তি হল না। এখানে যুক্তিটা হল এই—অভেদানন্দ জিনিসটা, সম্পূর্ণ ষোলআনায় যে ঠিক ভেবেছিল, তা নয়। কিন্তু যখন দেখল এ পথের খদ্দের অনেক, তখনই সে সেই ব্যবসায় নেমে পড়ল।—এ ব্যবসাটা তো মন্দ চলে না। নেমে তার গভীরতা সে নিয়ে এলো। করতে করতে সে সেইরকমই হয়ে গেল। সে শেষ পর্যন্ত যা লিখে বা বলে গেল তার সঙ্গে তার মন মিশিয়ে

দিয়ে চলে গেল। সে সেই রসে ডুবে গেল।

আচ্ছা আমার মধ্যে—তোমরা নিলে কি আমার জিনিসটা বাড়তো ? আজ তোমরা নিচ্ছ না বলে কি আমার গুটিয়ে যাচ্ছে ?

এখানে এই কথাই বলতে হবে—আমার বেলায় তা নয়। আমার বেলায় ষোলআনাই আমি বলে যাচ্ছি যে, আমার পাওয়া হয়ে গেছিলো। এবং আমি দিতে আগাই নি। মানুষ এত বেশী স্পৃহার জগতে দাঁড়িয়ে আছে যে তারা আমার জিনিস গ্রহণ করতে পারবে না। এ 'র' জিনিস তারা নিতে পারবে না। সেইজন্যে আমি আমার স্বরূপ লুকিয়ে দিয়ে আমি খুব সাধারণ হতে চাইলাম। সাধারণের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে তাদিগে জ্ঞান দিয়ে ঐ রাস্তাটি দেখাব বলে।

তাহলে কি আমি কিছু বলে গেলাম না ? তা নয়। আমি বলে গেলাম, সব চলে গেলাম। এবার তোমাদিগে তাহলে ডাকছি কেন ? ধীরে ধীরে কিছু সংখ্যক লোককে এইজন্যে ডাকছি যে, আমি যা বলে যাচ্ছি তা হয়তো সবাই বুঝতে পারবে না। কেউ বুঝতে পারবে কি না সন্দেহ। সেইজন্যে কিছু কিছু লোক আমার কাছ থেকে এসে জেনে নিয়ে যাও। যার জন্যে প্রচার আমি চাই না।

এ জিনিস গ্রহণ করতে পারবে না। কিছু কিছু লোক জেনে থাকলে তারা বলবে—হ্যাঁ, আমাদিগে বুঝিয়ে দিয়েছেন। যেমন একখানি, তোকে ধরেছিলাম আমি—তোকে তো বুঝিয়ে দিয়েছি। সৃষ্টিটা কি, কালি তুলিটা কি ?

সবাইকে আমি আশা করি না। সবাই এলে এ জিনিস নিতে পারবে না। তার মধ্যে য'জন পার, এসো। আমি ডাক দিচ্ছি মা হয়ে—আয়, আয় তোরা। এর মধ্যে যে আসতে পারল আসতে পারল। এসে আমার কাছ থেকে তোরা শুনে যা জেনে যা। আমি আমার সব লিখে দিয়ে গেলাম। কিন্তু তোরা কেউ বুঝলি না। আমি কোনো জিনিস গোপন করে যাচ্ছি না। সবই লিখে দিয়ে গেলাম, কিন্তু আমি থেকে বুঝিয়ে দিয়ে গেলে, বুঝতে পারতিস।

অনেক জিনিস মনে হবে—অবান্তর লিখে গেছে। সেইজন্যেই বলে

যাচ্ছি, একটি অক্ষরও কেউ কোনদিন মুছে ফেলে দেবে না। কেটে ফেলে দেবে না। বুঝতে না পার রেখে দেবে। কেউ না কেউ এসে বুঝবে সেগুলো। তুমি যা পারলে না ও তা পারবে, ও যা পারল না সে তা পারবে। রেখে দেবে।

তাহলে ছুটো এক হল কি? এখানে আরো অনেক কিছু বলবার রইল, সেটা বললাম না আর। অভেদানন্দকে লক্ষ্য করে আরো কিছু বলবার ছিল, আর বললাম না।

এরপর দীর্ঘদিন বয়ে গেছে। একদিন হঠাৎ মা এক কথা বলে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেন।—'দুর্বল মনের জন্য শক্তিকে স্বীকার করতে হয়।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন তুলি—সে কি গো মা। দারুণ সবল মন নিয়ে যুগে যুগে সকলে তো শক্তিকে স্বীকার করে গেছেন। কিছু নেই তবে একটা শক্তিকে মানতেই হবে—এমন কথাই না কেউ কখনো বলেছেন।

মা-মহাজ্ঞান—সবল মন কার? বুদ্ধ, বিবেকানন্দ—এদের সকলের, এই তো বলবে? আমিও শক্তিকে স্বীকাব করি। তবে একটা কথা জানবে—যখনই আমরা যুক্তি খুঁজে পাই না তখনই শক্তিকে মানতে হয়।

প্রসাদ—শক্তিকে স্বীকার করেই তো জ্ঞান বিচারী হতে বলা? তাহলে 'যুক্তি খুঁজে পাই না' এর সঙ্গে শক্তির কি সম্পর্ক!

মা-মহাজ্ঞান—ঈশ্বরকে স্বীকার করেই শক্তি পরের ধাপের কথা। আবার শেষ ধাপও বটে। আগে উপাচার তার পর আকার, আকার থেকে নিরাকার—সবশেষে শক্তির প্রশ্ন। যুক্তি দিয়ে যতক্ষণ পাবি যুক্তি চালাই। 'যুক্তি দিয়েই এগিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে তবু শক্তিকে শেষ স্বীকার করে।'—এমন যদি কেউ হয়? সে ব্যক্তির কিন্তু অজানা কিছু নেই; তার যুক্তি সবের নাগাল পেয়েছে। এখানে যে 'স্বীকার' সেটা আর কিছু নয়—বিনয়, নম্রতা।

প্রসাদ—অত বুঝব না মা, আগে বল যুক্তিতে না কুলালে শক্তিকে স্বীকার—এ কথা কেন বলছ ?

মা-মহাজ্ঞান—যুক্তি দিয়ে যখন নাগাল পায় না তখন শক্তি স্বীকার করতে হয়। এ কথা ঠিক জানবি। শুধু কি শক্তি—শক্তি ভগবান, ভাগ্য, পট, প্রতিমা ইত্যাদি। যুক্তি দিয়ে যখন খাড়া করতে পারবি না, তখনই ভগবান। যুক্তির ভিতরে ভগবান নয়।

প্রসাদ—শক্তি বলতে ভগবান বলছ কেন ?

মা-মহাজ্ঞান—কেউ বলছে ভগবান, কেউ বলছে ঈশ্বর। আল্লা গড যাই বল না কেন, সবই তো এক। আবার কেউ বলছে—না, শক্তি বলে একটা কিছু আছে। তার সেই 'শক্তি'টা এখন কি ? শুরু হল আজীবন সংগ্রাম। এবার লড়তে গিয়ে জয়ী হতে না পারলে আর একধাপ নেমে যেতে হয়—অর্থাৎ স্বীকৃতি দিতে হয়। অদৃষ্ট ভাগ্য বলে মেনে নেয় সবকিছুকে। আর নইলে হয় নাস্তিক।

তবে যুক্তির দ্বারা যত একের পর এক ব্যাখ্যা মেলে ততই ধারণা পাল্টে যেতে থাকে। ঈশ্বর আকার নিরাকার, শক্তি এই রকম চলে। ছায়া দেখা দিয়ে সরে যায়। তবে শুদ্ধভ্রমই সব কথা নয়। অবশ্য এর উপরে কল্পনা উঠতে পারে। তারপর মন দর্পণে এ কার মূর্তি! পরমত্মাকে উপলব্ধি হল।

যে যেমন শুদ্ধাচারী তার তেমন হয় উপলব্ধি। তবে সব সময় দেহ, মন, আত্মা—তিন নিয়ে কথা।

'যুক্তিতে না কুলালে শক্তিকে স্বীকার।' এখন এই যা জিজ্ঞাস্য—যখন একটা নয় একটা মেনে নেওয়ার প্রশ্ন তখন নাস্তিক হওয়ার অবকাশ কোথায় ?

মা-মহাজ্ঞান—যারা ভগবানকে প্রথমে স্বীকার করতে চাইল না, যুক্তির ধারাতে গেল, তারা কি করে আবার পুনরায় ভগবানকে স্বীকার করবে ? করতে পারল না। যুক্তিতে যেয়ে যুক্তির রাস্তায় তারা দৌড়াতে পারল না। না পারলে মাঝ পথে রয়ে গেল। কিন্তু ভগবানকে

পুনরায় এসে স্বীকার করতে পারবে না তারা। আর যেখানে মনে কর অনেক যুক্তির নাগাল সে পেয়ে গেছে—বহু যুক্তির নাগাল সে পেয়েছে, পাওয়ার পর আর সে যেতে পারছে না, তখন সে বলবে—আমি ঈশ্বর এর বাইরে যেতে পারছি না। কিন্তু ভগবানকেও স্বীকার করতে পারলাম না। যুক্তিকেই আমি স্বীকার করে গেলাম। ভগবানকেও স্বীকার করতে পারলাম না, আর নাস্তিককেও স্বীকার করতে পারলাম না। জ্ঞান যুক্তি—উঁ, এই কথাটাই সে বলছে।

অর্থাৎ সেইখানেই যেয়ে সে নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে। যুক্তির ধারায় সে পরিশ্রম করতে সে রাজী নয়। আর যুক্তিটা তার মনে খেলছে কি না?

প্রসাদ—না মা, নাস্তিক বা আস্তিক যাই বল না কেন, সবার পিছনে যুক্তি তো আছে। যে বলছে আছে তারও যুক্তি আছে, যে বলছে নেই তারও যুক্তি আছে। তাহলে সত্যকে স্বীকার করে যেখানে মা, যুক্তিটা আনতে হচ্ছে—

মা-মহাজ্ঞান—আর সে মূলতঃই নাস্তিক। মূলতঃই নাস্তিক। তার সত্তাটাই নাস্তিকের সত্তা। এমন কিছু যুক্তি বা এমন কিছু ভগবান তার সামনে এসে না দাঁড়ালে—শক্তি দাঁড়ালে, সে কোনদিনই বিশ্বাস করবে না। তার জন্মসূত্রেই সে সেটা এনেছে। সেই মাটি দিয়েই সে গড়া। নাস্তিক মাটিতেই গড়া সে। এ সব আলোই তার সামনে পড়েনি। এবার যদি কেউ আলো নিয়ে অনর্গল ফেলতে থাকে ফেলতে থাকে ফেলতে থাকে, তখন যদি সে একটুখানি দাঁড়িয়ে যায়। স্বীকার করতে চাইবে না।

প্রসাদ—বেশীদুর মা যেতে হবে না। উপরে কে আছে কি না-আছে, কার শক্তিতে সুনিয়ন্ত্রিত আমরা অত বুঝতে হবে না। শুধু নিজের দিকে তাকালেই সত্যকে স্বীকার করতে হয়। যুক্তি তো ওখানেই গুটিয়ে যায়। আমি কি করে জন্মালাম?

মা-মহাজ্ঞান—ঐ ঐ তখন তার যুক্তি আসবে। যেমন অজ্ঞানের যুক্তি আছে, তেমন জ্ঞানেরও যুক্তি আছে। তোমরা জ্ঞানের যুক্তিটা

বার করছ অজ্ঞানের যুক্তিটা বার কর। ঐটাই ওর কাছে জ্ঞান। অজ্ঞানই বলে কিছুই নেই।

যে আস্তিক তার কাছেও যে যুক্তি বয়ে যাচ্ছে যে নাস্তিক তার কাছেও সেই যুক্তি বয়ে যাচ্ছে। দুটোর দুই ধারা।

নাস্তিক বলছে—হুঁঃ, কি অজ্ঞান দেখ! আর আস্তিক বলছে—হুঁঃ, কি অজ্ঞান দেখ। এই চলবে। এবার বল, দুজনে পৌঁছে হেরে যাচ্ছে কে? সেইখানেই ওদের ঠকা জেতা। তা ছাড়া তুমি তোমার ধারায় বলছ, ও ভুল করছে, তোমার ধারা নিয়ে। আমি আমার ধারায় বলছি, ও ভুল করছে, আমার ধারা নিয়ে। এবার বল দুটো লাইন ঠিক চলছে চলছে, এবার কার লাইনে যেয়ে ভোটে কে দাঁড়াচ্ছে। কে বেশী পাচ্ছে? যেখানে যে জয়ী হচ্ছে—যারটা আরো দশজনে যেয়ে স্বীকার করছে—আমারটায় মনে কর বিশজন স্বীকার করল তোমারটায় মনে কর পাঁচজন স্বীকার করল, তাহলে বুঝতে হবে আমারটাই ঠিক। এই, যুক্তিরও ধারা আছে।

প্রসাদ—এখন কথা হচ্ছে মা, প্রকৃত নাস্তিক কি থাকা যায়, আজীবন?

মা-মহাজ্ঞান—ঐখানেই তো তাহলে জ্ঞান, ভক্তি, যুক্তি, এরা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

প্রসাদ—তাহলে, একটা দুর্বলতাই তো ঈশ্বরকে মানতে বাধ্য করায়। সেই অসহায়ত্ব।

মা-মহাজ্ঞান—মানতে বাধ্য করায় তো? কিন্তু এখানে কোনদিনই মানতে বাধ্য করাবে না। এইখানেই দেখ। যেখানে যুক্তি ভগবান এ্যাঁ, এরা কি কোনদিন ঐ নাস্তিককে মানতে বাধ্য করাবে? কোনদিনই মানতে বাধ্য করাবে না। নাস্তিককে বলবে, সায় দিতে। কোনদিনই করাবে না। যদি করে তখন বলবে, এটা পারলাম না বলে ওটা করেছি। হ্যাঁ? আর এরা সুগু সুগু করে এসে ঢুকে যাবে। এরা ঢুকে যাবে। এরা যখন নাগালে কুলাতে পারবে না, নাস্তিক যখন নাগালে কুলাতে পারবে না, তখন এসে

আস্তিকের পিছনে ঢুকে যাবে। আস্তিক কোনদিন নাস্তিকের পিছনে যেয়ে ঢুকে যাবে না। কি রকম জ্ঞান স্যারেণ্ডার করবে? এটা না পারার মূলে স্যারেণ্ডারটা করবে, এঁ্যা?

চিরকালই জানবে একটা সাদা আর একটা কালো। সাদা রঙও সবাই ব্যবহার করে, কালো রঙও সবাই ব্যবহার করে। কালো বলে তাকে তুমি ঘৃণা করছ কেন? দেখতে কোন্‌টা ভাল। চিরকালই চাইবে সবাই চাইবে, সবার মনেই আছে, প্রত্যেকের মনেই আছে—একটিপুরুষ সে সুস্থভাবে দাঁড়াক। একটি নারী সেসুস্থ ভাবেদাঁড়াক। এবারে সে সুস্থ বলতে কি? রোজগার, বিয়ে, সংসার, দেওয়া, আনা, নেওয়া, এঁ্যা?

প্রত্যেকেই চাইছে রাজনীতির ব্যাপারে—যে দেশপ্রেমিক সে দেশকে ভালবাসুক। প্রত্যেককে দেওয়া-থোয়া করুক। সে তার বলে কিছু রাখবে না। তারটাই সব। কিন্তু যে দাঁড়াচ্ছে সে আর পারছে না। সে তখন নিজের আখেরটা কিছু গুছিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু ভাল আর খারাপ, এটা প্রত্যেকের মনেই খেলে যাবে।

কিছুকাল পর সহসা কয়া দুটি প্রশ্নের উত্তরে 'ভূত-ভগবান' ও জ্ঞান-শক্তি-প্রেম প্রসঙ্গে 'মা-মহাজ্ঞান' প্রাঞ্জল ব্যাখায় আরো কত কি বুঝিয়ে বলেন। উপমায় অনবদ্য প্রতিবেদন।

"দুর্বল মনেই ভয়; যা ভয় তাই ভূত। আর সবল মনেই শক্তি; যা শক্তি তাই ঈশ্বর।" যথার্থ বলেছ যদি তাহলে বর্তমান এ কথা কেন বললে—'দুর্বল মনেব জন্য শক্তিকে স্বীকার করতে হয়।' একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হচ্ছে না কি?

তুমি সার্থক প্রেম ও বোঝ আর শ্রেষ্ঠ শক্তির ধারণা দিতে পার। এবার বল, কার উপর কাকে স্থান দেবে? প্রেম বলতে বা শক্তি অর্থে কি জ্ঞান বুঝায়?

"মা-মহাজ্ঞান"—জ্ঞানী, বিচারী, সবল মনই শক্তিকে চিনে বা খুঁজে। সেই অর্থে বলেছিলাম, 'সবল মনেই শক্তি।' দারুণ মনোবলের দরুন সে বহু বিষয়ের মীমাংসা করে বটে, কিন্তু সর্ব

বিষয়ের নয়। যুক্তি যখন শেষ নাগাল পায় না তখনই একটা কিছুকে স্বীকার করতে হয়। আকার নয় নিরাকার নয়, একটা কিছু আছে। তাকেই শক্তি বলে আখ্যা দেয়। এবং যে মুহূর্তে শক্তিকে স্বীকার করল—যুক্তি-হারা হয়ে দাঁড়াল, সেই মুহূর্তে যত বড় মনোবলই তার থাকুক না কেন, সে দুর্বল। তাই আজ বলছি, দুর্বল মনই শক্তিকে স্বীকার করে। বিচার করতে না পারলেই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে এবং সেই বিভ্রান্তির মূলে আসে ভয় অশান্তি অতৃপ্তি দুর্ভাবনা ইত্যাদি।

প্রসাদ—কিন্তু মা সে তো সাধারণ মানুষের। যারা অসাধারণ তাদের ?

মা-মহাজ্ঞান—আঃ সে কথা আর বলছ কেন! অসাধারণ সেই সাধারণের সঙ্গে এসে মিশে যাচ্ছে। অসাধারণের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারল না। তাই এই সাধারণগুলো তাকে আক্রমণ করেছে। তাহলে এবারে কি বলতে বল—অসাধারণে সাধারণে মিশে গেল না কি ?

জ্ঞানী পুরুষরা আগে পূজা উপাচার নিষ্ঠা ইতাদি ইত্যাদি পালন করার পরই বা বলি, সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞানের সন্ধানও করতে থাকে। ধীরে ধীরে দেখা যায় সবকিছুই নিশ্চিহ্ন হয়ে শুধু দাঁড়িয়ে আছে তার জ্ঞান-শক্তিটি। তখন কিন্তু তার কাছে আর কোন কিছুই এসে পৌঁছবে না—ঐ যে কথাগুলো বলে এল'ম, বিভ্রান্তি ইত্যাদি। তখনই তাকে বলা হয় শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

পরের প্রশ্নের উত্তরে 'মা-মহাজ্ঞান' বলেন—আগে ক্ষমতা, না আগে স্পৃহা ? শক্তিই জ্ঞানের ব্যাখ্যা করে, স্পৃহাকে রূপ দেয়। সবের গোড়ায় শক্তি। যার মধ্যে জীবনী শক্তি নেই, তার আবার জ্ঞান বুদ্ধি প্রেম প্রীতি কি!

এবার চিন্তা করা যাক—দেহের চাওয়া পাওয়া পূরণ করার প্রশ্ন। আকর্ষণ অনুভব করলাম। এর গোড়ার কথা কি ? স্নায়ু। এবং সেই স্নায়ু বহন করছে স্পৃহা। কাম চিন্তা করলে এবার হল প্রেমের জন্ম

এবং লালসা চরিতার্থ করল। ফলে হল সৃষ্টি। তাহলে বোঝা গেল যে, শক্তি দিল স্পৃহার জন্ম এবং সেই স্পৃহার মূলে প্রেম। সেই স্পৃহাই শক্তি প্রকাশ করল।

এবার আমি চাই আমার স্থূল চাওয়া পাওয়াকে শুদ্ধ করতে। প্রশ্ন উঠবে, কি প্রয়োজন? হ্যাঁ, খেলে খাওয়ানো যায় না এবং জ্ঞান সত্য আদর্শ বুঝি না, আমার সেই খাওয়ানোতেই আনন্দ। নিশ্চয় কারো কোন আপত্তি নেই। এখন কি উপায়ে সম্ভব? নিজের স্পৃহাকে শুদ্ধ করতে হবে। এই শুদ্ধ করার প্রশ্ন যখন তখন শক্তির সাধনা করতে হবে। শক্তি আসছে। এবার প্রেম ধীরে ধীরে প্রীতির স্তরে বেয়ে দাঁড়াল বা রূপান্তরিত হল, যাই কেন বল না, এই প্রীতির অবস্থাই সার্থক জ্ঞান ব্যক্ত করে।

যদি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা চাও, তাহলে শুদ্ধ করলে হয় ঈশ্বর লাভ। এই ঈশ্বর লাভ কথাটি এক কথায় অর্থহীন, নইলে বিশেষ বিশেষ ভাব ব্যাখ্যা করে। কার মধ্যে কতটুকু সত্য সে রীতিমত তর্ক সাপেক্ষ। আকার বোধ থেকে এর শুরু এবং নিরাকার শক্তি জ্ঞান ইত্যাদি ব্যাখ্যায় এর শেষ। যাই হোক সার্থক ঈশ্বর লাভ হলে হয় পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী। তাহলে উভয়েই মূলতঃ সেই জ্ঞানের সাধনা করে। যে না করে তার জীবনে ভ্রান্তিই বড় কথা।

ছাখ, শক্তি প্রেম জ্ঞান এরা হল তিন ভাই। বড় ভাই জ্ঞান, সে সবার বড় হলে হবে কি, বোবা। মেজ ভাই প্রেম, তার গোড়ার কথা কাম—তাই চাওয়া-পাওয়ার মধ্যেই এর জীবন কাটে। আর ছোট ভাই শক্তি—এ শক্তিশালী হলে হবে কি, সব সময় মাথার ঠিক রাখতে পারে না। তিন ভাই এরা অঙ্গাঙ্গি জড়িত। কাউকে বাদ দিলে চলবে না।

তবে অনেক সময় দেখা যায়, বড় ভাই বোবা বলে একে বাদ দিয়ে দেয় এরা। কিন্তু বাদ দিয়ে কেউ হয় না জয়ী, হতে পারে না। পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। এর অনেক কিছুই নজির খুঁজে পাওয়া যাবে।

জ্ঞানের সাহায্য নিয়ে বা জ্ঞানকে 'শ্রেষ্ঠতা' দিয়ে যারা কাজ করে তাদিগেই দেখা গেছে প্রতিভাবান। স্পৃহা শূন্য কিন্তু। তবে সে আর ক'জন!

"জ্ঞানী পুরুষরা আগে পূজা উপাচার নিষ্ঠা ইত্যাদি পালন করার পরই বা বলি, সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞানের সন্ধানও করতে থাকে।"—এই অংশ উদ্ধৃত করায় মা ব্যাখ্যা দেন।

যারা পূজা-আর্চ্চা করে,—এ্যাঁ, ক'বে জ্ঞান সাধনা করে তারা। তারা জ্ঞানের সাধনা করে। কেন? না, তারা ধাপের পর ধাপ পেরিয়ে যায়। পেরিয়ে যেয়ে একটা মৌলিকত্ব তৈরী করে। চর্চার মূলে। সেটা হচ্ছে প্রথম ধাপ। আচ্ছা দ্বিতীয় ধাপে বলছে—"বরং বলি" নমনীয় আনছে। মিশে যাচ্ছে আর কি। মিশে যেয়ে বলছে—ঐ "সঙ্গে সঙ্গে তারা জ্ঞানের সন্ধান করছে।"

আচ্ছা, এবার 'জ্ঞানের সন্ধান' বলতে কি বুঝছ তোমরা? না, যথা, পূজা উপাচার নিষ্ঠা—যে প্রশ্ন তোমাদের মধ্যে কোনদিন জাগবে, এ্যাঁ, আগে সেই প্রশ্ন সেই সমস্যার সমাধান করে ফেলছে। কেন? না, সাধারণ ব্যক্তিরা আগিয়ে এসে তারা কি ধরবে?

যারা মনে কর, এসে এই লাইন ধরতে চাইবে, তাদিগে কি দিয়ে আগিয়ে দেবে? তাদিগে বলবে তুমি এই এইগুলো কর।—'এগুলোর মধ্যে কি, আছে গুরুদেব, যে করব?'—'এগুলোর মধ্যে? এই এই আছে।' তা হচ্ছে সম্পূর্ণ বাস্তব বিচার এবং বাস্তব নজীর। বাস্তব আস্থা। বাস্তবের কতকগুলো আস্থা না রাখলে তারা অগ্রসর হতে পারবে না। সেই জন্যেই বলছে সঙ্গে সঙ্গে সে 'জ্ঞান সন্ধান' করছে।

এ তো দুটো শ্রেণীতে ভাগ করে দিয়েছে। কিন্তু বুঝতে দেয় নি। আগে তুমি জ্ঞান সন্ধান কর। সন্ধান করে তখন তোমাকে দাঁড়াতে হবে জ্ঞান সাধনায়। তাহলে 'সন্ধান' বলতেই সেই উপাচার আসছে। সন্ধান যাকে বলছে তার নামই উপাচার। উপাচার যাকে বলে তাই হল সন্ধান। অর্থাৎ আমি এখানে পূজো করছি কেন? প্রশ্ন জাগলো

মনে। কার পূজা করছি কি পূজা করছি? এই সব প্রশ্নগুলো মনে আসবে। ঐগুলোই হচ্ছে সন্ধান।

আছা এই পূজা করে লাভ ক্ষতি? কতদিন করব, কেন করব, কি জন্যে করব—তার আপন মনেই প্রশ্ন জাগছে। তখনই হচ্ছে তার জ্ঞানের সন্ধান।

আচ্ছা এই সন্ধানের দ্বারাতে তার তখন স্পৃহা আসক্তি দমছে। তাহলে তাদিগে ধাতস্থ বা আযত্ত করা হচ্ছে। সেই আয়ত্তের পরেই সে দেখে নিল—হ্যাঁ, এর মধ্যে কি বস্তু আছে। একটির পর একটি ধীরে ধীরে সমস্ত উপাচার তার খসে পড়বে। সে দাঁড়াবে তখন জ্ঞান সাধানায়। তখন সে সাধন মার্গে যেয়ে পৌছবার চেষ্টা করবে।

সেই সাধন মার্গের আবার আরেকটা উপাচার পড়বে তখন। আবার এক দৃষ্টিভঙ্গিতে উপাচার পড়বে। এই উপাচার গৌণ হয়ে গেল। একে রেখে দেওয়া হল। সাধন মার্গের যে সাধনা—কি কি করলে তারা সেই জ্যোতি দর্শন করতে পারে, সেই রাস্তায় তারা ছুটছে তখন, উঁ? একাসনে সে কতক্ষণ বসে থাকতে পারে? লিপ্ত হয়ে সে নির্লিপ্ত হতে পারে কি করে? লিপ্ত হতে হবে তাকে এসে। প্রথমে তো আর লিপ্ত হওয়ার প্রশ্ন আসছে না। দ্বিতীয় ধাপে যেয়ে লিপ্ত হবার প্রশ্ন উঠছে।

যথা মনে কর, কিছুদিন তুমি পূজা-আর্চ্চা নিয়ে রইলে। তারপর তোমাকে সেই পূজা-আর্চ্চা ফেলে দিতে হবে। এসে সংসারে ডুব দিতে হবে। সংসার বলতে? তুমি যদি বল আমার নিজস্ব সংসার করলাম না। বিয়ে করলাম না, সংসার করলাম না। পরোক্ষে সংসার করতে হবে তোমাকে। তার মধ্যে তোমাকে দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে। তুমি যে গায়ে আঁচড় লাগাবে না—সরে থাকবে, তা হবে না। ঐ কর্ম-যোগ শ্রেষ্ঠ বলছে তখন। সেই কর্মের মধ্যে তোমাকে মিলিয়ে দিতে হবে নিজেকে।

এতগুলি মানুষের মধ্যে, চাওয়া পাওয়া কেন? কি জন্যে এদের চাহিদা—এই প্রশ্নই জাগবে। সেই সঙ্গে তোমার স্পৃহা তোমাকে

বিচলিত করে কি না দেখতে হবে। তখনই সেই শ্রেষ্ঠ মার্গে যাওয়ার কথা হচ্ছে। উ ? সেই নিশ্চল মনোভাবটাকে আনছ। সেই নিশ্চল মনোভাব এনে বুঝল—এই স্পৃহার হাত থেকে রেহাই কারো নেই, এরা এদের মতন চাইবেই। কিন্তু এরা যাতে না চায় তার ব্যবস্থা আমাকে করতে হবে। কতটা ? না, যতটা পারি।

তখন আসছে—কাহারো চাওয়া পাওয়াকে স্তব্ধ করা যায় না। সব বুঝতে পারছ নিজে। নিজের স্পৃহার দ্বারায় নিজের রিপু আসক্তির দ্বারায়, নিস্পৃহকে চিনতে পেরেছ। তাহলে নিস্পৃহ কি নিদারুণ, তাকে আনা যায় না। এই তখন আনা না গেলে কি করতে হবে ? না, বাণী বক্তব্যের দ্বারায় এদিকে পথ আটকে দিতে হবে। এরা যাতে সোজা পথে পা ফেলতে পারে। তখনই আসবে 'শৃঙ্খলায় পা ফেল'। আর আটকাতে যাবে না।

এ করো না, ও করো না, সে করো না—না বলে, তখন বলবে—এই কর, কিন্তু শৃঙ্খলায় করো, না হলেই দাঁড়াচ্ছে। তখনই তার জ্ঞান সাধনা হল। ঐ চলতে রইল—জ্ঞান সাধনা চলতে রইল।

'জ্ঞান, প্রেম ও শক্তি—এ তিনের ব্যাখ্যায় তুমি জ্ঞানকে বলছ, বোবা তাহলে এ জ্ঞান নিশ্চয় মহাজ্ঞান নয়। এখন প্রশ্ন হল—অসাধারণ জ্ঞান কি বোবা ?'—কিছু না বুঝেই প্রশ্ন করে চলেছি।

মা-মহাজ্ঞান—'বোবা' না হলেও 'কঁকা তো।'

প্রসাদ—ওখানে বলেছ, প্রীতির গোড়ার কথা প্রেম—চাওয়া পাওয়া। আর শক্তি—তার মাথার ঠিক নেই। তাহলে উভয়ের কেউই কার্যকরী হচ্ছে না। এদের সহোদর ভাই কোন্ 'জ্ঞান' তাহলে ?

মা-মহাজ্ঞান—এ অসাধারণ জ্ঞান। এ সাধারণ জ্ঞান নয়। এখানে জ্ঞানকে আর ভাগ দিচ্ছে না। জ্ঞানকে না ভাগ করে এক পর্যায়ে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। উ, এখানে অসাধারণ জ্ঞান মহাজ্ঞান বলে কিছু বিচার করছে না। আচ্ছা, যখন অসাধারণ জ্ঞানে কেউ পৌছায়, তখনই

সহজাত ভাবেই মহাজ্ঞান তার কাছে,আসা যাওয়া করতে থাকে। এই যে শক্তি আর প্রেম, এদের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে। এ সেই জ্ঞানের কথা বলছে। জ্ঞান সাধারণ জ্ঞান সহজাত জ্ঞান—সব উবিয়ে দিচ্ছে ?

মেজ আর ছোট সব সময় সহযোগিতা করবে। বড়কে বাদ দিয়ে দিচ্ছে। সব সময় বড়কে বাদ দিচ্ছে। কিন্তু বড়র দৃষ্টি এদের প্রতি রয়েছে। তবে দৃষ্টি থাকলে হবে কি, এরা এড়িয়ে যাচ্ছে তাকে। তার দৃষ্টি এদের কাছে গৌণ হয়ে যাচ্ছে।

গৌতম—বড় ভাই আলাদা, তবে একা কি ? এবং একা কি দাঁড়াতে পারে ?

'মা-মহাজ্ঞান—বড় ভাই একা। তার দাঁড়ানোও নেই আর বসাও নেই। সে একক। কারো সাহায্য নিয়ে সে কোনদিন দাঁড়াতে চায় না। এদিগে না হলে তার ব্যাখ্যাই নেই। বোবার কি আর ব্যাখ্যা !

যদি দাদার কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে আসে, তাহলে পরে সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হয়। আর না হলেই বিকৃত করে ফেলে। এরাই দাদাকে পরিচালিত করছে বলতে হবে। দাদার কাছ থেকে যদি ভাল ভাবে নেয় তাহলে জ্ঞান সুন্দর ব্যাখ্যা হচ্ছে । না হলে জ্ঞানের ব্যাখ্যাই পাচ্ছ না। মাত্রা হারিয়ে ফেলছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—জ্ঞান কি জন্ম সূত্রেই বোবা, না ধারায় বোবা ? সেটা আর ভাঙে নি।

প্রসাদ—এখানে একটা গণ্ডগোল লাগছে ঐ জন্যেই মা, তিন ভাই কিন্তু সমগোত্রীয় নয়। সম স্তরের নয়। এই আমার বলবার। তুমি জ্ঞানকে যে আসন দিয়ে 'বোবা' বলে আখ্যা দিচ্ছ না, প্রেম বা শক্তিকে সে আসন দাও নি। তারা সেই স্তরের নয়। তাহলে পরে একটা জট পাকিয়ে যাচ্ছে তো।

মা-মহাজ্ঞান—এবার পাঠকগণকে তা ধরবার জন্য রাখা হয়েছিল। এটা উপলব্ধির জগতে যাওয়ার জন্য রাখা হয়েছিল। জ্ঞান কি জন্ম সূত্রে বোবা ?—এই প্রশ্নটা তাদের মনে জাগবে।

জ্ঞান যদি বোবাই হবে তাহলে তার কতখানি ক্ষমতা যে সে ভাবে ইশারায় পরিচালিত করবে। এঁ্যা ? তাহলেই জ্ঞান দেখো কি রকম ধারায় বোবা ? জ্ঞান কথা বলে না। জ্ঞান কথা বলছে কখন। যখনই শক্তি, এঁ্যা, যখনই প্রেম, তখনই জ্ঞান কথা বলছে তাদের মধ্যে দিয়ে। তার নিজস্ব কথা বলার কিছু নেই। তাহলে আর জ্ঞান বোবা হবে না তো কি হবে ?

প্রসাদ—না সব কথাই কি জ্ঞান পরোক্ষে সাবে ?

মা-মহাজ্ঞান—হ্যাঁ, জ্ঞান পরোক্ষেই সাবে। জ্ঞান একক হয়ে কি করবে। জ্ঞান একক হলেই বোবা হয়ে যাচ্ছে। শুধু দৃষ্টি আর শুধু শ্বাস-প্রশ্বাস। জ্ঞান যে জীবিত, তার প্রমাণ। দৃষ্টি করল জ্ঞান। সেইটিই বা কে দেখতে পাচ্ছে, এঁ্যা ? সেই জ্ঞানের দৃষ্টিও এদের ভিতর দিয়ে। দারুণ ক্রোধান্বিত কিন্তু স্থির হয়ে দেখল। জ্ঞান। জ্ঞানের প্রকাশ এদিকে দিয়ে। তার নিজস্ব কোন প্রকাশ নেই।

প্রসাদ—মা, সহজাত আর সাধারণ, অজ্ঞান তো নয়।

মা-মহাজ্ঞান—সাধারণ জ্ঞানীই বলছে তাকে। কেউ জ্ঞানের দম দিচ্ছে না।

প্রসাদ—একটা স্তরে দাঁড়িয়ে তাকে 'অজ্ঞান' আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। না হলে সে তো অজ্ঞান নয়।

মা-মহাজ্ঞান—একটা স্তরে দাঁড়িয়ে অজ্ঞান আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। তাহলে 'হচ্ছে' আখ্যা দেওয়া।

প্রসাদ—তোমার কাছে আমি অজ্ঞ। কিন্তু আমার একটা জ্ঞান আছে।

মা-মহাজ্ঞান—তোমার একটা জ্ঞান আছে। কিন্তু সর্বদিক নিখুঁত বিচার করে কি তুমি জ্ঞানী। তা সেইখানেই তো তোমার অজ্ঞান আখ্যা আসছে।

প্রসাদ—আবার সর্বদিকের বিচার করতে যাচ্ছ কেন তুমি ? সেটা জ্ঞান কি না বল ?

মা-মহাজ্ঞান—ঐ তো সহজাত সাধারণ জ্ঞান।

প্রসাদ—তাহলে ? সেটা তো জ্ঞান একটা।

মা-মহাজ্ঞান—হ্যাঁ, জ্ঞান। জ্ঞান। কিন্তু যে জ্ঞানের কথা বলা হচ্ছে তার কাছে সে জ্ঞান নয়। সে অজ্ঞান। তাহলে ? যে অজ্ঞানের কথা বলা হচ্ছে তার অজ্ঞান বলে কোন কথা নেই। ঐজন্যেই জ্ঞানকে একলা করেছে। এদের সঙ্গে যে জড়িত জ্ঞানটা সে জ্ঞানকে ধরছে না। সহজাত সাধারণ জ্ঞান ওখানে যেয়ে মিলিত হচ্ছে। মিলিত হয়ে তিনে মিলে একক হয়ে যাচ্ছে।

আর যখনই তুমিও জ্ঞানকে বাদ দিয়ে এই এদের জ্ঞান নিয়ে —এখানে জ্ঞান নিয়ে তুমি কাজ করছ, তখনই তোমার সেই সহজাত জ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান। তোমার দিকে কেউ ফিরে তাকাচ্ছে না। কেউ বা বলছে—আ মন্দ কি, যা করেছে! কেউ বা বলছে—ছিঃ, কি কাজ করল! এই চলল।

প্রসাদ—মা, এই তিন ভায়ের প্রসঙ্গে—জ্ঞান প্রেম ও শক্তির যে ব্যাখ্যা দিলেন না, এই তিনটি সন্তানের পিতা মাতা বললে পরে, সেখানে কার ভূমিকা চলে আসছে—মহাজ্ঞানের, না মহাশক্তির ?

মা-মহাজ্ঞান—কার চলে আসবে এখানে। এদের পিতামাতা আছে কি ? আচ্ছা এই তিনকে যদি তিনটি সহোদর ভাই বলা হয়, তাহলে এদের পিতা-মাতাকে আমাদিগে খুঁজতে হচ্ছে। কারণ ভাই বললে আমরা এই ঘাবড়ে যাচ্ছি তো। ভাই বললে—তাহলে ? এদের বাপ মা কে ? এ চিন্তা করা যাক—বাপ মা কে বল ? নিয়ে এসো। এদের বাপকে আর মাকে দুজনকেই আনতে হবে। এককে আনলে কিন্তু চলবে না।

প্রসাদ—আমি কিন্তু আগেই সমর্পণ করছি যে, আমি আর এক ধারায় কাপচাচ্ছি। যদি আরো কিছু পাওয়া যায়। নিশ্চয় আপনি বুঝতে পারছেন।

তাহলে এ তিনটি সহোদর ভায়ের পিতা এবং মাতা কে ? নিশ্চয়

দুই সত্তা। আবার সেখানে অবিচ্ছেদ্য ভাবে দুই অধ্যায় চলে এলো —মহাশক্তি ও মহাজ্ঞান। দিন মীমাংসা।

মা-মহাজ্ঞান—তাহলে এখানে বলছে—এদের তিন ভায়ের কি নাম দিয়েছে ?

প্রসাদ—জ্ঞান, প্রেম, শক্তি।

মা-মহাজ্ঞান—তাহলে এবারে এদের বাপ মাকে খুঁজতে গেলে আমরা কি পাচ্ছি ? আমাদের তাহলে দু'জনকে যোগাড় করতে হবে। মহাশক্তিকে নিয়ে এসো। সেই অসাধারণ জ্ঞান দাঁড়াচ্ছে ভাই। বড় ভাই।

প্রসাদ—যেহেতু মহাশক্তির সমস্ত ভাবরূপ মহাজ্ঞান ব্যক্ত করছে, তাহলে নিশ্চয় মহাজ্ঞানের পিতৃ ভূমিকা। আর মহাশক্তির হচ্ছে মায়ের ভূমিকা। তাই তো ?

মা-মহাজ্ঞান—হুঁ।

[প্রশ্ন নিশ্চয় পথ তৈরী করে। 'মা-মহাজ্ঞান' প্রদত্ত প্রথম উপদেশ —কি কেন কবে কোথায় ইত্যাদি অসংখ্য প্রশ্নে অষ্টপ্রহর নিজেকে জর্জরিত কর। আমরা প্রতি পদক্ষেপে দাঁড়িয়ে যাই। দাঁড়াতে বাধ্য হই, গতি ধীর হয়। দ্রুত হলেই খুঁড়িয়ে চলার প্রশ্ন বা হারিয়ে যাওয়ার। তবে গতি সঙ্গতি স্বীকার করব যে, তা আপনাকে বিকার-মুক্ত বুঝে পাই ক'জন ? আবার মুক্তি মানেই মেধা নয়। পতিব্রতা সতী মানেই কি সে বিশ্বমাতা ?

এখানে সময় সময় এলোমেলো প্রশ্নে প্রসাদ আপনাকে বে-স্বাদ বুঝেছে। অবশ্য সে তার অক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার অবকাশ পায় নি। প্রাথমিক অবস্থায় ভাবতে পারে নি, 'মা-মহাজ্ঞান' সম্পূর্ণ নতুন জগতের কথা বলছেন। প্রচলিত ভাব ধারার আমূল সংস্কার, এ আদৌ কখনো কি চিন্তায় আনা যায় ? তবে প্রসাদের প্রশ্ন পথ খুঁজতে গিয়ে রাজপথে পৌঁছেছে। দিকে দিকে নানান্ সমৃদ্ধ মহা-নগরের ঠিক-ঠিকানা জেনে তার জীবন ধন্য। সেই সুবাদে যুগে যুগে

দাঁড়াবে কত না মহামান্য মহাত্মা মহাপুরুষে।

এ বড় বিস্ময়কর নানান অবান্তর প্রশ্নে 'মা-মহাজ্ঞান' কখনো তিলেক বিব্রত বোধ করেন নি। সদুত্তর দিয়ে গেছেন। কখনো বা প্রশ্নের অগভীরতা লক্ষ্য করে সস্নেহে পাশ কাটিয়ে গেছেন। আজ গভীর জ্ঞানে তা হৃদয়ঙ্গম করে একযোগে যেমন লজ্জিত হই তেমনই হই বটে বিস্মিত। তবে লজ্জা বা বিস্ময় বড় কথা নয়, এই যোগে যে কি ভাবে কখন কেমন পরম প্রাপ্তি এগিয়ে এসেছে, তাই হল একান্ত হৃদয়ে উপলব্ধির বিষয়।

'শক্তি বলে একটা কিছু আছে', আবার নেই। সবই আছে আবার কোথাও কিছুই নেই। সুকৃতি ভাগ্য কর্মফল সবই, হলে অকাট্য যুক্তি রাখার স্পর্ধা ধরে, নইলে নিছকই অবান্তর উক্তি—এমন মীমাংসা যে কি ভীষণ ভয়াবহ সত্য, তা নিশ্চয় অনুমান করা যায়। নির্মল হলেও, মহাসত্যের ঠিকানা জেনে, নূতন দিগন্ত লক্ষ্য করে এবার আমাদের সার্থক পথ চলা সমৃদ্ধির আলোয় মহিমান্বিত হবে।]

প্রসাদ—শক্তি-টক্তি বুঝি না, তুমি কিন্তু মহাশক্তির উল্লেখ করেছ?

মা-মহাজ্ঞান—হ্যাঁ, আমি জেনেই বলেছি। একটা শিখণ্ডি খাড়া করতে হবে তো। শক্তি তাহলে আবার কি। কিছু নেই।

আরও হয়ত মা অনেক কথা বলতেন কিন্তু চেপে দিয়ে বলি—এরকম বলতে বলতে কি একদিন বলবেন জ্ঞান বলে কিছু নেই?

মা বলেন—জ্ঞান বলে কিছু নেই? জ্ঞানকে আবার টানছ কেন। তা বলছি না, শক্তি বলে কিছু নেই—এই কথাই হচ্ছে। দেহের শক্তি নিয়ে যে শক্তি দাঁড়ায়—পাঁচটা কাজ করা যায়, ঐ শক্তির শ্রেষ্ঠ শক্তি ধরেছে ঈশ্বরকে। তখনই আসছে—উনি শক্তি দান করেছেন। 'শক্তি' কথাটা পেল কোথা থেকে? শক্তি দেখে এর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানকে চিন্তা করল। বিশাল বলে একটা কিছুকে কল্পনা করে নিল।

এ আর কিছুই নয়, ক্ষমতা দেখে ক্ষমতা অনুমান করা।

প্রসাদ—তাহলে শক্তির সঙ্গে জ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই? (নিছকই অবান্তর প্রশ্ন।)

সম্ভবতঃ তাই মা-মহাজ্ঞান স্ব-ধারায় বলে চলেন—না জ্ঞানের কোন দিন 'ভাঙ্গটা' নেই। জ্ঞানের কোন বিচার নেই। প্রকৃত জ্ঞান—সর্বদিক নিখুঁত বিচার করে যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান সম্পূর্ণ।

এর পরে মা জ্ঞান প্রসঙ্গে বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যান। সে সকল পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আবারও প্রশ্ন করার অবকাশ মিলেছে।

"জ্ঞানের কোনদিন ভাঙ্গটা নেই"—মায়ের এই কথার জের টেনে বুঝিয়ে বলতে বলি।

মা-মহাজ্ঞান—যা সত্য তাই জ্ঞান নয়। সত্য হল জ্ঞানের একটা রূপ। তবে যা সত্য তাই জ্ঞান নয়।

সত্য যখন জ্ঞানের একটি রূপ তাহলে সত্যকে অন্যরকম দেখাচ্ছে।

প্রসাদ—তবে যে মা বলেছিলে, যা সত্য তাই জ্ঞান?

মা-মহাজ্ঞান—হ্যাঁ, ঠিকই তো, এবার যোগ করে দিলাম—সত্য হল সেই জ্ঞানের একটা অংশ*। অংশ হলে জ্ঞানকে আরও বড় দেখাচ্ছে।

প্রসাদ—অংশ তাহলে কি করে সমগ্র হয়?

মা-মহাজ্ঞান—কেন সমগ্র হবে না? এখানে উল্টে যদি প্রশ্ন করে—'যা জ্ঞান তাই কি সত্য,' সেইখানে বরঞ্চ বেকায়দা*। কিন্তু কেন হবে না। ক্ষেত্র বিশেষে বলতে হবে—যা জ্ঞান তাই সত্য। একই কথা এসে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ জ্ঞান উপলব্ধি করলে সম্পূর্ণ সত্য উপলব্ধি হবে।

প্রসাদ—তাহলে চূড়ান্ত জ্ঞানী হলে যা ব্যক্ত হয় তাই সত্য। সেক্ষেত্রে কি বলবে, যা জ্ঞান তাই সত্য?

মা-মহাজ্ঞান—না, জ্ঞান সম্পূর্ণ সত্য অংশ। আরও বিচারে যাবে। সে ধাপে ঠিক ধরেছে—যা সত্য তাই জ্ঞান। এবার এই জ্ঞানে আরও যেতে হবে। জ্ঞানের শেষ যাওয়া হয় নি তার, কিন্তু সত্যের শেষ ঠিক

ধরেছে। অর্থাৎ তার মধ্যে ফাঁক কোথাও নেই। খাঁটি সত্য নিয়ে সে চলছে। চলতে চলতে জ্ঞানের শেষ সীমায় যেয়ে পৌঁছাবে। আর তার বিচারের কিছু থাকবে না।

সেখানে দাঁড়ালে জ্ঞান সমগ্র। সত্য, আদর্শ, ন্যায়, নীতি, নিষ্ঠ ইত্যাদি ইত্যাদি সব তার অংশ।

তোদিকে কি বোঝাতে পারছি না। আরে যে মা কানন সেই মা সাধক। এবার তুই সাধকের ধাপে আয়। আগে মা-টাকে ধরে ফেলেছিস তুই। আরে যে মা সেই সাধক। এই কথা বলে দিচ্ছি—যা, যে মাকে পাঠিয়ে দিয়েছি সেই মা তোর সাধক। তুই বলছিস, বাঃ তা কি করে হয়! সাধক তো অন্য লাইনে চলে যাচ্ছে। এ তো আমার মা দেখতে পাচ্ছি।'—আরে সেই মা-টাকে ধরে তুই সাধকে পৌঁছাবি। সত্য ধরে সেই জ্ঞানের শীর্ষে যেয়ে পৌঁছাবি। খুব ভাল করে বুঝতে পারছিস না। এগুলো উপলব্ধির জিনিস। ভাসা ভাসা জ্ঞানে শুনে রাখ, পরে জ্ঞানতঃ বুঝবি।

প্রসাদ—সত্য হল জ্ঞানের একটি রূপ। আবার বলছ অংশ। তা মা রূপ হলে অংশ, অংশ হলে রূপ হয় কি করে?

মা-মহাজ্ঞান—দু'টি সম্ভব বাবা। রামধনুর সাতটা রং মিলেই সূর্যের আলো। এবার একটা একটা রঙকে সত্য, আদর্শ, ন্যায়, নীতি, নিষ্ঠা ধরলে সূর্যের আলো হল জ্ঞান। অংশ আর আলাদা ভাবে বুঝিয়ে বলার কি আছে। একটা গোটা জিনিসকে পাঁচ সাত ভাগ করে নিলে এক এক ভাগে এরা পড়ল।

তারকা চিহ্নিত অংশ ধরে মাকে প্রশ্ন করি—মা, সত্য হল জ্ঞানের অংশ। আবার বলছ 'যা জ্ঞান তাই সত্য'। "বেকায়দা" বলতেই বা কি বুঝাচ্ছ?

মা-মহাজ্ঞান—'ক্ষেত্রবিশেষে' বলা হচ্ছে কেন? যা জ্ঞান তাই সত্য; সেটা সর্বত্রই। এবার ব্যক্তির মানার উপর নির্ভর করছে। সর্বত্রই সত্য নয়। যা জ্ঞান তাই সত্য নয়। ব্যক্তির বিচার ও পালনের উপর নির্ভরশীল।

প্রসাদ—তা কেন ?

মা-মহাজ্ঞান—সর্বদিক নিখুঁত বিচার করে যে জ্ঞান সেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের কথা বলা হচ্ছে এখানে। সেই জ্ঞান যা সত্য তা। জ্ঞানের একটি অংশ সত্য—যেমন ন্যায়, নীতি, আদর্শ ইত্যাদি। এবার সর্বত্রই যদি না-মানে সেটা।

প্রসাদ—আমি মানি আর না-মানি, এটা যে কাঠ তা কি পাল্টিয়ে যাবে ?

মা-মহাজ্ঞান—না, সে তার ঠিক থাকছে। সেইজন্য তো বলছে যা জ্ঞান তাই সত্য। তবে একটু 'বেকায়দা।' না, তা কেন ? ঐ যে একটু চিন্তা করল—অর্থাৎ সবাই যদি না মেনে নেয়। তাহলে আর সত্যের প্রমাণ কি ! তাই একটু ভাবিয়ে তুলল। পরক্ষণেই মনে হল—মানবে না মানবে না, সত্য সে ঠিকই পড়ে থাকবে। সত্যের তো বদল নেই।

প্রসাদ—তা তোমারই একটা মন শক্তিকে স্বীকার করে আবার অস্বীকারও করে।

মা-মহাজ্ঞান—ঠিক। আমার এই মনটা আবার আকারও স্বীকার করে। নিরাকার বলবে—তাতেও আছি। সব স্বীকার করি। যেখানে যেমন সেখানে তেমন। যাহাকে যেমন তাহাকে তেমন। অতএব এসবগুলিরই প্রয়োজন আছে। তুমি ধাপের পর ধাপ পেরিয়ে এসে সব বুঝতে পারবে। কিন্তু তুমি যা বুঝিবে তাহা প্রকাশ করিবে না। সে প্রকাশ করিলে ? তুমি জানিয়ে দিতে পার, কিন্তু সে পথে 'কাহাকে'ও আসতে বলো না। সে পথ বড় দুর্গম পথ। অতএব তাদিগে এমন ভরসা দিয়ে যেও না যে শক্তি নেই। তাহলে বিভ্রান্তিতে পড়ে যাবে।

আকার নেই একথা বলো না। এই দুর্গম পথে পা বাড়াবে কি করে। পা ফেলতে পারবে না পড়ে মরবে সেখানে।

আমাদের মায়ে মেয়ের কথা হয়েছিল—"তারা যেখানে দাঁড়িয়ে আর তুমি (মো) যেখানে দাঁড়িয়ে আছ তার মাঝখানে শক্তি, ঈশ্বর,

আকার, উপাচার ইত্যাদি রয়েছে। তাদিকে ঐখান থেকে এখানকে আসতে দাও। মূলতঃ যদি কিছুই নেই তাহলে তারা তো মাঝখানটা পেরতে পারল না। মরে গেল ঐখানেই। সেইজন্য না বলাই ভাল।"

অস্বীকারের কোন প্রশ্ন উঠতেই পারে না। আমিই স্বীকার কর্ছি সব।

জানি না চিনি না যারে
ভাবি মনে কতই তারে।
মনে হয় সুন্দর সে
কত মালা গাঁথব আমি—
গলায় দেব যে।

ওগো সুন্দর তুমি
দেখেছি আমার মাঝে—
এঁকেছি তোমায যে।
ভাবি শুধু কল্পনাতে,
দাঁড়াবে এসে জানি।

চিনি না জানি না যারে
সে মনে হয আসবে—আসবে ঘরে।
সাজাই আমি এ ঘর আমার
অতিথি আসিবে মনে করে।

কে তুমি কে শুনি
কে তুমি কে শুনি?
কখনো যে হয় গো মনে
তুমি আমার অন্তর—অন্তর স্থানে।
আবার কখন হয় গো মনে

দূর দূরান্তে রয়েছ রয়েছ
ডাকিব আমার ভবনে—
ওগো আমার ভবনে।
কে তুমি কে তুমি ?

যায় না দেখা যারে
ভাবতে ভাল লাগে যে গো তারে।
তাই তো ভাবি বারে বার
তুমি হবে কি গো
হবে আমার—আমার আপনার
আপনার ?

এই কথাটি মনে করে
চলি আমি চলি সদাই
খুঁজি তোমায় সবার ঘরে ঘরে।
যা দেখি, যা পাই কাছে
মনে হয়—মনে হয় সে নয় তুমি
আরো কত রূপ আরো কত কি
পাব তোমার কাছে।
ওগো পাব তোমার কাছে।

ঘুরনু আমি সবার মাঝে তাই
একে একে খুঁজে নিলুম
যার যেথায় সুন্দর পাই।
ওগো তবু মনে হয়—হয় না পূরণ
এরও বেশী আরও কিছু রয়।
ওগো আরও কিছু রয়।

খুঁজে দেখা পাব না যারে
সে যে আমার অন্তর ভরে
অবশেষে বলবে সে যে—
খুঁজ আপন মাঝে।
আপন মাঝে আমায় পাবে
তুমি আমার আমি তোমার যে।

হল না জানি মনের মতন
আরো সুন্দর আরো আরো—
আরো কিছু যদি রয় গো গোপন।
টেনে আনি তাই
আমার কল্পনাতে হায়।
দেখি নাই চিনি নাই যারে
কত সুন্দর কত কঠিন—
কত ভাবা যায় যে তারে!

এমনি করে ভাবলে পরে
পাই খুঁজে পাই সবই আমি
চিনি তোমায় চিনি যে গো
তুমি আমার বলে—
তুমি আমার বলে।

পাই না সাড়া বিশ্ব ঘুরে
আমার মাঝে ডাকছে কে রে
কে যেন ডাকে আমায়
শুধু তার প্রতিধ্বনি—মা
কখনো হয় যে মনে
না না না।

আয় আয় আয়
সবই আমার যাই যে ফেলে
আরো ছুটে যাই আরো দূরে
আরো কিছু আনব খুঁজে।
সাজাব সাজাব সবই সুন্দর
সবের সুন্দর
সেই—সেই যে।

একে একে সাজিয়ে তাই
দাঁড় করানু বস্তু দিয়ে
আকারে আনিনু,
ঈশ্বর তুমি শক্তি তোমার—
তুমি কৃপাময়
দাসত্ব তোমারে চাই।

মা-মহাজ্ঞান—একটা শক্তি আছে। সে শক্তিটা কি? একটা ভেপার। প্রকৃতির ক্ষমতা। সেই প্রকৃতির ক্ষমতাটা সৃষ্টির পূর্বে কোন এক লগ্নে সংঘর্ষের মূলে যে যেভাবে টানতে পারে। যে যতখানি।

প্রসাদ—"সংঘর্ষের মূলে" বলতে?

মা-মহাজ্ঞান—প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে বলেন—বহিঃপ্রকৃতিকে নিয়ে একটি পুরুষ ও একটি নারী সৃষ্টি হল। এদের অন্তঃপ্রকৃতি তৈরি হল। এদের সার বস্তু নিয়ে এরা যে যার মত বড় হয়ে উঠেছে। পুরুষের ক্ষেত্রে ধরি—বীর্য হল তার অসার বস্তু। তেমন নারীর ক্ষেত্রেও। অসার থেকে সন্তানের সৃষ্টি। যখন গর্ভাবস্থায় তখন মায়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার সার বস্তু গ্রহণের প্রশ্ন, সেইখান থেকে সন্তানের ব্যক্তিগত অন্তঃপ্রকৃতি গড়ে উঠছে। বাইরে বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে সে বহিঃপ্রকৃতি থেকে আবার গ্রহণ করছে। সে যেমন, তেমন গ্রহণ করে।

প্রসাদ—এ না হয় বুঝলাম মা। কিন্তু এই ভেপার থেকে পৃথিবী সৃষ্টি কি করে হল? এই ভূখণ্ড এই সূর্য চন্দ্র—কোথা থেকে এল?

মা-মহাজ্ঞান—সব একটা একটা করে তৈরি হয়েছে, একের পর এক এসেছে। একটা যখন খুঁজে বের করেছিস তখন বাকীগুলোও খুঁজে বের করতে পারবি। একটা সুতোর খি পেলে খুলতে খুলতে যাও সবটুকুই পাবে।

প্রসাদ—তাহলে বিশ্ব প্রকৃতিকে, কিছু না মানলে যে ভগবান বলে আখ্যা দিয়ে থাকি, তা মূলতঃ আপনা থেকেই হয়েছে?

মা-মহাজ্ঞান—হ্যাঁ।

প্রসাদ—তাহলে সৃষ্টি কেউ করে নি, স্রষ্টা বলে কেউ নেই।

মা-মহাজ্ঞান—আপনা ইচ্ছায় নিশ্চয়। এটা যদি আপনা ইচ্ছায় হতে পারে, ওটা নয় কেন, জ্ঞানে সরিয়ে সরিয়ে যাও। আগে একদিন তো বলেছি বস্তায় চাল পড়ে থাকতে থাকতে কোথাও কিছু নেই আপনা ইচ্ছায় সেখানে পোকার সৃষ্টি হল। কি করে হয়? বীর্য নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলে দেখা যাবে অসংখ্য পোকা তার মধ্যে। গু পড়ে থাকে, কি করে সেখানে কৃমি জন্মায়?

প্রসাদ—আপনা ইচ্ছায় না হয় এদেব সৃষ্টি হল। পোকার সুকৃতি তাহলে কি?

মা-মহাজ্ঞান—কিছুই নয়।

প্রসাদ—তাহলে সুকৃতি গালভারি একটা কথা।

মা-মহাজ্ঞান—হ্যাঁ সুকৃতি, কর্মফল, পূর্বজন্ম—মায় পরমাত্মা পর্যন্ত সব সব—নাগাল পায় না বলেই এদের স্বীকৃতি দেয়। আমার নাগাল কুলায় না বলেই বলছি, আবার আমার কুলালেও, তাদের কুলায় না বলেই, তোদিকে বলি।

তবে সুকৃতির একটা অংশ আছে। একেবারে সব উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যেমন একটা পোকা টানল—শক্তিশালী হল, অন্ত পাঁচটা পাশে পারল না কেন? তারা নির্জীব কেন? ঐখানেই সুকৃতি চলে এল। মূলতঃই সব কটি অসার জমিতে তৈরি হয়েছে বটে, কিন্তু সারটা

যে টানবে সেই সারটা ঠিক মত দিতে পারে না তাদিকে। ঐখানে হয়ে সংঘর্ষ। ফলে নষ্ট হয়ে যায়, মাত্র দুটি টিকে। ঐ জন্যই বলা হচ্ছে সুকৃতি নেই। তাহলেই বুঝতে পারছ—যেখানে নাগাল পাচ্ছে না সেইখানেই এই সব কথাগুলো চলে আসছে—ভাগ্য কর্মফল ইত্যাদি।

আচ্ছা আরো তলিয়ে চিন্তা কর—কেন বা হল না সে? অক্ষম কেন? তাহলে নিশ্চয় এর ভাগ্য ছিল বলেই পারল। এই ভাগ্য টানা হয়ে এল। একই জমিতে যদি একটা বীজ সবল, তবে অন্যটা দুর্বল কেন? কিন্তু তা বললে কি—বায়ু কখন কি ভাবে বয়েছিল, ভেপার কোথায় কতটুকু কি ভাবে সৃষ্টি হয়েছিল—কে বলতে পারে! কেউ ধাক্কা খেয়ে নির্জীব হয়ে পড়েছ সৃষ্টির গোড়াতেই।

তাহলেই বোঝা যায় মোটামুটি একরকম করে—আছে আবার নেই। একবার মানতে হবে, আবার বিচারে কেটে বেরিয়ে যাবে, এই চলবে।

তবে কোথাও কিছু নেই—'নেই'টা বলা বড় কঠিন—লাখে একটা। আবার বললেই তো হল না, যুক্তি দিয়ে বলে বোঝাতে হবে। 'নেই' বলা সহজ, কিন্তু যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করা যায় না। 'আছে' বললে অনেক ঝামেলা এড়িয়ে যাওয়া যায়। 'আছে' বললে সব যুক্তি দাঁড়িয়ে আছে।

মা-মহাজ্ঞান—তাহলে আমাদের কি কথা হচ্ছিল?—একটা শক্তি আছে। সে শক্তিটা কি—একটা ভেপার। প্রকৃতির ক্ষমতা। সেই প্রকৃতির ক্ষমতাটা সৃষ্টির পূর্বে কোন এক লগ্নে সংঘর্ষের মূলে যে যেমন ভাবে টানতে পারে—যে যতখানি। ঐখানে আমরা যুক্তিতে কুলাতে পারি না বলে নিয়ে আসি কি?—না, জন্মান্তর, সুকৃতি, কর্মফল, আত্মা, পরমাত্মা ইত্যাদি।

প্রসাদ—টানতে পারে, নিজের মত টানা—এ কথা তো অবান্তর। যা তা তো আপনা ইচ্ছায় হবে।

মা-মহাজ্ঞান—না, আপনা ইচ্ছায় হয় না। সেই সংযুক্ত অবস্থায়

যে ক্ষমতাটা—সেই ক্ষমতায় সেই মুরশুমে প্রকৃতির অবস্থাটা কি। সেই প্রকৃতির অবস্থাটা যার মধ্যে যে রকম চলে যায় সে সেরকম ভাবে পেয়ে থাকে।

দু'টো পোকা আপনা ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়েছে ভেপারের মধ্যে, সে রকম ভেপারের মধ্যে এটাও তো তৈরি। এগুলি এক-একটা ভেপার। জ্ঞানের ভেপার, অজ্ঞানের ভেপার—যার মধ্যে যেটা ঢুকে সে সেটা পেয়ে যায়।

প্রসাদ—তাহলে পোকার মধ্যে প্রকৃতি লুকিয়ে আছে?

মা-মহাজ্ঞান—সব সব। এবার বেরিয়ে তারা চরতে যায়। চরতে চরতে যে যেমন সে তেমন খাদ্য গ্রহণ করবে। আমি যেমন তেমন খাদ্য খেয়েছি। ফলে বলীয়ান হয়েছি।

মা-মহাজ্ঞান—আগেই বলেছি আগুনের গোলা। আগুনের সামনে দাঁড়াতে পারবি? সে ভেপার—সব লেখা হচ্ছে, প্লেটে প্লেটে বেরিয়ে আসছে।

প্রসাদ—আগুনের গোলাই যদি বল—সে তো একটা আকার। তাহলে ঈশ্বর নিরাকার বলছ কি করে?

মা-মহাজ্ঞান—গোলাও নয়। তোর চোখে গোল। তোর চোখের তারাটা গোল যে। তোর প্রকৃতিতে এমন সৃষ্টি হয়েছিস তুই, এই সাইজটা পড়েছে। আরে চর্মচোখ নিয়ে তো অন্তর্দৃষ্টি। এটা যদি গোল হয় তাহলে ওটাও গোল। না হলে দৃষ্টি কথাটা আসছে কেন? ছবি দেখা, আর কল্পনায় ছবি আঁকা—আঁকতে গেলেও সেখানে একটা দেখার প্রশ্ন আছে। যাই হোক এবার যে পাত্রে রাখবে তার আকার ধারণ করছে সে।

আগুনটা তোর পাত্রে নিলি এবং দেখলি। তোর পাত্র বলে, তোর পাত্রের আকারে পড়ে গেল। মূলতঃ এটা কিছু নয়, একটা ভেপার। (নিছক বোঝাবার জন্য এত বলতে হল। গোল, গোলা এ সব যুক্তি জানবি বড় কথা নয়।)

এ সব কথা বলিস না কিছু। মাথা গুলিয়ে ফেলবে। যা দিয়ে যাচ্ছি তার ভেতর থেকে খুঁজে বের করবে।

প্রসাদ—ভেপার বলতে তো আমরা বাষ্প বুঝি। তার তো কোন আকার নেই ?

মা-মহাজ্ঞান—না নেই।

প্রসাদ—প্রথমটা জলের উপর ধোঁয়াটে ভাব উঠল। তারপর মিলিয়ে গেল।

মা-মহাজ্ঞান—হুঁ হুঁ।

প্রসাদ—সেই বাষ্প থেকেই তো মেঘ নদ-নদী সাগর মহাসাগর ইত্যাদি।

মা-মহাজ্ঞান—হ্যাঁ হ্যাঁ। মাঝখানের জিনিসগুলো আমি রেখে যাচ্ছি। আগেও থেকো না পরেও না। পরে আসতে কেউ পারবে না।

প্রসাদ—এত দুর্গম।

মা-মহাজ্ঞান—দারুণ দুর্গম। ঐ দুর্গমে গেলে পরে জানিয়ে দেবে যে কিছুই নেই। তোমাকে জানিয়ে দেবে মানে ? তুমি নিজেই জানতে পারবে। জানিয়ে দেবেটা কে। আবার দেবে কি ! তোমার মধ্যে তোমার প্রতিধ্বনি হতে থাকবে।

প্রসাদ—তাহলে শেষ নেই ?

মা-মহাজ্ঞান—ঈশ্বর কে ? না, জ্ঞান। সর্বদিক নিখুঁত বিচার করে যা সত্য তাই সব—যা সত্য তাই জ্ঞান। সর্বলোকে বলবে যা তাই জ্ঞান। ঐটি ঈশ্বর।

প্রসাদ—ঈশ্বর বলতে তো জ্ঞান বুঝি মা। এখানে আর একটা কথা জেনে নিই অবিনশ্বর বলতে কি বুঝায় ?

মা-মহাজ্ঞান—জ্ঞান, জ্ঞানই সব। জ্ঞানের মৃত্যু নেই।

প্রসাদ—তবেই ঈশ্বরের আর এক নাম অবিনশ্বর ? যাই অবিনশ্বর তাই ঈশ্বর।

মা-মহাজ্ঞান—হুঁ, জ্ঞান অমর। সত্য অমর। ঐ জন্য অবিনশ্বর বলছ।

এই এত ভিতরের কথা জেনে ফেলছিস তো। মাথা গুলিয়ে যাবে। জানছিস কেন, ফক্কড়ি? ভগবান আছে। হাজার হাত কালী। হা হা হা।

যখন কারও খুব জ্বর আসে তখন দেখবি তুই, কেউ ঘন ঘন পেচ্ছাপ বসে, কেউ ঘন ঘন জল খায়, কেউ খুব হাই তোলে, কেউ খুব গান গায়, কেউ বা খুব কথা বলে। এঁ্যা, তাই না? এক একজন এক এক রকমে ভেপার বার করে। আচ্ছা এই যে—

আর বলব না, চাবি পড়ে গেল।

এরাই সবাই জনে জন
চায় মা, হিসাব আমার এসে
ওগো যখন তখন।
শুধায় আমায় এমনি করে—
"বল মাগো সত্য করে,
পেয়েছ কি তারে শুধাই
যারে ঈশ্বর সবাই বলে?"
হাসি মাগো আমি তখন।
বোঝ নাই কি ওমা আমার
সে মন—
সে মন তখন?

আমি বলব কি মা বলব ফিরে,
শুধু চেয়ে রই বদন পানে।
বলি আমি,
কেমন করে বলব ওরে
কারে বা ঈশ্বর বলে—কি ভগবান!
চিনি না তারে আমি, জানি না;
কেমন করে বোঝাই তোদের।
কেন শুধাস এসে?

ওরে শুধাস কেন।
আমি অজ্ঞান অন্ধ জেনে
দিস কেন রে লজ্জা আমায়—
কেন অপমান—
ওরে কেন অপমান?
কে বলে ঈশ্বর শুনি
কখন তারে চিনব আমি।
ছিল না সময় আমার যে রে
আমি কর্মে রত ছিলাম জানি।

বল মাগো সত্য করে
শুনেছি মা পুরাণ কত
কত পুরাণের গল্প মাগো।—
কত ত্যাগী, সাধক কত—
ওমা, দেখেছি মোরা সবাই মিলে।
জান নাকি কিছুই তুমি!
বল মা মোদেরে শুনি।

গল্প বলার নেই রে সময়
কেমন করে বলব আমি!
জানি না গল্প গুজব।
আয় ছুটে আয় তোরা সবাই,
'গুজব' বাদে দিয়ে যাব
দিয়ে যাব সব।

কারে ভগবান বলে শুনি?
আয় দেখি আয় পার হয়ে যা
ওরে দিয়েছি যে দেখায়ে নদী।

যাস না ডুবে ;
হবি রে পার ঠিকই জানি।
গল্প শুনে কাজ কি রে তোর।

অমন করে রইলি ভুলে
জন্মালি যে শিশু হয়ে মায়ের কোলে—
ওরে শুনিতে শুনিতে গান
করিলি জীবনের অবসান
নাই কি রে তোর প্রশ্ন মনে ?
শিখেছু যে কত এখন।
এনেছিলি স্বর সেই জন্মকালীনে।

দিয়েছিল স্বর যে রে
কেন চাইলি না রে দেখতে তারে ?
নয় ভগবান, ঈশ্বর জানি।
শুধু জ্ঞানের আলোয়
নয়ন মেলে দেখেছিলাম ;
দেখলি নারে কেন শুনি ?
-আর শুনবি ?

তুমি কি ঈশ্বর ?
খুঁজনু তোমার নামটি শুনে
না পেনু সন্ধান আমি—আমি যেখানে।
শুনেছিনু তুমি ঈশ্বর।
হে ভগবান, ওগো দেবতা,
কেন বিস্ময়ে তুমি ঘুরাও আমারে—
দাও গো এত কষ্ট ব্যথা।
ওগো দেবতা ওগো দেবতা।

তুমি কি ঈশ্বর ?
তবে খুঁজে দেখা পাই না কেন
সেই তো আমার বিস্ময়,
ওগো ঈশ্বর।
হায় কবে কখন—কখনো একক্ষণে
দেখা পেনু কোথায় তোমার কোথায় যেন,
এবার ভেবে—ভেবে বলি
শুন গো গোপনে।

তুমি ঈশ্বর
তুমি ঠাকুর—দেবতা জানি
তুমি প্রতিমা তুমিই শীলা
তোমার শক্তি তোমারই মুক্তি
ভক্তি জাগায়, জাগাবে জানি।
ওগো ঈশ্বর—ঈশ্বর তুমি।
তুমি ঈশ্বর তুমি ঈশ্বর।

আমার মনের—মনের কুটিরে
হঠাৎ কবে—কবে দেখনু কারে
আমার মনের—মনের কুটিরে।
আমি অবাক হয়ে চাই
শুধু ভাবি গো—ভাবি গো তোমায়,
এই পর্ণকুটির মাঝে
কারে দেখা—দেখা যায় যে !
ঐ দেখি নাই তারে ঈশ্বর বলে।
প্রতিমা, শিলা, মূর্তি তারে
বলিব কেমন করে ?

আমার মনের—মনের কুটিরে
দাঁড়ায়ে রহিনু তাই।
ভাবি এবার বলি কি হেথায়।
যারে খুঁজেছিনু আমি ঈশ্বর জ্ঞানে,
চেয়েছিনু ক'বি সার্থ' নয়ন—
সার্থক নয়ন দু'টি প্রতিমা অঙ্কনে।
হায় বিস্ময়ে তাই চাই।

আমার দেহ মন্দিরে
এ যে কার দেখা পাই কেমন করে।
আমি দেখিনু তোমারে
শুধু ভেবে ভেবে
শুধাই আমি আমি আমারে।
আমি কি দেখিনু—কি দেখিনু
কি দেখিনু আমার হেথায়।

এ যে মন কুটিরে রয়েছে ঘেরে
তবে এরে কি বলা যায়?
কি বলা যায়?
চিন্তা করে দেখনু তারে,
এ তো আর কিছু নয়
এরে শুধু জ্ঞান বলা যায়।
ওগো—ওগো দেবতা,
দাঁড়াও তুমি একটুখানি
আমি কয়েকটি গো কৈ কথা
ওগো দেবতা ওগো দেবতা।

হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ: একে উপলব্ধি বলে। এরই নাম, হ্যাঁ, শুনছি এ কথাটাও। বারে বারে আমার কানে আসে। শুনে যাই। হুঁ হুঁ হুঁ:

আমার মনের কুটিরখানি
ওগো দেবতা, দেখি আমি ভাল করে—
ভাল করে তারে চিনি।
তুমি দাঁড়াও ওগো একটুখানি।
একটুখানি।

যত ভাবি ভাবা যায়
জ্ঞান বৈ কিছুই নাই।
আমি পেয়েছি তারে আমারই ঘরে;
আমারই কুটির—কুটির ভরে রয়েছে
ডাকে আমারে।
আমি আর কিছু কিছু চাই।

এবার শুধু আপন ঘরে
দাঁড়িয়ে ভাবি—
আমি কি বলে ডাকিব ডাকিব—
ডাকাব সবারে তাই।
আমি বিস্ময় হয়ে ভাবি শুধু ধেয়ে
দেখে এনু আমি দেখে এনু যা,
খুঁজে সেথায়—ওগো খুঁজে সেথায়
আমার মাঝে চাই।
আমি শুধু জ্ঞাং-রে খুঁজে পাই।
আর কিছু নাই
নাই নাই
নাই।

ঈশ্বর, তুমি করেছ হরণ—
তুমি সর্বথেকো সর্বেশ্বর

হে ঈশ্বর।
খুঁজেছিনু তাই আমি।
হঠাৎ কখন আমার মনে জাগল
সেই ক্ষুদ্র প্রশ্নখানি—
দেখি যাই ঘরে,
আছে কি কুটিরে!

খুঁজে পেতে তাই
আমি আমার সম্পদ বাড়াই।
আমি আমার নিয়ে হতে চাই ধনী
মিছে শুধু—শুধু খুঁজে কেন—
কেন করি আমার সর্ব খুয়ার আমি
আমি!
খুঁজে দেখনু তাই
জ্ঞান বৈ আর কিছুই নাই।
আর কিছুই নাই।
নাই।

এবার ভেবে চিন্তা করে
কি নামে পরিচিত করিব—করিব তারে—
কি নামে ডাকবা আমি
ভাবনা আমার তাই।
আমি করে যাব সবার কাছে
ব্যাখ্যা আমার নামের,
এই নামেতে খুঁজিবে—
খুঁজিবে সবাই।

আমি জগৎ মাঝে দিয়ে যাব,

খুঁজে নেবে সবাই এসে।
খুঁজিতে হবে না জানি ;
এই নামেতে ডাকবে শুধু—শুধু
খুলে যাবে আপন ঘরের বন্ধ দুয়ার
সেইখানেতে পাবে ঈশ্বর
তারই নাম জ্ঞান-মণি।

আমি নামটি শুধু দিয়ে যাই।
আমার মাঝে পেয়েছি খুঁজে
আমি জ্ঞানেরে হায়।
দিই বিলায়ে নামখানি তার
জগৎ জনে ডাকবে—ডাকবে।
এই নামেতে ডাকলে পাবে,
আমি বলে যাই।
বলে যাই।

নামের দৌড়
নাই রে কোথাও ;
হবে না খুঁজতে যে কুড়।
শুধু একটি কথা—
একটি কথা বলে ডাকা চাই।
সত্য—সত্য
সত্য মোদের চাই।
সত্য দিয়ে গড়ব মোরা, ভাঙব না
ভেঙে যাবে স্থূল, হয়ে যাবে ধূলিসাৎ
আমি তো ভাঙি নাই।
সত্য মোদের চাই।

ও সত্য,
তোমায় শেষে বলি,
তোমায় ডেকে ডেকে
হেসে খেলে আমি যাব—
যাব চলে—চলে,
মিলাব—মিলাব তোমাতেই
তোমাতেই।
আমি যদি মরি
কে নেবে সত্য নাম ধরি!
পড়ে যাবে খসি সকলি তোমারই।

তাই বারে বারে
বলি তোমারে
ধূলিসাৎ করো—করো আমারে।
কণ্ঠের ধ্বনি মিলায়ো নাই,
"সত্য চাই,
সত্য ছাড়া রক্ষা নাই—
নাই।"

আমার সত্য নাম দিয়ে গেনু
খুঁজে পেয়েছিনু যা কুটিরে আমার।
জেনো সে যে জ্ঞান
তারই নামে ডাকবে সবাই
সত্য নামে প্রচারিনু সবার মাঝে
সত্য মোদের চাই
চাই।

দুঃখ বেদন ভুলে

শুধু সত্য নামের পরো মালা
জ্ঞান বিচার দেখবে তোমার ঘরে।
আমি বলে যাই বলে যাই—
বলে যাই পারেতে চলে—
মিশে রব যে সেথায়।
আমি হারাব নাই
হারাব নাই।

হয়েছে ? হয়েছে ? এবার উত্তরটা দাও দেখিনি ? যা বলেছিলাম তা মিথ্যা বলি নি। (হাসি)

তা বলছিস কেন—ওটা ভুল ? ওটা বলবি কেন ? আমি যা বলেছি সেইটেই ঠিক। অর্থে কি তত্ত্ব আছে। অর্থে কি সার্থ আছে ? সত্য—তাতে অমরত্ব রয়েছে। হ্যাঁ, তাই।

যে জ্ঞানকে আমার কুটিরে আমি খুঁজে পেয়েছিলাম সেইটের ব্যাখ্যা করে যাওয়াই কি ভাল নয় ? ঈশ্বর—সে কে সে কি ? নাঃ। হুঁ, সেই শক্তিকেই—সেই আমারই মধ্যে আমি অনুভব করেছিলাম।

এবার ? কেউ পারে না ? বিশ্বাস করতে পারলাম না তা। কেউ কি সেই কঠোরে তপস্যা করেছিল ? হুঁ হুঁঃ, না। অনেক নীতিতে ভুল ছিল। পালনে ? হুদো হুদো ভুল। হ্যাঁ, তাই। সত্যই সেই অমরত্ব নিয়ে আসে। সত্যই সেই জ্ঞান বিচারকে খুঁজে বের করে দেয়।

আচ্ছা বলুক না। হুঁ হুঁ হুঁঃ। এইটাই অর্থ ভেঙে বের করুক। ঠিকই আছে।

আচ্ছা কর না তোরা, কর কর। হ্যাঁ হ্যাঁঃ রে। তোরা তো অনেক কিছুই জানিস, তা এটা বের করতে তোদের আর কি কষ্ট হবে।

হুঁ। দেখ, আমি দেখি আর ভাবি। তবে তোদের ধারাতে তোরা ভুল করছিস, না ? তাই বলবি ? তাহলে 'ভুল করছিস'—এটা স্বীকার কর। হুঁঃ।

না, ভুল। যা বলেছি তা ঠিক।

আচ্ছা এই প্রশ্নটা কিন্তু একবার তোলা যাক। মন্দ কি। আমি যে কথাটা বললাম সে কথাটার মধ্যে কি বিরাট ভুল। আমি বলছি—অর্থে কি তত্ত্ব আছে, অর্থে কি সার্থ আছে? এটা কি ঠিক? আমি ঠিক বলে বললাম। কিন্তু এটা ভুল।

এই ভুল যদি না আমি ভেঙে দিয়ে যেতে পারি, তাহলে এই নিয়ে হয়তো অনেক কিছুই বিচার, পণ্ডিত—সব এসে যাবে। অনেক কিছুই আলোচনার বস্তু হযে যাবে।

এটা কোন্ অর্থে আমি বললাম, তা তোরা কি বুঝতে পারলি? তা তোরা বুঝতে পারলিনি। অর্থে—যেমন বললাম সার্থ নেই, তেমন জানবি সার্থ আছে। অর্থে কি তত্ত্ব আছে? যেমন নেই তেমন আছে। এ এই দুটো কথা বলে গেলাম, এবার তোরা বিচার করতে পারবি।

দেখ বাকীটা আমি আর ভেঙে গেলামনি। আমি ভাঙলে সবই ভেঙে দিয়ে যেতে পারি। কিন্তু সে ভাঙায় তোদের সার্থকতা কোথায়? তোরা ভাঙবি রে তোরা ভাঙবি—তোদের জন্য রেখে গেলাম।

হ্যাঁ হ্যাঃ, জানবি দুটোই আছে। এবার কি আছে—কেন আছে কেন নাই? এ দুটো তোরা বিচার করে পাশাপাশি বোস করাবি, কেমন? হ্যাঁ।

আর সত্যে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঃ অমরত্ব আছে। এই একটা কথা। কিন্তু আর একটা কথা বলিনি। সেটা আমি কি গোপন করে গেলাম? আমি কি কপটতা করলাম? যদি তোরা বলিস—হ্যাঁ, হয়ত এককালে বলবি যে, আমি গোপন করেছি আমি কপটতা করেছি। কিন্তু যদি খুব নিঝঞ্ঝাট মাথা নিয়ে বুঝতে চায়, তাহলে বলবি—'না, বাকীটা বলার কোন প্রয়োজন ছিল না, তাই বলে না, তবে ছুঁয়ে রেখে যাই। সেইজন্যে আর ভাবতে দেব না তোদিকে। আর ভাবতেই হবে না।

হেঁ হেঁঃ, অমরত্ব? তার মানে? তাহলে এবারে বল—যে সত্য অমরত্ব আনাচ্ছে সেটা কি? সেটা নামের অমরত্ব। সেটা তোর দেহের অমরত্ব নয় রে। এ্যাঁ, তোর ক্ষুধার অমরত্ব নয়—যে চাওয়া-পাওয়া

নিয়ে এসেছিলি। সেখানে জানবি তুই লালায়িত—লাঞ্ছনায় ধূলিসাৎ হয়ে যাবি। জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাবি।

হীরা মানিক রইল থাক, এবার বিচার করবি।

দে, জলটা দে তো। (বাস্তব বোধ)

"অর্থে কি তত্ত্ব আছে অর্থে কি সার্থ (সার্থকতা) আছে"—বিস্তারিত ব্যাখ্যায় মা।

ঐ অহংকারটুকু যদি বাদ দিতে পার তাহলেই আছে। কিন্তু সে কেটে কেউ বাদ দিতে পারে না। সেইজন্যই নাই বলছে। ও থাকলে হয় না। অর্থ থাকলে হয় না। অর্থ থাকলে কোন কাজ না; নিঃস্ব হয়ে যেতে হয়। কিন্তু যদি কারো অর্থ থেকে সে নিরহংকারী হয়, তবেই তার পেয়ে গেলে হয়ে গেল।

অর্থ থাকলে তার অহংকার থাকবেই একবারে। সে যদি এক গলা জলে দাঁড়িয়ে বলে—এ্যাঁ, যেমন করেই সে বলুক কোন মতেই তাকে বিশ্বাস কেউ করো না যে, তার অহং নেই। এ্যাঁ? অহংটা এবারে বহুরূপীতে বেরবে। এ্যাঁ, বহুমুখী হবে অহংকারটা। সেই একটা মুখ সে নেবে। না নিয়ে সে পারে না।

সেইজন্যে বলছে—না, দরকার নেই। যদি এক কথায় 'দরকার নাই' বলে দিয়ে চলে যায়, তাহলে এসব বড় বড় পণ্ডিতগণ এসে বিচার করে যখন দেখবে, বলবে—কি করে উনি বলেছিলেন—এটা নাই, এটা দরকার নেই? এ কথা উনি বললেন কি করে? বহুরকম ফেকড়া দেখাবে তো? সেইজন্য 'হ্যাঁ আছে' বলে গেল। কিন্তু এই অহংকারের জন্য তাকে ধ্বংস করে দেবে। ঠিক তাকে আগাতে দেবেনা।

নিরহংকারী মন না হলে পরে সে অর্থের কোন সার্থই নেই। সে কার আছে বল? আমাকে সে রকম একটা লোক খুঁজে তোমরা বের করে দাও। এ্যাঁ, এতে যদি কেউ বলে—হ্যাঁ, আমার আছে, তাহলে পুনরায় আমাকে আবার ঈশ্বরের ঘরে যেয়ে জানতে হবে যে, না, সেই রিপুটা তার নেই। সে রিপুটা তার নেই।

সেইজন্যই বলছে—অর্থে কি সার্থ আছে অর্থে কি তত্ত্ব আছে? না নাই। কোন সার্থও নেই কোন তত্ত্বও নেই। অর্থ থাকলেই স্বার্থের প্রয়োজন মিটবে, নিঃস্ব হয়ে যাও। হয়ে গেলেই সেই একা—এককেকে তুমি পেতে পারবে। সেই জ্ঞান একটি কথা। 'হ্যাঁ আছে'-টা কেন বলল? এইজন্যে যে, অর্থ না হলে তো কোন কাজই করা চলবে না। এ্যাঁ, যে কোন কাজ করতে যাবে, সেই অর্থের দরকার তো? ঐখানেই এসে যাচ্ছে তত্ত্ব এবং সার্থ। উ, তত্ত্বটাই তোমার সার্থ।

'অর্থে কি তত্ত্ব আছে, অর্থে কি সার্থ (সার্থকতা) আছে'—আবারও পড়তে কিছু পাই

মা-মহাজ্ঞান—যখন অথ পরার্থ হয়ে নিঃস্বার্থকে লক্ষ্য করে তখন অর্থে তত্ত্বও আছে সার্থও আছে। সাধারণ ভাবে অর্থে কোন কোন তত্ত্বও নেই কোন সার্থও নেই। যে অর্থেতে এই সাধারণ সংসারী যারা—পরার্থের দিকে যাদের কোন লক্ষ্য নেই, তাদের কাছে তত্ত্ব কোথায় পাচ্ছ তুমি। স্বার্থের ফেরে তত্ত্ব কোথায়! সেখানে কোন সার্থকতা নেই।

যে কোন কাজ করবে—ঐখানে এসে যাচ্ছে তোমার তত্ত্ব এবং স্বার্থ।—ঐ তত্ত্ব দিয়েই তো সেই 'সার্থকতার স্বার্থ' আসবে। জীবনই বাণী—বাণীই জীবন। যে কোন কাজ করবে, তোমার অর্থের প্রয়োজন হবে। সেইখানেই এসে যাচ্ছে তত্ত্ব এবং স্বার্থ।

একটি মেয়ের বিয়ে দিচ্ছ। মেয়েটির বিয়েতে কি হল না-হল, অমুক তমুক কি অবস্থা—সব তত্ত্ব। পুরা দেখতে পাবে। ঐখানেই স্বার্থ। যদি তোমার নিজের মেয়ে হয় সে-ও একটা স্বার্থ আর যদি অন্যের মেয়ের বিয়ে তুমি দিয়ে দিচ্ছ, সেও একটা স্বার্থ। সার্থকতার স্বার্থ। কিন্তু তোমার নিজস্ব স্বার্থ মিশে আছে বলেই ওখানে 'সার্থকতা'টা দিল না। ঐ যে 'আমি'—আমি বিয়ে দিলাম। পরার্থের মধ্যে 'আমি' মিশে গেল বলেই স্বার্থ বলে ছেড়ে দিল।

প্রসাদ—তাহলে মা, সেই যে সার্থকতার স্বার্থ, ওটাও তো ঠিক

বাঞ্ছনীয় নয়। তাকেও তো ভেদ করে বেরিয়ে যেতে হবে

মা-মহাজ্ঞান—হ্যাঁ। আমি তোমার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। সেই আমি—আমি মিশে যাচ্ছে। তোমার মেয়ের বিয়ে দিয়েছি আমার মেয়ের বিয়ে দিয়েছি—এক ধাপ নীচু। ও এক ধাপ উঁচু। আমার মেয়ের বিয়ে দিয়েছি, তোমার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। আমার মেয়েও নয় তোমার মেয়েও নয়, কিছুই নয়—বিলীন। সেই বিলীন-মনটা আনতে হবে। এ্যাঁ, সেইটিই হচ্ছে সার্থকতা। আর তা না হলেই স্বার্থ। একটা 'সার্থকতার স্বার্থ" আরেকটা শুধু 'স্বার্থ'।

গানের ব্যাখ্যায় মা মহাজ্ঞান—"কেন বিস্ময়ে তুমি ঘুরাও আমারে / দাও গো এত কষ্ট ব্যথা!"—যেখানে বিস্ময়ের প্রশ্ন মা, সেখানে কি কষ্ট ব্যথা আসতে পারে? যার নাগাল মেলে না, তিনিই না বিস্ময়ের বস্তু?

মা-মহাজ্ঞান—এখানে বলতে চাচ্ছে যে, তোমার এই সৃষ্টি দেখে—বহির্জগৎ অন্তর্জগৎ দেখে আমার কাছে সব বিস্ময়েরই বস্তু হচ্ছে। কিন্তু এই বিস্ময়কে অতিক্রম করার মতন কি আমার ক্ষমতা আছে? অথচ তুমি আমাকে বলছ—হ্যাঁ, নাগাল পাবে। তাহলে বিস্ময় কেন? না, খুবই আশ্চর্য হচ্ছি, আমার ভাল লাগছে। খুবই নিতে চাচ্ছে জিনিসটা, অথচ নিতে পারছে না।

তাহলে ব্যথা কষ্ট আমার কেন এত? অতিক্রম না করতে পারলেই যে ব্যথাটা কষ্টটা, সেইটিই বলছে। এই ব্যথা কষ্টটা কেন দিচ্ছ আমাকে? তুমি তো আমাকে চেনো—আমি একটা কীটাণুকীট। সেইটিই বলতে চাচ্ছে।

কিন্তু তা হয় না। সেটা এর বলার মতন এ বলছে। কিন্তু হবার নয় এ জিনিসটা। করিয়ে দেবার নয়। আমি তাকেই বলছি, আমি, তার করার কোন রাস্তা নেই। তার শুধু আশ্বাস—আশ্বাসেই সেই ব্যথাটা বহন করতে পারবে। করবে যে, সে নিজেই করবে। করে

দেওয়ার ক্ষমতা কারো নেই। সৃষ্টির সময় যা হয়ে গেছে, তাই। এবং সেই সৃষ্টিই তাকে করতে হবে।

তিন রকমের মাটি রয়েছে। সে কি এক মাটিতেই পুতুল গড়বে? তা তো নয়। তাহলে সেই বালি মাটি পাঁক মাটি আর বেলে মাটি—সব মাটিতেই পুতুল গড়তে হচ্ছে। এবার কথা হচ্ছে যে, যখন পাঁক মাটি—তার সঙ্গে বেলে মাটির ভাগটা বেশী আছে, তখনই সেখানে পাবার প্রশ্ন হচ্ছে। তারই লাগছে বিস্ময়। আর সে-ই বলছে, কেন এত ব্যথা কষ্ট দাও। তুমি আমাকে পাইয়ে দাও।

প্রসাদ—তাহলে আমাদের রক্তের মধ্যে একটা মাটিকে তুমি উপলব্ধি করছ, শিক্ষায় একটা মাটি গিয়ে জোগান দিচ্ছে। আমাদের ক্ষেত্রে যেমন ধরা যাক। তাহলে মা, এই যে মিশ্রিত অবস্থা, এই অবস্থা ব্যতিরেকে কি উপলব্ধিব প্রশ্ন আসতে পারে না?

মা-মহাজ্ঞান—না।

প্রসাদ—কিন্তু যে নাগালটি পাওয়ার জন্য এখানে আঁকপাকানি, তা কি পেতে পারে? শিক্ষা এবং রক্ত মিলে সেই যে মিশ্রিত মাটি, সেই মাটি কি তাঁর নাগাল পায়?

মা-মহাজ্ঞান—হুঁ। সে নাগাল পাবে বলেই তো এই কথাগুলো বলছে। বিস্ময় কেন তাহলে আর? সে তাহলে চিনতে শিখেছে। বহির্জগৎ অন্তর্জগৎ নিয়ে কেন তার এমন বিস্ময়—আঃ কি গঠন কি গড়ন! কি সুন্দর কি ভাবে করেছে! আমি পারব না আমি পারব না! অথচ পারতে যেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে তার মুখ থেকে রক্ত উঠছে। সে আছাড় কাছাড় খাচ্ছে। কিন্তু সেখানে সে বলছে—তার করে দেওয়ার কিছু নেই। এ বলছে বোকার মতন। কিন্তু এই বোকার মতন একে চিরদিনই বলে যেতে হবে। করে দেওয়ার কিছু নেই। তার শুধু আশ্বাস। সেই আশ্বাসটাই তার পাইয়ে দেওয়া। সে না আশ্বাস দিলে কেউ আগাতে পারে না তার আশ্বাস তোমার চেষ্টা।

প্রসাদ—'ঈশ্বর তুমি সর্বখেকো সর্বেশ্বর হে ঈশ্বর',—/ঈশ্বর তুমি করেছো হরণ / তুমি সর্বখেকো সর্বেশ্বর, হে ঈশ্বর।'—'সর্বখেকো' বলছো কেন ঈশ্বরকে ?

মা-মহাজ্ঞান—সর্বখেকো নয় ?

প্রসাদ—সব খেয়ে বসে আছে ? মানে পাপ-পুণ্য যাবতীয়। ত্রিগুণাতীত সেই অর্থে ?

মা-মহাজ্ঞান—ত্রিগুণাতীত। তুমি সর্বেশ্বর, তুমি সর্বখেকো। সব তুমি খেতে পার।

প্রসাদ—সব, খাওয়ার তোমার যোগ্যতা আছে।

মা-মহাজ্ঞান—স্পৃহাতেও তুমি সেই ঈশ্বর, নিস্পৃহাতেও তুমি সেই ঈশ্বর। তাহলে নিস্পৃহাতে যখন দাঁড়াচ্ছ তখন স্পৃহাকে খাচ্ছ তুমি। স্পৃহাতে যখন দাঁড়াচ্ছ তখন নিস্পৃহাকে খাচ্ছ।

তবে আমি বলছি—খোল ধারণ করে বলছি, যতক্ষণ না বিলীন হচ্ছি ততক্ষণই 'সেই' বলছে। তোমরা বলছ—'মা, পারলে তুমিই হরণ করতে পার'। সেইরকম 'পারলে তুমিই হরণ করতে পার'—এই কথাই বলছি।

যদি সেই প্রকৃতি বা পুরুষকে আমরা লক্ষ্য করতে পারি তাহলে সেই তাকেই তো বলব সব। সেই তাকেই বলছি।

প্রসাদ—'মনের দৌড় নাই রে কোথাও,
হবে না খুঁজতে রে কুড়।'—এর ব্যাখ্যা দাও।

মা-মহাজ্ঞান—মনের দৌড় কারোর নেই। মনের দৌড় থাকলে কুড় খুঁজতে যেতে হবে না। ঘরেই কুঁড় খুঁজে পাবে।

প্রসাদ—যদি সে রকম বলিষ্ঠ মন হয়, যদি অধ্যবসায়ী হও তাহলে, কোথায় তিনি কি তিনি—বিস্তর এলোমেলো প্রশ্নে জর্জরিত হতে হবে না। সব নিজের মধ্যেই পেয়ে যাবে।

মা-মহাজ্ঞান—আর যত না পাবে তত হাৎড়াবে, এখানে ধরবে ওখানে ধরবে সেখানে ধরবে।

'বুঝলেই জানবে সোজা
না বুঝলেই বোঝা।'

—যত বুঝবে ততই সোজা লাগবে।

প্রসাদ—তবে একটা কথা মা ঠিক তো যে, বিষয় বস্তু বোঝার মত হওয়া চাই। বিষয় বস্তুই যেখানে মা বোঝা ভার হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানে আর বুঝবেটা কি, যে সোজা লাগবে! তোমাকে বাদ দিলে ধর্ম বলতে যা বুঝায় না মা, সেটা একটা মস্ত বোঝা।

মা-মহাজ্ঞান—একটা রিকেট রুগীর সামনে দশ মন তুলতে কি দেবে কেউ? রিকেট রুগী তো সে শুয়ে পড়েই আছে, সে যেতেই পারবে না। সে তো আর যাবেই না। প্রথম কথাই হচ্ছে, বোঝা যদি তার সামনে পড়ে তাহলে নিশ্চয় সে-বোঝাকে তার চিন্তা করবার ক্ষমতা আছে বলেই তার সামনে বোঝাটা এসেছে। কেন তার সামনে এসেছে? প্রথম প্রশ্ন সেইখানেই—"আমার সামনে এ বোঝা এলো কেন? তাহলে আমার বইবার ক্ষমতা আছে। এবারে সে ক্ষমতা আমি জানতে পারিনি। আগে সেই ক্ষমতা খুঁড়ে বার করি। কেন আমার সামনে এলো, ওর সামনে এলো না কেন?"

প্রসাদ—নাঃ এ মানব কেন মা? তুমি তিন রকম মাটির কথা বললে। তাহলে বিভিন্ন মাটির বিভিন্ন ভাবরূপ। (মাকে দেখিয়ে সন্তান বলে চলে) মনে কর আমি পাঁক মাটি, আমার কাছে যে বোঝা ও বেলে মাটি ওর কাছেও সেই বোঝা, ও বালি ওর কাছেও সেই একই বোঝা। সেই এক তোমাকে উপলব্ধিই প্রশ্ন।

মা-মহাজ্ঞন—তিন জনের কাছেই দেখ গে যাও—সেই একই মাটি তিন জনের কাছে রয়েছে বলেই বোঝাটা একই সঙ্গে কাছে এসেছে। এবারে বোঝাটা কম-বেশী ভাগ হয়েছে। পাঁক বালি বেলে—নিছক পাঁকই যদি তাহলে সেই পাঁকের সামনে কেন এ বোঝাটা এসেছিল? এবারে সেই পাঁককে খুঁজতে হবে। নিশ্চয় পাঁক মাটি—এমন একটা বেলে দিয়ে শুরু করে, পাঁক দিয়ে তা তৈরী হয়েছে। সমস্ত পাঁককে ভার ধুতে হবে। আমার সামনে কেন এলো? আগে সেইখানেই প্রশ্ন

আমার। সেইখানেই মন-যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল আমার।

কেন? বলছে কি? না, দুর্বলকে আমি কোন আমল দিই না। সেই ভক্তিবাদী সেই মোয়া। তা নয়। যে সবল যুবক সন্তান তাকে আমার চাই। বয়সে যুবক বলছে না। সেই আন্তরিক যুবককে আমি সব সময় চাই।

আগে তুমি ভাবো—তোমার সামনে কেন বোঝাটা এলো? এইখানেই তুমি সমস্ত উত্তর খুঁজে পাবে। তোমার সামনে এসেছিল কেন? এ এসে থাকার জন্যে তুমি কি কি চেষ্টা করেছিলে, বল? তাহলে তোমাকে রিকেট বলে সরিয়ে দেব। ও তোমাকে লোক দেখানোর জন্যই ওটা দেওয়া হয়েছিলো সামনে। তুমি আগে প্রমাণ-গুলো আমার সামনে ফেলে দাও তো।

প্রমাণ ফেল। কতখানা ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিলে আমি দেখি। কত জায়গায় কি ধারায় দেখি। কোথায় কোথায় তোমার হাড় খুলে খুলে পড়েছিলো, আমাকে আগে দেখাও। আমাকে মানে তোমাকে—নিজেকে, সেই নিজের মধ্যেই রণযুদ্ধ চলছে—কেন এলো আমার সামনে? কি কারণে এসেছিলো? এবার ক্ষত-বিক্ষতটা? সেই স্পৃহা।

অনন্ত আবিষ্কার

['মন যা স্নায়ু তা, আত্মাই স্পৃহা'—এই সার সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা 'মা-মহাজ্ঞান' প্রণীত 'মন—শূন্যমন' গ্রন্থে বিস্তারিত পাই। শ্রীপদ-প্রান্তে সমগ্র সংগ্রহের সূচনায় সেদিন সংক্ষেপে কেবল কয়েক কথায় ছুঁয়ে যান তিনি—মন আত্মা পরমাত্মা সবই মানুষের এই দেহের মধ্যে। মন ধরে আত্মা, এবং আত্মা ধরে পরমাত্মা—এ বড় বিচিত্র বিচার। তবে যুক্তি যখন ধারায় ধারায় মহামুক্তি হয়ে বৈশিষ্ট্য বুঝায়, তখন তো আর কোন বিরোধ দাঁড়াতে পারে না, গতি তারা নেবেই।

অবশ্য কেউ কারো গতি রোধ করতে পারে না। তবে কে কারটা চির অকাট্য বুঝে পান, এখন সেই হল কথা। শ্রেষ্ঠত্বের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে সর্বধর্ম গাইতে পারে নিষ্কাম কর্মের কথা, বেদ উপনিষদ বলতে পার—আত্মা অবিনশ্বর। কিন্তু 'মা-মহাজ্ঞান' 'নিষ্কাম' শব্দ নিয়েই আপত্তি তুলেছেন। পরার্থের পথ ধরে নিস্পৃহ হওয়ার যত যুক্তি দিয়েছেন তিনি। বুঝিয়েছেন—আত্মা স্পৃহা বৈ কিছু নয় যদি, তাহলে তা আবার অবিনশ্বর হয় কোন্ সুবাদে! খোলের সঙ্গে বোল মিশে থাকে। খোল পড়ে গেলে কিসের কি যত আবোল-তাবোল বকা! গণ্ডগোল বাধালেই হল? থাকবে তো কেবল কীর্তি।

অমরত্ব প্রশ্নে কোন অসাধারণ সমীক্ষাই অবশ্য সব নয়। অসাধ্য সাধনের নামে নিরন্তর সংগ্রাম, নিয়ত যে সূক্ষ্মতা দাবী করে, মানুষের খোলে তা একরকম অসম্ভব। মানুষ মাত্রেই প্রতি পদক্ষেপে পিণ্ডি পাকিয়ে বসে থাকে। তাকে 'গোলাকার অগ্নিপিণ্ডের ধারণা দেওয়া কি কোন সহজ ব্যাপার! পদে পদে সর্বশক্তিমান 'মা-মহাজ্ঞান'কে বিব্রত বা বিরক্ত করা ছাড়া আমাদের যেন কোন উপায় থাকে না। যে যোগ্যতা সাধনা-সাপেক্ষ, অতিবড় পণ্ডিত বা সাধকেও সেখানে পরম অজ্ঞ—অগত্যা এই সিদ্ধান্ত নিয়ে শ্রদ্ধা জানাতেই হয়। তার পরেই না বিস্ময়ের সূচনা?]

"ধর্ম মানেই আত্মানুভূতি।" এই যে কথা মা, তা আগেই জানতে হয় আত্মা কি।

মা-মহাজ্ঞান—আত্মা বলতে এক কথায় জানবি স্পৃহা। মন বলতেও তাই। যাই মন তাই আত্মা। এবার সেই স্পৃহাকে কিছু সন্তুষ্ট করে বলে বুঝিয়ে, ধীরে ধীরে স্তব্ধ কর। এই ব্যক্তিগত স্পৃহা স্তব্ধ হলেই হবে পরমাত্মা উপলব্ধি।

স্পৃহাকে আগে অনুভব কর—আগে জান, যে যার নিজের চাওয়া পাওয়া। এবার যত তাদের আবেদন অগ্রাহ্য করে সরে আসতে চাইবে, ততই হবে জ্ঞান। সেই জ্ঞানই নিয়ে যাবে মহাজ্ঞানের স্তরে—হবে সত্যের সার্থক উপলব্ধি।

মন মোটামুটি সব এক রাস্তায় চলে। নিজের দিয়ে যা বুঝবে, তাই পাঁচজনের বেলায় বোঝাতে পাববে।

সচরাচর আমরা যে বস্তু নিয়ে খেলা করি তাকে মন বলে জানি। আসলে সে-ই যে আত্মা সে খেয়াল আমরা রাখি না। কিন্তু চিন্তা করে দেখলে দুই-ই একই স্তরের জিনিস পাই। যা'ই মন তা'ই আত্মা। এবার সেই মনকে আমরা ধীর স্থির, চিন্তিত-বিচার, উপলব্ধি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বুঝি আত্মা। সেই আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারলে বুঝতে হবে আমার মন আমার আয়ত্তে এসেছে। তখন পরমাত্মাতে যাবার রাস্তা পরিষ্কার হল।

শুধু পথই পরিষ্কার, তাই বলে যাওয়া হল না। এবার যদি আমি সেই স্তরে যেয়ে চেষ্টা শুরু করি, ত্যাগ বৈরাগ্য নিয়ে, তবেই হবে পরমাত্মার উপলব্ধি। মহাপুরুষ—শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, তাহলে এবার বুঝেছ, নিজেকে দিয়ে কত বিচার করে, তবে বিচারের যোগ্যতা এলো অন্যের বিচার করবার জন্য।

এবার বল, যদি তুমি শুধু আত্মা উপলব্ধি করতে চাও ? তাহলে ঐ উপরের লাইনই টানা হয়ে এলো—মনকে স্থির করলেই আত্মাকে উপলব্ধি করা হচ্ছে। এবং চাওয়া পাওয়াকে বিচার বুদ্ধিতে পরিচালিত

করা হচ্ছে। একে তুমি কি বলবে? শুদ্ধ চিত্ত বা শুদ্ধাত্মা। এর বেশী কিছু নয়। পরমাত্মাকে তুমি জানতে পারলে না। কিন্তু পরমাত্মাকে কোন্ রাস্তাতে গেলে পাওয়া যায়, সেইটুকু তুমি জেনেছ। মহাজ্ঞানী হলেও তুমি জ্ঞানী।

মন বা আত্মা পরমাত্মা সবই একটি কাঠামোর মধ্যে বিরাজ করছে। এদের যা কিছু বিচার মস্তিষ্কে। মস্তিষ্কই সমস্ত কিছুর মূল।

প্রসাদ—একটা কথা আছে মা, ধর্ম মানেই আত্মানুভূতি। আত্মা যদি মন, বুদ্ধি, অহংকারের অতীত হয়, তবে তার অনুভূতি—সে আবার কি জিনিস! এই দুটি প্রশ্ন। অনুভূতি বলতেই স্নায়ুগত কিছু একটা যেন। স্নায়ুর বাইরে অনুভূতি বলে কিছু আছে কি? যার স্নায়ু নেই তার কি অনুভূতি আছে।

মা-মহাজ্ঞান—নাঃ। মন যা স্নায়ু তা।

প্রসাদ—সেটা তো আপনার দর্শন বলছে। কিন্তু ওরা তা মানে না।

মা-মহাজ্ঞান—ব্যস সেখান থেকে সব এসে গেল। মন যা স্নায়ু তা, এবারে স্নায়ু নিয়ে আসছে কি কি?—বুদ্ধিও নিয়ে এসছে, অহংকারও নিয়ে এসছে, জ্ঞানও নিয়ে এসছে। মানে এক কথায় বলতে গেলে, বুদ্ধিই নিয়ে আসছে স্পৃহা নিস্পৃহা। এদের ওপরয়ালা কে? মন, তাহলে মনই ঐ দু'টোকে টেনে আনছে। এবার মনের অতীত কে স্নায়ু। স্নায়ুর অতীত কে? না মাথা। সেই আসল ব্রেনেতেই সব হচ্ছে কিন্তু। কার্যালয় সব ঐখানে।

প্রসাদ—এখন প্রশ্ন হচ্ছে মা, অনুভূতি যদি স্নায়ুর ব্যাপার হয়, তাহলে সেখানে আত্মার কথা উঠছে কি করে?

মা-মহাজ্ঞান—আত্মার অনুভূতিই হচ্ছে ধর্ম।

প্রসাদ—আত্মা বলতে আপনি যা বোঝাচ্ছেন, সেখানে বরং একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু ওরা যখন বলছে—আত্মা, মন, বুদ্ধি অহংকারের অতীত কিছু একটা ঠিক মানে আমাদের দেহের মধ্যে নয়, দেহ থেকেও নয়—

মা-মহাজ্ঞান—হুঁ। ঠিকই বলছে। দেহের মধ্যে নয়।

প্রসাদ—আত্মায় পাপ পুণ্য কিছুই স্পর্শ করে না ?

মা-মহাজ্ঞান—পাপ পুণ্য কিছুই স্পর্শ করে না।

প্রসাদ—আপনি বলছেন আত্মা মানে হচ্ছে স্পৃহা।

মা-মহাজ্ঞান—কর্মশক্তি যেখানেই আছে, সেখানেই আত্মা। জড়ের উপরে কোন আত্মা নেই। জীবের উপরেই আত্মা আছে। জীবের বাইরে কোন আত্মা নেই।

প্রসাদ—স্নায়ু শিরা উপশিরা যা কিছু আছে, সব কিছু পাপ পুণ্য নিয়ে আছে দেহের। আমাদের ব্যক্তিগত ভাল মন্দ নিয়ে। কিন্তু আত্মাকে কোন কিছুই স্পর্শ করে না।

মা-মহাজ্ঞান—ভুল কথা ওটা, কথাটাই ভুল। কেন, না এখানে একটা বলছে—আত্মার অনুভূতি ; বলছে কি কোথাও ? না তোমার প্রশ্ন ? যাইহোক যারই প্রশ্ন হোক।

ধর্ম মানেই আত্মা অনুভূতি। যখনই বলছে ধর্ম মানেই 'আত্মা অনুভূতি', তখনই এই কথাই বলতে হবে যে, আত্মা পরমাত্মার দিকে লক্ষ্য দিয়েছে। মানে নিস্পৃহতে চোখ ফেলেছে। যখন আত্মা নিস্পৃহার দিকে চোখ ফেলে তখনই আর ধর্মে অনুভূতিটা আসে। আরও ভাল করে বোঝানো যায় ? কি করে বোঝাব।

জন্ম থেকেই সে নিয়ে এল তার পরিমিত আহার বিহার। সে জন্মসূত্রেই কিন্তু নিয়ে এসেছে। সেইজন্যে আজন্ম ধর্মের একটা অনুভূতি তার মধ্যে আছে। কোন শিশু জন্মাবার পরই যত সে বড় হয় দেখা যায়, সে না খেয়ে খাওয়াতে চায়, না পরে পরাতে চায়। তার দিতে ভাল লাগে করতে ভাল লাগে ইত্যাদি। এইরকম তাকে ভাল লাগে। জন্মসূত্রেই তার সেই জিনিসটা থাকে। বুঝতে পারছ ? নিস্পৃহ ভাবটা নিয়েই সে জন্মায়।

আচ্ছা আবার এখানে মিলিয়ে দেখ যে, যখন সেই ধর্মের অনুভূতি বয়েছে—যখন মনে কর তুমি খুব ভোগী। তোমাকে ত্যাগের লাইনে নিয়ে আসা যাচ্ছে, তুমি নিজেই ইচ্ছা করে এসেছ। কেউ নিজেই ইচ্ছা

করে আসে—কাউকে ডাকতেহয় না, সে নিজেই এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আবার কেউ হাতছানি দেয়, চলে আসে। চলে এসেই সে যে এত খেত পরত ভালবাসতো সব, সেগুলো না ভালবেসে, সে দিতে করতে ভালবাসচ্ছে। আমি খেয়ে কি হবে আমি করে কি হবে। তাহলে সেই ধর্মবোধটা তার আসছে। তাহলে সেই আত্মা, ধর্মের অনুভূতি বলছে। সেই অনুভূতিটা তার আসছে। কি করে আসছে কোথা থেকে আসছে? সেই স্পৃহার ঘর থেকেই আসছে কিন্তু।

আত্মা মানেই স্পৃহা। সেই স্পৃহাটাকে সে রূপান্তরিত করছে এই দিক দিয়ে। এটা জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কারো দেখা যায়। আর কাউকে বা ডাক দিয়ে আনা যায়। আর কেউ বা এমন একটা বয়সে এসে নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই তিনটা স্টেজ থাকে। আচ্ছা, কিন্তু জানবে, সকলেই নিয়ে আসে। যে নিয়ে আসেনি, তাকে কেউ দিতে পারে না। এটা জানবে। ধর্মের অনুভূতিটা। আত্মার অনুভূতি ধর্ম—আত্মার অনুভূতি কেউ আনিয়ে দিতে পারে না।

প্রসাদ—আত্মা, আপনি যা বলছেন, মন যা স্নায়ু তা। স্পৃহাই হচ্ছে আত্মা। তাহলে সেই স্পৃহা নিয়ে মা—স্পৃহাপ্রবণতা নিয়ে প্রত্যেকটি জীব জন্মায় তো। শুধু মানুষ বলে নয়, প্রত্যেকটি জীব। ধর্ম মানেই আত্মানুভূতি—এটা যেন মা ব্যাপক অর্থেই বলছে। স্পৃহার জগতও ধর্ম বটে, নিস্পৃহর জগতও ধর্ম বটে। সুতরাং নিস্পৃহর দিগন্তে লক্ষ্য করলেন যে ধর্ম, তা কেন বলব?

মা-মহাজ্ঞান—না, না, না।

প্রসাদ—এবার সেই ধর্মের সূক্ষ্মতা। এই রকমই তো আপনার কাছে জেনেছি।

মা-মহাজ্ঞান—সূক্ষ্মতা এবং ধর্মের রূপ। কি রূপ? খাওয়াটাও যেমন একটা ধর্ম, দেওয়াটাও তেমন একটা ধর্ম। দু'টাই ধর্ম। সেই আত্মার অনুভূতি থেকেই ধর্মটা এসেছে। এবারে সেই ধর্মটা কি ভাবে তার রূপ নিচ্ছে, সেই রূপটাকে দেখে, কোন রূপকে দেখে মুগ্ধ হওয়া, আর কোন রূপকে দেখে বিস্মিত হওয়া, আর কোন রূপকে দেখে

দাঁড়িয়ে যাওয়া। এই তিনটা রূপ আছে। এ্যাঁ? ছিঃ ছিঃ, একটা ছিঃ ছিঃ এল।

প্রসাদ—বিস্মিত মানে ছি ছি হওয়া।

মা-মহাজ্ঞান—হ্যাঁ, ছি ছি। এমনই তার আত্মায় অনুভূতিটা যে বিস্মিত হওয়ার মত বিচ্ছিরি জিনিস একটা। বুঝতে পারছিস?

আমার তো লেখাপড়ার ভাষা নয়। লেখাপড়ার ভাষা দিয়ে আমি বুঝতে পারব নি তোদিকে। তোরা লেখাপড়ার ভাষা দিয়ে বুঝে নে।

প্রসাদ—তাহলে একটা ঘেন্না করছি, একটা দাঁড়িয়ে যাচ্ছি আর একটা অবাক হচ্ছি।

মা-মহাজ্ঞান—হ্যাঁ, এই তিনটে।

প্রসাদ—মনকে স্থির করলেই আত্মার উপলব্ধি হচ্ছে। ও কথাটা কেন বললেন আপনি? কারণ মন যা স্নায়ু তা। স্পৃহাই আত্মা, মনকে স্থির করলে—অর্থাৎ স্নায়ুকে স্থির করলে, অর্থাৎ চাওয়া পাওয়াকে স্থির করলে, তবেই হচ্ছে আত্মার উপলব্ধি। সেই গোড়ার কথা—পরিমিত আহার-বিহারে চলে আসছ।

মা-মহাজ্ঞান—সেই এক কথায় চলে আসছে।

প্রসাদ—তাই করলে সীমিত চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে দিয়ে মানুষ তার নিজের মনের ওজনটা বোঝে। ওজন বুঝল মানেই কি সে আত্মাকে উপলব্ধি করল।

মা-মহাজ্ঞান—করতে পারবে। করল নয়, করতে পারবে। একটা রাস্তা পেল।

প্রসাদ—তাহলে প্রশ্ন আসে মা, 'আত্মা উপলব্ধি' বলতে কি বোঝায়।

মা-মহাজ্ঞান—আত্মা উপলব্ধি বলতে, ঐ যে যা বলেছি, ঐ বুঝায়। আর ওর বাইরে কিছু নাই। চাওয়া পাওয়াকে সীমিত কর। কি ধরনের কার চাওয়া পাওয়া। সীমিত করলে পরেই তোমার মনকে তুমি জানতে পারবে। তাহলে চাওয়া পাওয়াকে সীমিত কর বললে, সেখানেও তো মন আসছে। আচ্ছা আগে ওখানে—

প্রসাদ—আগে আমার স্বরূপ জানলাম আমি। মন আমার চায়, কতদূর ছুটতে চায়, কি পেতে চায়, কেন পেতে চায় ইত্যাদিগুলো।

মা-মহাজ্ঞান—হ্যাঁ, এগুলো। এখন এগুলোকে বুঝে তুমি মনটাকে যখন জানতে পারলে, এবারে মনটাকে ধরবার চেষ্টা কর, কি রকম? না, মন তো সে বায়ুর বেগে ছুটছে। আচ্ছা তাকে ধরাটা কতখানি ক্ষমতা, সেই ক্ষমতাটাকে আগে আন। সে কিছুতেই তোমার ধরা থাকবে না। আচ্ছা তাকে ধরতে পারলেই তখন তুমি আত্মার উপলব্ধি করতে পারছ। মন যা স্নায়ু তা। আচ্ছা আত্মা যা মন তা। এসব এক খিচুড়ি পাকিয়ে দিচ্ছে। সবগুলোই সেই এক।

প্রসাদ—তবে ঠিক এক বলা যায় না মা, কেন যে বলছেন, ঠিক বুঝতে পারছি না আমি, আচ্ছা আর মন এক। কেন না মা, এই একটা পাইপের মধ্যে দিয়ে জল যাচ্ছে। পাইপ আর জল এক জিনিস নয়। আপনি বলছেন, স্নায়ু যা তাই মন। পাইপটা যদি আমার স্নায়ু হয় আর্থাৎ মন, তাহলে যে জলটা যাচ্ছে আমার প্রবণতা অর্থাৎ আত্মা। এখন যে জলটা যাচ্ছে সেই জলটা কি কখনো পাইপ হতে পারে মা? কেন বলছেন, মন আত্মা এক জিনিস?

মা-মহাজ্ঞান—জল আর পাইপ এখানে আসছে কেন? মন যা স্নায়ু তা বলছি। হ্যাঁ? মন জিনিসটাই কি?

প্রসাদ—স্নায়ু।

মা-মহাজ্ঞান—স্নায়ু তো। এদিকে পাঠাচ্ছে কে?

প্রসাদ—স্নায়ুব মধ্যে মা আমাদের যা কিছু প্রবণতা প্রবাহিত সেটা একটা স্বাভাবিক ধারা। কেউ পাঠাচ্ছে টাটাচ্ছে নয়। প্রবণতাকে যদি আমি জলের 'সঙ্গে তুলনা করি তাহলে পাইপ হচ্ছে না কি আমার স্নয়ুটা? স্নায়ুর মধ্যে দিয়ে যদি প্রবণতা প্রবাহিত হয়, তাহলে যাচ্ছে তো একটা জিনিস, স্নায়ুর মধ্যে দিয়ে।

মা-মহাজ্ঞান—ওটাই যাওয়ার রাস্তা।

প্রসাদ—রাস্তা। তাহলে এই পাইপ, যাচ্ছে জলটা, তাহলে পাইপ যদি আমার স্নায়ু হয়, তাহলে জলটা হচ্ছে আমার প্রবণতা,

আত্মা। বিরোধ কোথায়?

যাই মন তাই আত্মা বলতে একটা জিনিস বুঝেছি যে, তোকে আত্মা, মন-টন নিয়ে চিন্তা করতে হবে না, আগে স্পৃহাকে স্তব্ধ কর। তাহলে কোন্‌টা মন কোন্‌টা আত্মা বুঝতে পারবি।

মা-মহাজ্ঞান—যাই মন তাই আত্মা। আর যাই মন তাই পরমাত্মা, সবই এক বলে দিচ্ছে কিন্তু, মনের কাছেই। পরমাত্মা, মন, এগুলোকে ভাগ করে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে। এটা ভাগে পড়ছে। ভাগ ভাগ করা যাচ্ছে।

প্রসাদ—ভাগ তো বটেই। একটা স্থূল যে ইচ্ছা—প্রবণতা মা সেটাকে আমরা আত্মা ধরি। যেটা সূক্ষ্ম ইচ্ছা, তাকে পরমাত্মা ধরি।

মা-মহাজ্ঞান—শুধু নিজেকে বুঝবে আর এর সঙ্গে মিলাতে থাকবে।

প্রসাদ—কথা হচ্ছে মা, নিজের মধ্যে যে আগমন তরঙ্গ বইছে, তার কাছে আপনার দর্শন ছোট মনে হয়। আপনি সত্ত্ব নিংড়ে নিয়ে দিয়ে দিয়েছেন তো, তাহলে এটা পড়ে আমি এর হিসাব নেব, না আমি আমার হিসাব নেব? আমার হিসাব নিতে গেলে মা, আমি মালা কিন্তু গাঁথতে পারছি না। শুধু অসঙ্গতি, শুধু অসঙ্গতি, শুধু অসঙ্গতি। এলোমেলো ভাব রূপ সব

মা-মহাজ্ঞান—এলোমেলো ভাব রূপটা—একটা দিকে যেমন তুমি ভয় পাচ্ছ না, তেমন একটা দিকে প্রয়োজন, ঐ এলোমেলো ভাবগতিগুলোকে ধরে ধরে তোমাকে মালা গাঁথতে হবে। ঐ এমনি এমনি করছে সব সময়।

প্রসাদ—আমার কেমন যেন একটা অসম্ভব মনে হয়। আপনিই পেরেছেন। পেরেছেন তার প্রমাণ আপনার দর্শন। পেরে আপনি নিখুঁত করে দিয়ে গেছেন। সাজানো সব একবারে। কিন্তু আমাকে আপনি পারতে বলবেন না। আপনি দেখবেন মা, আমি কেবল পালিয়ে বেড়াই। নিজের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করব, বিচার করব

বিশ্লেষণ করব, আমার যেন সে অবকাশ নেই। মনে হয় ওখানেই যদি আমি আটকে যাই, তাহলে এটা বুঝব কি করে! বরং এখানেই সময় দিই, দূর ঘোড়ার ডিম, ভেতরে যা বইছে বোক।

মা-মহাজ্ঞান—বইছে তো ? তাহলে এইটাতেই সময় দাও। ঐটা টানা হয়ে আসবে। অঙ্গাঙ্গি জড়িত কিন্তু, তুমি এটাতে দারুণ ভাবে বুঁদ হয়ে এখানে বসে যাও তোমার আপসে ওগুলো টানা হয়ে আসবে এখানে। তোমার ভিতরের জিনিসগুলো এই লেখার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছ। আবার তুমি নিজের মধ্যে তাকাও, দেখবে বইটি তোমার ভিতর খুলে রয়েছে কে ।

আত্মা—আলোচনায়

প্রসাদ দেহ—স্থূল, নশ্বর, মিথ্যা। আত্মা—অবিনশ্বর, সত্য। 'আত্মা-সত্য' 'দেহ-মিথ্যা'কে আশ্রয় করে আপনাকে প্রকাশ করতে বাধ্য। তাহলে যে সত্য মিথ্যাকে আশ্রয় করে নিজেকে ব্যক্ত করে, সে নিশ্চয় প্রকৃত সত্য নয়।

মা-মহাজ্ঞান—হীরা মানিক দুর্মূল্য কিছু, অমনিটা মাটিতে ফেলে রাখবে কি ? না। গুছিয়ে একটা বাক্সর ব্যবস্থা করলে। এবার মূল্যবান কোন্‌টা ? বাক্সটা নিশ্চয়ই নয়। আচ্ছা তাহলে দাঁড়াচ্ছে কি—বুঝলে ? বলবে মীমাংসা হল না।

দেহটা কি—মিথ্যা ; পুড়িয়ে দিলেই চুকে গেল। বক্তব্য কি—সত্য ? তাহলেই বেরিয়ে যাবে। বক্তব্যই সত্য হওয়া চাই। কাউকেই জানতে হবে না। বেশী ভাবনার কি প্রয়োজন। আত্মা-সত্যের স্বরূপ কি—জানার দরকার নেই। দেহ-মিথ্যাকে সে আশ্রয় করে আছে। এবার বক্তব্য কি তারই হবে বিচার। যুগ যুগ ধরে আলোচনা গবেষণা বিচার বিশ্লেষণ চলবে।

আদি সত্যের ব্যাখ্যায় আত্মা নিয়ে মাতামাতি করার কি

প্রয়োজন। আসল হল বক্তব্য। তোমার বক্তব্য বাণী যদি ত্রিকালজয়ী হয় তাহলে সেখানে পরম সত্যের প্রকাশ।

এবার আর এক দিক বোঝ। কোন জিনিস খুব ভাল হলে তাকে খারাপের মধ্যে দেখবে। মাগুর মাছ দারুণ উপকারী—থাকে গভীর পাঁকে, গোলাপ কাঁটার বনে, হীরা নাকি কয়লার খনিতে। মাছ, গোলাপ বা হীরা দরকার, এবার পাঁক ঘাঁটো কাঁটা সরাও বা খনিতে নামো। দেহ সামলে (সহ্য, বিকার ইত্যাদি) বক্তব্য ও কর্মকে কর শ্রেষ্ঠ।

প্রসাদ—সে যুগের সত্য-ব্যাখ্যা এ যুগ স্বীকার করে না। তেমনি এ যুগ যাকে পরম সত্য বলে আখ্যা দেবে উত্তরকালে তাও তো বানচাল হয়ে যেতে পারে? এবার যে সত্যকে আজ ত্রিকালজয়ী বলে প্রচার করছি তার পরিণতি কি হবে কে জানে!

মা-মহাজ্ঞান—তারা যা বলেছিল, তা তুমি খুঁজে দেখ। হলে তুমি বুঝতে পার নি, না হলে তারা বুঝাতে পারে নি। জিনিসটা ঠিকই, এবার গুছিয়ে ব্যক্ত করতে পারল না। করলেও অযোগ্য, তুমি গ্রহণ করতে অক্ষম। হলে উচিত মূল্যে সে মানিককে বিক্রি করতে পারে নি, খোরাকের দরকার ছিল—চাহিদা, তাই যেখানে সেখানে যেমন তেমন দামে মানিক বেচে দিয়েছে।

'আমি সত্য ব্যাখ্যা করতে বসেছি। এদের যা বুঝাব তাই বুঝে যাবে। এখন দরকার আমার কিছু শিষ্য, কিছু অর্থ আমিত্ব। সেইজন্য যেমন তেমন দামে বিক্রি করে দিলাম। এরা এদের মধ্যে সে জিনিস গ্রহণ করতে পারল না, তাহলে আমি হয়ত ঠিকই ব্যক্ত করতে পারলাম না। দ্বিতীয়তঃ আমি হয়ত ঠিকই বলে চলেছি, এরা উল্টো বুঝলো। তৃতীয় কারণ ঠিকই বলেছে ঠিকই বুঝেছে, কিন্তু এখন সে অবস্থায় চলছে না।

এখন আমাদের মানিকের দরকার নেই, এখন সোনার দরকার, (ধর্ম সত্য আদর্শ এ তো উপরের চিন্তা, আগে চাই অন্ন বস্ত্র সমস্যার

সমাধান। দিন রাত ঠাকুর ঠাকুর করলে আর চলছে না। ছুটতে হচ্ছে উপার্জনের পথে। কর্মই হোক ধর্ম—সৎপথ অবলম্বন কর।) বা মানিক কেনার টাকাও কারো কাছে নেই। তাহলেই মানিক অকেজো হয়ে যাচ্ছে। আমি না তোমায় মূল্য দিলে তোমার মূল্য কি? মানিককে মূল্য দেওয়া হয় বলেই তাই, না দিলে? সে তো একটা পাথর পড়ে থাকবে।

সেইরকম সকলেই আমরা সেই সত্যকে গ্রহণ করলে তবেই তার মূল্য, নচেৎ কি মূল্য—সত্যের গুরুত্বই বা কি! কিন্তু সত্য তাব মত পড়ে রইল, আমি আমার এড়িয়ে গেলাম। আমি আমার যা কাজ তাই করলাম, সত্য সত্যের মত পড়ে রইল, শুধু যোগাযোগ হল ন'। অগ্রাহ্য করলেই তোমাকে ফলভোগ করতে হবে—এ বলেও ভয় দেখাতে চ ই না। মানিক তুমি না নিলে কিছু যায় আসে না।

কেউ নেবে না 'তো ভী আচ্ছা'। মানিক বনে জ্যোতি দিতে বইল। গাছের তলাটি আলো করে রইল। আমি তার আলো নিয়ে কাজে লাগাতে পারলাম না। গতানুগতিক অন্ধকার রাস্তায় ছুটতে রইলাম। আমাব যা ধারণা তা আমারই রইল তাতে কারো কিছু যায় আসে না।

আত্মা সত্য। পরমাত্মা তাহলে কি? আত্মা পরম সত্য কখন? যখন পরমাত্মা এসে সেখানে আশ্রয় নেয়। যে যেমন কাজ করে তার কাছে তাই সত্য এবং ʼুরুত্ব পায়। বাস্তবে চলে—তোমার আত্মা তোমার কাছে সত্য, আমার আত্মা আমার বিচারে। সকলে সকলের আত্মা সত্য বলে বলছ, আমি বলছি এ ধারণা ভুল। তোমাদেব আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগাযোগ নেই।

এবার কেন নেই, প্রথম কথাই হল—সকলেই যদি এক তবে আমি যা বলতে পারছি তুমি তা বলতে পারছ না কেন? এবার আমার সঙ্গে বিচারে একে একে সব কিছুকে ফেল, দেখবে নিজেদের বিন্দুবৎ মনে হবে। তাহলেই আসছে সেই অসীম জ্ঞান। এবার সেই জ্ঞান আমার কোথা থেকে এলো, আর কেনই বা আমাকে আশ্রয়

করেছে? যোগাযোগ হচ্ছে এবং তার দ্বারাতে আমি ব্যক্ত করে চলেছি। আমার সঙ্গে তার প্রতিনিয়ত খেলা; তোমার সঙ্গে নয়।

আত্মা সত্য—যে যার কাছে সে তার। পরম সত্য কখন? —না যখন পরমাত্মা এসে যোগ দিচ্ছে। তার লক্ষণ? যখন দেখবে তার অলৌকিক জিনিস সব ব্যাখ্যা হচ্ছে।

নিখুঁত জ্ঞান বিচারই শক্তির সার্থক প্রকাশ। যা কোনদিন কেউ ধারণা বা কল্পনা করতে পারে না, সেই জিনিসই সে অনর্গল বলে বুঝিয়ে যাচ্ছে। আমি রান্না করছি বা নিকৃষ্ট কোন কর্মে ব্যস্ত, বিরাট পঞ্চাশজনের মন ভুলিয়ে একটা গান গেয়ে দিলাম। কি করে পারলাম, কে দিল জোগান? আত্মা আত্মা আত্মা আত্মা বিশ্বআত্মা দাঁড়িয়ে গেল। কৈ আমার মতন তো কেউ পারল না। তাহলেই সেই পরমাত্মার প্রশ্ন উঠছে। সে আমার সঙ্গে খেলছে।

এবার পরমাত্মা স্থায়ী হয় কোথায়? না যে আত্মার কাছে সে শান্তি পাচ্ছে তার কাছে তার স্থির থাকা চলে।

প্রথম জেনেছিলাম—সে কি কথা, আত্মা মাত্রেই সত্য। গাড়ি মাত্রেই আমার হাতে গড়া, তাই বলে কি সব ইঞ্জিন আমি চালাই? কখনই নয়—ভুল। আমি তৈরি করেই ছেড়ে দিই। কিন্তু যেটি বিশেষ ধরনের তাকে আমি নিজে গাইড করে নিয়ে যাই—আমি নিজে তার ড্রাইভার হই।

আত্মা সত্য ঠিকই, আবার বলব—ঠিক নয়। আমিই তৈরি করেছি সব, কিন্তু তাই বলে কি বলতে চাও—সবার মধ্যেই আমি আছি, তা কখনোই নয়। শুধু আমার হাতের সৃষ্টি। কিন্তু জানবে এর মধ্যে যেটি বিশেষ ধরনের তার দিকেই আমার লক্ষ্য। তাকে নিজে চালাই, গর্তে পড়তে দিই না।

এ সব তর্কে বহু দূর। শুধু রিপু সংযম কর সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। রিপু দমন।

'আমি এসেছি পৃথিবীতে ভোগ করতে।'—বেশ, যাও। তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

এখনই তর্ক উঠবে—তারই হাতের গড়া যদি, তাহলে ভিন্ন ভিন্ন কেন ? আরে ভিন্ন ভিন্ন কোথায় দেখছ ! মূলতঃ আমরা সকলেই সেই মানুষ। এবার যে যার যোগ্যতায় যতটুকু এগোতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে কথা উঠবে—কেন পারি না দুর্বলতা সরাতে ? তখনই বলব কর্মফলের কথা। আজই এখনই সে সব চাইলে, পাবে কি করে বা তোমার দেখে হিংসা করলে কি লাভ হবে! দিয়ে থাকলেই পাওয়া যায়—পরিশ্রম করলেই ফল। যেমন খাটাবে তেমন পাবে।

কত জন্মের সুকৃতির মূলে একজন পায় পরমাত্মার ছোঁয়া। এবার আশ্রয় করা—সে চিন্তা করা যায় না। কি ভাবে নিজেকে বলি দিলে তবে সেই পরমাত্মাকে খুঁটে বেঁধে রাখা যায়, তা বলে বুঝাবার নয়।

ব্রহ্ম কি ?

প্রসাদ—আচ্ছা মা, ব্রহ্ম কি—ব্রহ্ম বলতে কি বুঝায় ?

মা-মহাজ্ঞান—ছাখ, ব্রহ্ম কি এ কথার উত্তর কি দেব ! প্রথম বলি শক্তি। আর যদি আর একটু ভাল করে গুছিয়ে বলতে হয় তাহলে আমি যা চাক্ষুষ দেখেছি এবং অন্তর্লোকে অনুভব করেছি তা শুধু এই মনে হয়েছে—একটি আগুনের গোলা।

এবার এই যে জীব বা জড়ের সৃষ্টি, এ সমস্তই ঐখান থেকে হয়েছে। এবং তার কয়েকটা টুকরো টুকরো ঘটনা আমার চোখে পড়েছে। এই যে আগুনের গোলাটা দেখা গেল এখানে খানিকটা ধোঁয়ার মত 'ভেপার, (জলের বাষ্প জাতীয় কিছু) তবে আগুনেরই বাষ্প বলতে যদি কিছু বোঝ তবে তাই। খানিক পরে দেখা গেল সেই 'ভেপার' আর নেই, কতকগুলো আকার। আবার কিছুক্ষণ পরে আর একটা জায়গা দেখা যাচ্ছে, সেখানে আরও বেশী ভেপার ও আরো সুন্দর। এবং নড়া-চড়া ও শব্দ। বেশ খানিকটা সময় সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মনে হল, রং রূপ লেখা। আর অল্পক্ষণের মধ্যে কে যেন বলে উঠল আমাকে—"এই হল আদি বা ব্রহ্ম, চিনলে তো ?"

তবে এর আগের ঘটনাটা তোমাদিগে কিছু বলা দরকার। বাস্তবে

নানা ভাবে নানা রূপে আমার কাছে প্রশ্ন এগিয়ে আসে—ঈশ্বর কে কি, 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' ইত্যাদি। আমি কিন্তু এ সবের তাৎপর্য কিছু জানি না বা বুঝি না। হঠাৎ একদিন আমার কানে আওয়াজ হল—এসো ব্রহ্ম সত্য তোমায় দেখাব ব্রহ্ম কি, ঈশ্বর কে ?

আমি সমাধিস্থ অবস্থায় প্রথম দেখি কি—কে যেন আমায় ডেকে নিয়ে যাচ্ছে, আমি যাচ্ছি যাচ্ছি—পথের শেষ নেই। বহুক্ষণ পরে আমার মনে হল কোন এক গভীর জায়গায় পৌঁছবার পর, পর পর দেউড়ি পার হচ্ছি। গভীর অন্ধকার। কিছুই নেই, শুধু শূন্যতায় ভরা। অনেক পরে এই গোলাকারের সাক্ষাৎ পাই। তবে প্রথমটায় আমার চোখ ধাঁধিয়ে যায়। তারপর এই ঘটনাগুলি পর পর ঘটে।

আমি কিন্তু কোনরূপ অপ্রকৃতিস্থ হই নি। স্বাভাবিকই ছিলাম। এবার বাস্তব বিচারে দাঁড়িয়ে চিন্তা করে যা বুঝলাম তাতে আমার মনে হল—দীর্ঘ সময় নয়, দীর্ঘ দিনের পথ। যেখানে গোলাকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, সে আমারই পরমাত্মা। ত্যাগ বৈরাগ্য বিচারের উপর তাকে পুনরায় আবার দেখা যাবে। এ একমাত্র উপলব্ধির বস্তু। সর্বদিকে সর্বভাবে এর প্রকাশ শুধু সব সময় দেখা যায়।

এর বেশী আমার আর বিশেষ কিছু বলার নেই। তোমরা পণ্ডিতগণ, ঠিক ঠিক ভাবে ত্যাগ বৈরাগ্য এবং নিখুঁত বিচারের মূল বুঝতে পারবে, নচেৎ নয়।

প্রসাদ—মা, আগুনের গোলার অবস্থিতি কোথায় ?

মা-মহাজ্ঞান—এর অবস্থিতি বলে কিছু নেই। একে আয়ত্তে বা ধারণায় আনা যায় না। এ সম্পূর্ণ উপলব্ধির বিষয়। আমি এ জিনিসটা আগেই বলে গেছি, সমাধিস্থ অবস্থায় উপলব্ধি করেছি। এবার সেই সমাধি কি, সেইটাই তোমাদের বলি।

সমাধি বলতে আমার ভিতরের শান্ত মন। কিন্তু তাই বলে ভেবো না, কোন রিপু আমার ছিল না। তার বহু জায়গায় আমি পরিচয় দিয়ে গেছি। বাইরে শান্ত বা স্বাভাবিক অবস্থা কোনদিনই আমি পাই না। তার জন্য আমার নিজের কোনদিন কখনো কোন সময় ক্ষতি করে

না। শুধু সকলকে বোঝাবার সময়, তারা যাতে বুঝতে পারে এইজন্য শান্ত পরিবেশ আশা করেছিলাম। কিন্তু তাও অনেক জায়গায় অনেকবারই আমি পাই নি। কোন কিছুতেই আমার আসল কাজের ক্ষতি করতে পারে না। অল্প কথায় বৃহৎ জিনিস বুঝিয়ে দিয়েছি। পরে কোন সময় শান্ত পরিস্থিতি এলে, সেইগুলিকে ধরে ধরে তাদিকে আবার বুঝিয়েছি।

সমাধি বলতে (সমাধিস্থ হবার জন্য) ধ্যান, ধারণা, নিরালায় কোন আবভাব বা 'আসভাব' (বাঘছালের আসন, কোসাকুসী ইত্যাদি) নিয়ে বসার প্রয়োজন হয় নি। যখন তখন যে কোন অবস্থাতে আমি এই সব নানা জিনিস উপলব্ধি করেছি। এমন কি মহাপরীক্ষার প্রহরেও বহু জিনিস উপলব্ধি করেছি। (বলা বাহুল্য গুরুদেবের নিগূঢ় যুক্ত জীবন আজও পূর্ণ বহাল।)

তাহলে এই গোলাকারের সন্ধান কোথায় পাওয়া যাবে, কি তোমাদের বলে যাব! নিশ্চয় এইগুলি ভাল ভাবে পড়ে বিচার করবে, ঠাণ্ডা নিশ্চল মনে বুঝতে পারবে। তবে তবুও একটুখানি বলে রেখে যাই, তোমাদের থেকে সূর্য যত দূরে, সূর্য থেকে ঠিক আরো তত দূরে, তার স্থিতি বলে মনে হয়। অবস্থিতি আছে ঠিকই, এর কোন ভুল নেই, কিন্তু দূরত্বের হিসাব তোমাদিগে কি ভাবে দিয়ে যাব! তাই সূর্য থেকে তোমরা কতদূরে আছ, এটা আমি তোমাদের কাছে শুনে বা বুঝে এই অনুমানটুকু দিয়ে গেলাম।

তবে এর একটা কথা জেনে রাখবে সবাই, একে আয়ত্ত করতে কোনদিনই কেউ পারবে না। মহাত্যাগী পুরুষ যদি হও কেউ, তাহলে ভিতরের শান্ত অবস্থায় সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হয়ে তাকে উপলব্ধি করতে পারবে বা ক্ষণিকের জন্য দেখতে পাবে। সেইদিনই মনে হবে, আমি কোন মিথ্যা বলে যাই নাই। তবে হ্যাঁ, আমার সর্বত্র যে বিচার যে নজির রেখে গেলাম, তাতে কারো 'না' বলার অবকাশ থাকবে না। যে যেমন ভাবে সাধনা করবে সে তেমন ভাবে বুঝতে পারবে।

প্রসাদ—গোলাকার অগ্নিপিণ্ডের অবস্থান সম্পর্কে মা, তুমি বলছ—"তোমাদের থেকে সূর্য যত দূরে, সূর্য থেকে ঠিক আরো তত দূরে তার স্থিতি বলে মনে হয়।"—এ কথার তাৎপর্য কি?

মা-মহাজ্ঞান—এই দেখেছো? তোমাদের থেকে সূর্য যত দূরে ঠিক সূর্য থেকে তার দূরত্ব তত দূরে বলে মনে হয়। ঠিক কথা বলছে না। সেটা আমি পেলাম কোথায়, তোমাদের থেকে সূর্য কত দূরে? তোমাদের মুখ থেকেই শোনা। আমি লেখাপড়া জানি না। তোমাদের মুখ থেকেই শোনা, এবং অনুমান করে গেলাম। এঁ্যা? তার স্থিতি বলে কোথাও আমি বুঝিনি জানিনি। আমার মধ্যেই অনুভব করেছি আমি।•

প্রসাদ—যেটা মা অনুভব করেছ, এবং যেটাকে শক্তি বলে আখ্যা দিয়েছ—সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, তার অবস্থিতি সম্পর্কে এইরকম একটা অনুমান দেওয়ার কি প্রয়োজন ছিল? যা আমাদের লৌকিক বিচারে বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে একটু অবান্তর বলে মনে হয়। আমাদের থেকে সূর্য নয় কোটি কত লক্ষ মাইল দূরে যেন? এটা তুমি না হয় শুনলে। এবং বললে—তার থেকে গোলাকার অগ্নিপিণ্ড আরো অতখানি দূরে। অথচ তোমার আর পাঁচটা বিচার থেকে যা অনুমান করতে পারি, শক্তি সে সবখানেই আছে। 'ভেপার' থেকে জন্ম, যে 'ভেপার'টা কোন একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে আসছে, এমন কিছু নয়।

মা-মহাজ্ঞান—ঠিক কথা বলে যাচ্ছ। এই ঠিকের উপরেও যদি 'ঠিক' একটা দিয়ে রেখেছি—যদি, অনুমান।

প্রসাদ—কিন্তু কেন দিলে?

মা-মহাজ্ঞান—এবার বল তোমাদের থেকে সূর্য যতদূরে, সূর্য থেকে ঠিক তত দূরে—এই যে কথাগুলো বললাম, তারপরেই যে ত্যাগ বৈরাগ্যটা দেখালাম, শান্ত মনটা দেখালাম, তোমার মধ্যেই তাকে দেখতে পাচ্ছ। তাহলে সে কত নিকটস্থ হয়ে যাচ্ছে দেখ। তাকে দেখেছি। তাকে আমি দেখেছি। তাকে জানি তাকে বুঝেছি। স্থিত আমার কাছেই, আমি দেখেছি। এই তুমিও তাই হও। তোমার

কাছেও তাই হবে। ও-ও তাই হোক, তার কাছেও তাই হবে। একটা অনুমান সত্য দিয়ে কেটে দিলাম। এ্যাঁ, এবারে আনুসাঙ্গিকগুলো যে বলেছিল'ম সেই আনুসাঙ্গিকের ভিতরে তোমরা বিচার করে নাও। তুমিও তাই হও, তোমার মধ্যে দেখতে পাবে।

প্রসাদ—এটা তাহলে কেন বলছ মা? আমি তোমার জিনিসটা মোটামুটি আঁচ করতে পারছি। অথচ ভাবছি, যেটাকে একান্ত ভাবে হৃদয়ে অনুভব করবার, তার দূরত্ব ওভাবে জানিয়ে দেওয়ার দরকার কি!

মা-মহাজ্ঞান—দূরত্বটাই হচ্ছে সাধনা। তোমা থেকে সূর্য যত দূরে তার থেকে ঠিক তত দূরে। এবার যে এই সাধনার পথে নামবে সেই বুঝতে পারবে যে দুটি রাজ্য কি ধারার। এ্যাঁ, একটি চোখের চুলের পাতাকে টেনে একশো ভাগ করা কি যায়? একটা অনুমান। বলে দিয়ে গেলাম। তাহলে এইটা ধরে অনুভব করতে পারবে যে, ভিতরে সেই সরীসৃপরা কিভাবে ছুঁয়ে যায়। সেইখানে সাধনা ভেস্তে গেল। বুঝেছ? এই অনুমানটা। যেমন এটাকে (চোখের একটি পাতা) কাটলে একশো ভাগ করলে জানা যায় না বোঝা যায় না, তেমনি করে ভিতরে কখন নড়ে গেল, সে জানতেই পারল না, সেইরূপ সাধনা হলে ঠিক বোঝা যাবে।

প্রসাদ—যেমন এক লক্ষ নটি ধাপ। এই যে সংখ্যাগুলো। সাতশো সাতাত্তর হাত তলায় সত্য বলেছ।

মা-মহাজ্ঞান—এই 'সাতশো সাতাত্তর হাত তলায়' কথাটার কি মানে আছে। এ তো বাস্তবের বিচার।

প্রসাদ—এই তলা খুঁড়ে যেতে কি অবস্থা হবে মানুষের। কি প্রচণ্ড পরিশ্রম দরকার। এই যে দৈহিক পরিশ্রমটা। এবার দৈহিক বাদ দিয়ে মানসিক করে দেওয়া যাক। এ তো—মা, আগেই এক সময় বলে দিয়েছো।

মা-মহাজ্ঞান 'সাতশো সাতাত্তর হাত' তলা তোমার মধ্যেই। নরুন দিয়ে কুয়া খোলা। এ বাস্তবের কোন বিচার আছে নাকি?

নরুন দিয়ে কুয়া খোলা। এঁ্যা, দেখ সাবল গাঁইতি কোদাল—এই সব 'দিয়েই কুয়া খোলা হয়। এবার বুঝ তোমার মধ্যে যে লোভ স্পৃহাটি রয়েছে, তাকে তুমি উপড়ে ফেল তো কোদাল, গাঁইতি দিয়ে। দেখ নরুন দিয়ে কুয়া খোলা। ধীরে ধীরে সেই লোভকে কেমন সম্বরণ করছ। শুধু সম্বরণ নয়, শেষ পর্যন্ত তুমি তাকে ধূলিসাৎ করে দিলে। তার আর যেন না ওঠার ক্ষমতা থাকে। কি করে করলে? এই ভিতরের জিনিসগুলিকে বাইরের কিছু জিনিস দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যে।

না হলে কতদূরে তার অবস্থিতি স্থিতি ওসব কিছু নয়। একটা অনুমান। ঐ যেমন করে সাতশো সাতাত্তর হাত, যেমন করে এক লক্ষ নটি ধাপ, যেমন করে একটি চোখের চুলের পাতা ছিঁড়লে একশো ভাগের এক ভাগ, এঁ্যা, যেমন করে সতী আখ্যা দেওয়া হয়েছে—গোল করে সিঁদুর টিপটি পরাও জানবে সতীর একাংশ ধ্বংস। এমনি করেই এগুলো হয়।

সুন্দর দেখাবে, এ মনোবৃত্তি তোমার কেন, খুঁজ। এবারে সেই নরুন। সেই কুয়া খোলা হচ্ছে। গাঁইতি দিয়ে কেটে দাও দেখিনি কোদাল দিয়ে কেটে দাও দেখিনি। খুব ভাল করে নিরীক্ষণ করে অন্তরের অন্তঃস্থলকে খুঁজে দেখো। সেই সুন্দর বোধ তোমার কোথা থেকে আসছে? আমায় সুন্দর দেখাবে। দেখাবে! দেখে কি করবে? বল, পর প্রশ্ন উত্তর নিয়ে যাও—দেখে কি করবে?

প্রসাদ—পরমাত্মা বা আদি বা ব্রহ্মার সঙ্গে ব্যক্তি আত্মার সম্পর্ক কি?

মা-মহাজ্ঞান—ওভাবে প্রশ্ন করলে চলবে না। আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্পর্ক এবং পরমাত্মার সঙ্গে আদি বা ব্রহ্মার সম্পর্ক, এইটা বুঝতে হবে।

আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্পর্ক আছে বৈকি। আত্মা বলতে মূলতঃ, আগেই বলেছি, স্পৃহা। এবার সেই আত্মার কাছেই পরমাত্মা রয়েছে।

যেমন মনে কর একটি পোড়ো মন্দির। এক কালে সেখানে যেন বেশ কিছু লোকের আসা-যাওয়া ছিল। তবে কি রকম, কবে, ইত্যাদি কোন খবরই কেউ বলতে পারে না। আবার একেবারেই যে বলতে পারে না, তাও কি করে বলব! এই 'বলতে পারা' দেখে বিশ্বাস হয়, এই 'যাওয়া আসা' বা 'মন্দির'।

পরমাত্মাকে মন্দির চিন্তা করলে এই মন্দিরে আত্মাকে পৌঁছানো যায়। তাহলে মন্দির হল পরমাত্মা এবং মন্দির প্রাঙ্গণ হল আত্মা।

তখনই—যখন প্রাঙ্গণের জিনিস মন্দিরে এসে ঢুকে যায়, তখনই মন্দিরের যা কিছু প্রকাশ ব্যাখ্যা বা প্রচার দেখা যায়। তখনই বলা হয় তাকে জ্ঞানী। যখন আত্মা বলে আর কিছু থাকে না—খুব খুঁজে মনে করতে হয় 'ছিল'। (যেমন আগে মনে হয়েছিল 'পোড়ো 'মন্দির' "লোক যাওয়া আসা করে", তেমনি করেই মনে করতে হবে আত্মার কি-কি চাহিদা ছিল, এখন সে কি চাইছে। এখন যাব ঘরে দাঁড়িয়ে য চাইছে, সেইটিই—তার নাম হবে 'পরমাত্মা'। ঐ আত্মা কথাটা এখন খুব দূরে সরে গেল।) তখন আর একটা জিনিস এসে পৌঁছবার উপক্রম হবে। সে হল ব্রহ্ম।

প্রসাদ—"যখন আত্মা বলে আর কিছু থাকে না—খুব খুঁজে মনে করতে...সে হল ব্রহ্ম।"—শেষাংশ উদ্ধৃত করে মাকে প্রশ্ন করি—এই সম্পর্কে একটু বলবেন মা?

মা-মহাজ্ঞান—আমি তো কিছু বুঝতেই পারছি না। (বলা বাহুল্য আমাদের ধারা বা ধরন।)

এ সব জটিল তত্ত্ব বুঝাতে একমাত্র যিনি, তিনি যখন বলেন—'বুঝতেই পারছি না,' আমরা কেমন থতমত খেয়ে যাই। কোথায় প্রশ্ন করা চলে এবং কোন্ প্রশ্নের কি গুরুত্ব বা গভীরতা সব সময় না বুঝে করলেও, বরাবরই মা-মহাজ্ঞান মানিয়ে নিয়ে উত্তর দিয়ে থাকেন।

মা-মহাজ্ঞান—"আমার যে কোন জিনিস খুব চিন্তার মধ্যে নিয়ে

এসে তোমরা ফেলবে। বিশেষ চিন্তাশীল হবে, ভাবুক নয়। খুব বিচারের দ্বারায় জ্ঞানের দ্বারায় চিন্তার দ্বারায় কর্মের আমার জিনিস নিয়ে খেলবে। তাছাড়া নয়। ভয়ঙ্করী জিনিস এ সব। এ সব নিয়ে খেলতে যাওয়া মানেই মরা ছাড়া আর কোন পথ নেই।" ভাবধারা নিয়ে চলতে যেও না।

আর এক একেবারে কিছু জানি না—গতর খাটাই খাই, আর মা মা করে ডাকতে জানি। বাস এ হয়ে গেল। মাঝখানে পাকামো করতে যেও না। লগি চালাতে পারবে না লগিতে হাত দেবে কেন তাহলে? লগিতে হাত দিলে শেষ পর্যন্ত চালাও।

প্রসাদ—"একটি জিনিস এসে পৌঁছবার উপক্রম হবে।" এই উপক্রমের পর—সে মাঝে কি করল, আর তার পরিণতি কি—এত কথা বাস্তবে কেউ সাধনায় জানতে পারে? (গুরুদেবের সাবধান বাণী বিলক্ষণ শিষ্যকে স্তব্ধ করে দেয় নি।)

মা-মহাজ্ঞান—ঐ একটি কথার দ্বারাতেই সব এসে যাবে। একটি কথারই ঐ একটি দু'টি উত্তর হবে। এর বেশী থাকবে না। এতে অনেক উত্তর নেই যে। আমি শেষ সীমা পর্যন্ত বলে দিয়েছি। আর বলবার মতন কিছু নেই ওখানে। ওখানে অনেক কথা রেখে যাই নি। অনেক রেখে গেলে তো চিন্তা করে হারিয়ে ফেলবে। আলোচনা করতেই পারবে না। সেইজন্য এমন একটি দু'টি কথা রেখে গেলাম, যার ফলে সে নিজে নাভিমণ্ডল থেকেই সেটা তুলতে পারবে। এ তো আর বলে দেওয়ার জিনিস নয়। বলে দিয়ে গেলে তো হয়েই গেল। আর বল কোথায়! 'আর' তো নেই। এক চুল আর ফাঁক নেই। যতদূর ছিল ততদূর আমি বলে দিয়েছি। এবার পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে বিচার করবে।

একটি মানুষ। তার আত্মা আর পরমাত্মা বলে দুটো জিনিস আছে। কিন্তু পরমাত্মা যে আছে, এ কথাটা কেউই বুঝতে পারে না। আত্মাটাই সকলে বুঝতে পারে। এবং অনুমান করে নেয়—

যখন আত্মা আছে তখন পরমাত্মাও আছে। আবার কোথাও কেমন সে 'অনুমান করা' বা আছে বলা'টা প্রমাণও পেয়ে যায় তারা।

কি রকম প্রমাণ পায়? না, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়—আত্মা পরমাত্মা, কৈ আমার মধ্যে তো কিছু পরমাত্মা খুঁজে পাচ্ছি না। কিন্তু আর একজনের মধ্যে বুঝছি—এর আত্মা কোথায়, এর তো পরমাত্মাই দেখা যাচ্ছে! এবার বলি ভেঙে।

যার নাম আত্মা—আত্মা বলতেই স্পৃহা। আর পরমাত্মা বলতেও সেই স্পৃহাই। দুটিই মূলতঃ স্পৃহা। এই দু'জনের স্পৃহা দুদিকে প্রবাহিত হচ্ছে। যখন পরমাত্মার ঘরে স্পৃহা প্রবাহিত হচ্ছে তখন জ্ঞান বলছে। আর যখন আত্মার ঘরে স্পৃহা প্রবাহিত হচ্ছে তখন অজ্ঞান বলছে। এবং জ্ঞানও মিশানো রয়েছে—জ্ঞান অজ্ঞান মিশিয়ে বলছে। এই তো? তাহলে পরে আমাদের এই আত্মাকে আমরা সব সময় বুঝতে পারি। সব সময় স্পৃহা নিয়ে আমরা খেলছি। পরমাত্মা কোথাও কেমন আছে, এটা আমরা অনিশ্চিত।

অনিশ্চিতটা কি করেই বা বলব! অনেক সময় আমরা নিশ্চিত হয়ে যাচ্ছি। কাউকে কখনো দেখলে পরে মনে হচ্ছে—আচ্ছা আমার মধ্যে যা যা দেখছি কৈ এর মধ্যে তো তা নেই। আমার মধ্যে কেন, সর্বত্র এই হাজারখানেক লোক আমরা দাঁড়িয়ে আছি, সকলকে আমরা একই রকম দেখছি। তার মধ্যে একজনকে দেখছি সে ভিন্ন। বিপরীতগুলো তার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। তাহলে তো এখানে বুঝতে হবে, আর একটা কিছু আছে। ঐখানেই আমরা পরমাত্মাকে খুঁজে পাচ্ছি। উঁঃ?

মূলতঃ যখন আমরা বিচার করলাম তখন স্পৃহাকেও পেয়ে যাচ্ছি তার মধ্যে। একজনের স্পৃহা হচ্ছে, খাব খাব খাব। আর একজনের স্পৃহা—খাওয়াব খাওয়াব খাওয়াব। উভয়ই মূলতঃ স্পৃহা। যখন 'খাওয়াব খাওয়াব খাওয়াব' তখন হচ্ছে জ্ঞান জ্ঞান জ্ঞান। আর যখন খাব খাব খাব তখন অজ্ঞান অজ্ঞান অজ্ঞান। তার সঙ্গে আছে জ্ঞান। জ্ঞান তখন ধীর স্থির হাল্কা! মানে, যাকে বলে জীর্ণ রোগী। উঁ, শীর্ণ

জীর্ণ রোগী একটি দেখলে যা হয়—সেই শীর্ণ জীর্ণ রোগীকে দেখলে মনে হয় তখন। কেন, তার খাব 'না'-টা কেন? হয়ত তার কোন সেখানে একটা বিচার এসেছে। সেই বিচারটা হচ্ছে অতি হাল্কা বিচার। খেলে তার পেট ফাঁপবে, কি খেলে কেউ দেখতে পাবে, এ্যাঁ? কি তার এখন খাওয়ার সময় নয়। এইজন্য বলছে এই জ্ঞানে। আর একজন বলছে—না, খাব না, খাওয়াব। খাওয়াব। কিন্তু কোথাও কখনো তার মনে হয়ে যাচ্ছে—আমি কি খেতাম, আমি কি খেয়েছি? হ্যাঁ খেয়েছি—মনে পড়ে যাচ্ছে। তাহলে মূলতঃই দুটো স্পৃহাকে পাওয়া যাচ্ছে।

সেইজন্য এটাকে বলা হচ্ছে—পোড়ো মন্দির একটি। মন্দির নাম দেওয়া হচ্ছে। মন্দির দেখেই মনে হচ্ছে—ঠাকুর ছিল, যেন ঠাকুর আর নেই, সরে গেছে সেখান থেকে। লোকজনও নেই সেখানে যে মেরামত করবে।

আচ্ছা যদি মন্দিরই নয় তাহলে 'উ' সেইখানে কি করে 'এ' করল। মূলতঃ ও যা আমিও তো তাই। ওর কাছ থেকে সেই দেবত্ব ভাব বেরুচ্ছে কি করে! আমিও যা ও-ও তো তাই দেখছি। অথচ ওর দেবভাব? তাহলে সবার মধ্যেই সেই মন্দির রয়েছে।

আচ্ছা এই ভাবেই আত্মা পরমাত্মার খেলা চলছে। পরমাত্মা সব সময় আড়াল হয়ে রয়েছে—পোড়ো মন্দির পড়ে আছে। তাকে যে জাগায় তখনই জাগে। যখন তাকে কেউ জাগাতে পারে।

পরমাত্মা হচ্ছে ঘর, আত্মা হচ্ছে দুয়ার। এই দুয়ারের খেল্ চলছে সবার, এ্যাঁ? যাহা ঠিক বলিয়া করিতেছ তাহা সমস্তই ভুল, আর যাহা ভুল বলিয়া জানিয়াছ তাহা সমস্তই ঠিক। কেন, ঝাপটা আসবেই, ঘরে ঢুকতেই হবে। কিন্তু ঘরের দরজায় তখন চাবি পড়ে গেছে, আর ঢুকতে পারলে না। সেই দুয়ারেই ঝাট খেয়ে পড়ে মরে যেতে হল। এ্যাঁ? কিন্তু মূলতঃই যদি ঘরে দাঁড়িয়ে থাক তাহলে দুয়ারে যাওয়ার প্রশ্ন কোনদিনই আসবে না। তোমার খুশী স্বরূপ দুয়ারে গিয়ে দেখবে, বৃষ্টি বাদল আসছে কি না, শীল বজ্রাঘাত পড়েছে কি না। তোমার

ইচ্ছাতে—তোমার হিম্মতে বেরিয়ে গিয়ে হিম্মতে ঘরে ঢুকে এসেছ। কিন্তু তুমি মূলতঃই দুয়ারের অতিথি, উঁ?

তাহলে এইভাবেই এদের খেলা চলছে। যখন মনে কর আত্মার স্পৃহা খুব বেশী বেড়ে যায়—এই যে মাঝখানে একখানা কপাট রয়েছে—দরজা, যার জন্য পোড়ো নামটা হয়ে গেছে। পড়ে আছে। কেউ তো তাকে খুঁজে না, যায় না। সেইখানে একটা ঐ দরজার যে চৌকাঠ থাকে, সেই চৌকাঠের তলাতে একটা ফাঁক থাকে—চৌকাঠটা না দিলে? কপাট বসিয়েছ চৌকাঠ দাও নি, একটা ফাঁক পড়ে তো? এই ফাঁক দিয়ে কিছু যাওয়া আসা করে। কেন? না, মাঝে মাঝে ঐ মন্দিরের মধ্যে যে কিছু আছে কিছু থাকে সেইটা যেন মনে হয় একটা 'ভেপার' বেরোতে থাকে। সেটা অতি অল্পই। গুমোট ভেপার।

কিন্তু বাইরের যখন ঘরে ঢুকে, তখন বেশ কিছু ঝাপটা এসে ঢুকে যেতে থাকে। কিন্তু ঢুকলেও—মনে কর চৌকাঠ থেকে তোমার ঘরের শেষ সীমান্ত অনেকখানি দূরে, পাঁচ হাত কি দশ হাত। এইখান থেকে ঘরটা মাপ, মাপলেই তোমার দশ হাত পড়ে যাবে। তাহলে দশ হাত দূরে—শেষে যেয়ে ঠেকতে পারে না। আটকান পড়ে যাচ্ছে। মন্দিরের কিছু আগে এসে গেল।

আসতে আসতে আসতে আসতে ঐখানে একটা পলি পড়ে গেল। তখন বলতে হবে যে পরমাত্মার ঘর পুরোটাই পড়ে গেল, আর সে কোনদিনই জানতে পারল না। ঐখানেই যা কিছু খেলা হয়ে গেল। এখানে আর সে আছে বা নেই—এ জানাতেই সে পারল না। শেষ হয়ে গেল। আর জানাতেই পারল না, সে চলে গেল।

কিন্তু যখন মনে কর—এ ঢুকছে সে বেরোচ্ছে—এই ঢুকা বোরোনো—এর মধ্যিখানে হঠাৎ দেখা যাচ্ছে, এখানের বেগ একটু বেশী করে বেরোচ্ছে। ওখানের বেগ একটু আস্তে আসছে। ওখানের বেগটা ধীর হতে হবে, আর এখানের বেগটা একটু প্রবল হতে হবে। ঘরের ভিতরের বেগটা প্রবল হতে হবে, আর দুয়ারের বেগটা কিছু ধীর হতে হবে।

এই সময় দেখা গেল ক্রমশঃই এখানটায় ফাঁকা পড়ে যাচ্ছে। করতে করতে করতে করতে বেশ আলো পড়ছে। এই আলো যাওয়া আসা করছে তখন। এই আলো যাওয়া আসা করতে করতে দেখা গেল হঠাৎ, যে দরজার কাছে মরচে ময়লা যে সব ছিল, সব ঠেলে খুলে যাচ্ছে দরজাটা। এ্যাঁ? এই খুলে গিয়ে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে বাইরের জিনিস ভিতরে আসছে। এখন বাইরের জিনিস ভিতরে আসছে বলতে গেলেই—দরজা মনে কর তোমার ঘর থেকে অনেক দূরে, তারপরে দুয়ার, দুয়ারের পরে যে তোমার শোওয়ার ঘর, তার মাঝখানে যে দরজাটা, উঁ, সেই দরজা।

তোমাদেরই মনে কর না—তোমাদের বাইরের গেটকে চিন্তা কর, তারপর 'কল্যাপসিবল' গেটকে চিন্তা কর তারপর এই কপাটকে। তারপর ঘরের শেষ ভাগকে এইটা দেউড়ি চলছে। আচ্ছা তাহলে এই রকম খুলতে খুলতে যখন এটা খুলে গেছে তখন এই সমুখের কতক-গুলো জিনিস এসে ঢুকে গেল। পথ হল। তারপর আস্তে আস্তে করে মন্দিরে ইঁট সাজাবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

জ্ঞান—বা রে, একটা এরকম ভেঙে পড়ে আছে কেন? এটাকে ঠিক করি। আসছে। আচ্ছা ঐখানের জিনিস আটকে যাচ্ছে, এইখানে বেগ না পেলে ওখানে আটকে যাচ্ছে জিনিস। একটা নালীতে জল ঢাললে তার যদি না অনবরত যদি বেগ দাও তাহলে এতটুকু ফাঁক দিয়ে সে বেরোবে কি করে? উঁ, যেমন জল তার তেমন ফাঁক হতে হবে, তবে যে বেগে বেরোবে। ছিদ্র বা।

আচ্ছা তখন কি করা হবে, এইখানটা পার হয়ে এল। পার হয়ে আসতেই এখানে তখন ইঁট সাজাবার কথা মনে পড়ছে। ওখানের জিনিস আরো যেগুলো ঘরে ঢুকতে চাইছিল, আগিয়ে আসবে—এটা ঢুকে গেলে ওটা আগিয়ে আসবে তো, ওটা আগিয়ে আসছে। ওটা এগিয়ে যখন এসে এখানে ঢুকতে যাচ্ছে তখন এখানে যে ইঁট সাজাচ্ছে সেই বাধা দিচ্ছে—এই দাঁড়া, এটা সাজানো হোক তারপর ওটা আসবে। এটা সাজানো হোক ওটা আসবে—ওটা যে

কি আসবে, সে আর তখন তা চিন্তা করছে না। তখন সে চিন্তা করছে—যে ইঁটটা সাজিয়েছে তাতে বালি সিমেন্ট লাগবে। সে তখন তার বালি সিমেন্ট ঢুকে গেছে মাথায়। মন্দিরটা তৈরি করতে হবে। সেইটাই তার মাথায় ঘুরছে। আবর্জনা সরাতে হবে, ভাল জিনিস নিতে হবে। এই করতে করতে ঐখানে গেটে গিয়ে চাবি পড়ে গেল। হয়ে গেল ? তখন এই ঘর দুয়ার একাকার হয়ে গেল। উঁ ?

কিন্তু একাকারটা সবার মধ্যে দেখা যায় না, কিছুটা জ্ঞানী বলা যায়। যদি মনে কর গোটা দুয়ারটাই সে ঘেরে নিতে পারে, তাহলে তাকে জ্ঞানী বলবে, মহাপুরুষ বলবে। কিন্তু যখন জানবে দরজায় কপাট বলে আর কিছু নেই তখন জানবে যে সে মহাজ্ঞানী—তার উপরে আর কোন জ্ঞান নেই। সে তো একাকার করে ফেলল সবটাই। সবই তার মন্দির হয়ে গেল। তখন আর দুয়ার বলে কিছু নেই।

তা সেটা আর দেখা যায় না। ঐ মহাপুরুষ পর্যন্ত এসে আটকে যায়। ঐ আধখানা দুয়ার ঘেরে নেয়। বুঝছ ? তারাই হচ্ছে জ্ঞানী। আর ফাঁক দিয়ে যখন যাতায়াত করছে তখন বলবে নারে লোকটা বুঝনদার। লোকটা খায় বুঝে বুঝে করে এ্যাঁ ? লোকটার মধ্যে জ্ঞান আছে।

তাহলে বুঝলে সমঝদার, জ্ঞানী আর মহাজ্ঞানী ?

প্রসাদ—ব্রহ্ম যদি অনন্ত-শক্তি স্বরূপ হয় তাহলে আত্মার শক্তি এমন পরিমিত কেন ?

মা-মহাজ্ঞান—আত্মার শক্তি রকমারী দেখা যাচ্ছে—কোথাও খুব অল্প, কোথাও পরিমিত, কোথাও পরিমিতের অনেক উঁচুতে। এই ভাবে তো ? আচ্ছা সে এবারে খোল অনুযায়ী ব্যবস্থা করা হচ্ছে। শক্তিতে খোল অনুযায়ী দেওয়া হচ্ছে। যে যেমন খোল তার তেমন শক্তি। কাঠামোটাকে যে ভাবে গড়া হচ্ছে তার শক্তিটা তো সেইভাবে দিতে হবে। একটা জিনিসের কোন তেজ তো বেশী দিয়ে দিতে পারে না। তাহলে ছাই করে দেবে তো পুড়িয়ে।

যেমন লোভ কাম ক্রোধ আশা আকাঙ্ক্ষা পরিমিত ভাবে দিয়েছে, সেই পরিমিত তার তেজটাও দিয়েছে। সামঞ্জস্য চাই তো, উঁ? এক-পোয়া চাল পাঁচ সের জলের মধ্যে দিলে কি হবে? গুলে বেড়াবে তো, এঁ্যা? আবার পাঁচ সের চালে এক পোয়া জল দিলে কি হবে, ছিটানো হয়ে গেল। সেইজন্য সমান চাল ডাল চাই।

বাড়তে বাড়তে বাড়তে বাড়তে কারো মনে কর চার-আনায় রয়ে গেল, এঁ্যা? কারো ছ'আনায় দাঁড়িয়ে গেল, কারো দশ-আনায়, কারো ষোল আনায় ঠেকল। ষোল আনার উপরে আর যেতে পারে না সে। এই রকম ভাব একটা রেখে দিল যে, বাড়তে বাড়তে এই এতটা বাড়তে পারে, এর বেশী আর নয়। এর বেশী বাড়বে কি, তার আগেই এই খোলটা শেষ হয়ে যাবে।

প্রসাদ—তুমি আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়েছ বলেই, তুমি মূলতঃই জ্ঞান। কিন্তু হলে কি, তোমারও অনন্ত জ্ঞান ব্যক্ত করার অবকাশ নেই।

মা-মহাজ্ঞান—খোল যে। খোল যে। মূলতঃ একটা খোলের মধ্যে আসতে হয়েছে যে। খোলের আকার যেমন সেই আকারে সেই অনুযায়ী জিনিস রাখতে হবে তো। তার বেশী থাকবে কি করে!

একটা সুটকেসে পাঁচখানা কাপড় ধরে, তা পঁচিশখানা ধরবে কি করে! একটা আলমারীর মধ্যে একশোখানা কাপড় থাকে পাঁচখানা সেখানে কিছুই নয়। উঁ, কিন্তু এবারে চেঁচালে কাপড় ঢুকবে কি করে? খোলটা বুঝেই তো জিনিস আসবে। তফাৎ থাকবেই আমিও যে খোল ধারণ করেছি। কাজেই খোল অনুযায়ী বিচার করতে হবে তো। উঁ?

কত মণ সে বইতে পারবে? পাঁচ সেরও সে বইতে পারে আর পাঁচ মণও সে বইতে পারে। ঐ পাঁচ সের থেকে পাঁচ মণ পর্যন্ত রাখা হয়েছে আয়ত্তটা। এমনই খাপটা তৈরি করা হয়েছে যে পাঁচ সের থেকে পাঁচ মণ রাখা যাবে। আমি সেই পাঁচ মণেই দাঁড়িয়ে আছি।

এবার পাঁচ সের থেকে পাঁচ মণ—দশ মণ চাপালে দাঁড়াবে কি করে। সেখানে তো দশ মণ দেওয়া যায় না। (আত্মা পরমাত্মা হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু পরমাত্মা ও ব্রহ্ম ভিন্ন।) সে রকম অবস্থাই নয়। পাঁচ মণ পর্যন্ত ঠিক। যেটা শেষ, সেই শেষেই আমি দাঁড়িয়ে আছি।

(পাঁচ সের নিয়ে সকলে জন্মায়। এবার যেমন ভাবে জীবন যাপন করে তেমন ভাবে বাড়ে বা কমে। শূন্য কারো হয় না। এমন কি আড়াই পোয়ার নীচে কারো নামে না। যত বড় খুনী হোক একটু মমতা থাকবে। পাঁচ মণ মায়ের জীবন—এ শুধু মন্দির জাগানো নয়, সোনার মন্দির হীরার ঘণ্টা, একমণ-কে উঠতেই হিমশিম খেয়ে যায়।)

উঃ, যা যা জানার ঐ পাঁচ সের থেকে পাঁচ মণ—যা কিছু জানবার দরকার—উপলব্ধি করবার দরকার, বলার দরকার, শোনার দরকার এ্যাঁ, পাঁচ সের থেকে পাঁচ মণ পর্যন্ত দেওয়া আছে। সেই পাঁচ সের থেকে পাঁচ মণে আমি চলে এসেছি। 'চলে এসেছি' মানে? দীর্ঘকাল সেই পাঁচ মণেই কাজ করে যাচ্ছি। এর উপরে আর নেই। এর উপরে নেই তো কোথা থেকে আসবে সে আর! পাঁচ মণের বাইরে তো আর আসতে পারে না। বুঝতে পারছ? সেই পাঁচ মণটাই যে দিয়ে যাচ্ছি সেই পাঁচ মণটি এবারে কি পাঁচ মণ দেখতে হবে, উ?

শুধুই বীজ ভরা ধান। একটাও তাতে আগড়া নেই। যখন সেই পাঁচ মণ ধানটা পাছড়াবে কেউ তখন তার আগড়া বলে কিছু পাবে না। ভুয়া বলে কিছু পাবে না। যেমন পাঁচ সের থেকে যদি আধ মণে কেউ আসে এক মণে কেউ আসে হয়ত তার পাছড়াতে গেলে পাঁচ সের ভুয়া বেরিয়ে যাবে, দশ সের ভুয়া বেরিয়ে যাবে। আর এর পাঁচ মণটাই নিরেট পাঁচ মণ।

হাত ভর্তি—বীজ ভর্তি জিনিস, এ্যাঁ? তার উপরে খোলাটা রয়েছে বটে কিন্তু ছাড়ালেই তার ভিতরে জিনিস আছে। কোন খোলাটাই শুধু নেই। বীজ ভরা সব। খোলাটা যখনই পড়ে যাবে তখনই দেখতে পাবে যে বীজ ভর্তি তাতে। নিরেট ওজনটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। বুঝতে পারছ?

প্রসাদ—তাহলে এমন একটা অবস্থা এলে পরে বলতে পারি যে তিনি সর্বজ্ঞ ?

মা-মহাজ্ঞান—'সর্বজ্ঞ' কথাটা আমি আবার বিশ্বাস করতে পারি না। সর্বজ্ঞ বলতে কি বুঝায় ? সর্বজ্ঞ তোমরা কাকে বলছ ?

সর্বজ্ঞ এক দিক দিয়ে ঠিকই, কিন্তু এই সর্বজ্ঞের অনেক বিচার আসবে। সেইজন্যে এই বিচারটাকে তুলে না রেখে ব্যক্ত করে দেওয়াই ভাল নয় কি ? সর্বজ্ঞ বলতে তুমি যা বলছ—তোমার অন্তঃস্তল যা বলছে তাতে এক—ঠিক কথাই ; সর্বজ্ঞ বলতে,—সব সে জানে, সবের ধারণা সে দিতে পারবে।

কিন্তু মনে কর কোন পণ্ডিত তার কাটবার ইচ্ছা হল, এঁ্যা ? তার জ্ঞানে বা শিক্ষায় ধাক্কা খেল, ধাক্কা খেয়ে সে এটা কেটে দিতে চাইবে। কেটে দিতে গেলেই সে বলবে—প্রথম তো কেটে সে দেবে—তারপরে সে-ও নিজে মরবে কাটা হয়ে। আচ্ছা প্রথম কাটতে এসে বলবে—সর্বজ্ঞ কাকে বলছ তুমি, সর্বজ্ঞ বলতে ? তোমার মা এই জানত, সেই জানত, ঐ জানত, এই রকম করে তোমাকে কাটতে থাকবে। তখন তুমি হাঁ করে ক্যাবলার মত দাঁড়িয়ে থাকবে। তা ও লাইনে আমি যাব কেন ? আমি এমন লাইনে যাব যে লাইনে আর কোন বাধা দাঁড়াবে না। ইট পাটকেল যে পথে নেই। সোজা রাস্তায় আমি বেরিয়ে যাব।

সর্বজ্ঞ বলতে ? আমার মা ঈশ্বরকে জানা নিয়ে—ধর্ম বিষয়ে তিনি সর্বজ্ঞ। ব্যস হয়ে গেল, কেটে দাও সব। আমার মা ঈশ্বর নিয়ে ধর্মকে নিয়ে—সংসার সাধনা সমন্বয় নিয়ে সর্বজ্ঞ তিনি। তার কোথাও ভুল ছিল না। ব্যস হয়ে গেল।

সমস্ত কেটে বিচার করতে দাও, ছুটো লাইনকে বাদ দিয়ে দাও। বলবে, সর্বজ্ঞ বলতে ? তোমার মা বল খেলতে জানতেন ? তোমার মা সমুদ্র পার হতে জানতেন ? সে হারামজাদারা নিয়ে আসবে সেই সময়।

কিন্তু সমুদ্র পার হওয়ার সময় কি কি জ্ঞানগুলো চাই, পরে কি কি

জ্ঞানগুলো চাই সেগুলো আমার মা দিতে পারবে। সেই জ্ঞান থেকেই ও বলছে কথাটা এঁ্যা? কিন্তু তখন প্রসাদকে ধাক্কা খাওয়াবার জন্য ঐ ধারায় বলবে। আর প্রসাদ তখন হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। তা উ লাইনে প্রসাদ যাবে কেন? প্রসাদই কেটে লাইন নিয়ে বলবে।

প্রসাদ—তুমি, আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়েছ বলে মূলতঃ জ্ঞান। কিন্তু হলে কি তোমারও অনন্ত-জ্ঞান ব্যক্ত করার অবকাশ নেই। কদিন পরেই তুমি দেহ রাখবে।

অনন্ত জ্ঞান বলতে কি বুঝায়? যদিও বলি তুমি অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী ব্যাখ্যা করে গেছ, তবু এ কথা তো ঠিক—যারা যুগে যুগে লক্ষ সমস্যার সম্মুখীন হবে তারা কি সমাধান পাবে?

মা-মহাজ্ঞান—অনন্ত শক্তি অনন্ত জ্ঞান যেটা তা ঐ পাঁচ মণের মধ্য দিয়েই রইল। সেই অনন্ত জ্ঞান—অনন্ত শক্তিই আমি দিয়ে যাচ্ছি, অনন্ত জ্ঞানই আমি দিয়ে যাচ্ছি। আবার বিশেষ করে বলি, অনন্ত শক্তির চাইতে অনন্ত জ্ঞান—অনন্ত জ্ঞান আমি দিয়ে যাচ্ছি কিন্তু 'দিয়ে যাচ্ছি' 'দেবো' নয়। খোল এই অনন্ত জ্ঞান নিয়ে এত বছর থাকতে পারে। তারপর খোল পালটাতে হবে। অনন্ত জ্ঞান অনন্ত জ্ঞানই রইল, আবার অনন্ত জ্ঞান কাটতে যাচ্ছ কি করতে তুমি! হ্যাঁ, যুগ যুগের লোক সেই জ্ঞান ধরবে, শিখবে, জানবে। তাহলে অনন্ত নয়। এ তো অবিনশ্বর জ্ঞান রয়ে গেল। এর মৃত্যু কোনদিনই নেই।

যে জ্ঞান গীতাতে ব্যক্ত হয়েছে—যে ব্যক্ত করেছিল গীতার জ্ঞান, সে কোথায়? কিন্তু জ্ঞান তো ঠিক অনন্ত হয়ে রয়েছে। জ্ঞান অনন্ত নয় কেন? সেই খোলটা অনন্ত নয়।

প্রসাদ—তাহলে কি বলা যায় মা যে, এই অনন্ত জ্ঞান ধরে যুগে যুগে মানুষ লক্ষ লক্ষ সমস্যার মোকাবিলা করতে পারবে, সমাধান আনতে পারবে।

মা-মহাজ্ঞান—হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ, নিশ্চয় পারবে, না পারার কি আছে! খোলের বদল হবে।

প্রসাদ—কিন্তু সমস্যা তো লক্ষ ধারায়। প্রত্যেকটি সমাধান এই জ্ঞানেই আছে।

মা-মহাজ্ঞান—ধর্মের যে কিছু সমস্যা, সমস্ত ধাযায় বলে গেলাম আমি। সবই খুঁজলে এর মধ্যে পাওয়া যাবে। কোনটাই বাদ দিয়ে গেলাম না আমি। তোমাদের সঙ্গে যে সব গল্প বলে গেলাম—সে সব গান, সমাধি, উপন্যাস—এ যুগ যুগ ধরে খুঁজে বের করবে, চিরকালই এই এক জ্ঞানই পেয়ে যাবে।

তবে একটা কথা বলে যাই শেষে—ধীর স্থির নিশ্চল—শান্ত মন না হলে কখনোই কেউ পাবে না। যেরকম ভাবে তৈরি হবে সে সেরকম ভাবেই বুঝতে পারবে। কিন্তু জ্ঞান অনন্ত পড়ে রইল। এ অক্ষয় অমর জিনিস রয়ে গেল। এর মৃত্যু নেই।

কিন্তু বুঝতে যদি তুমি না পার—তৈরি হতে যদি না পার, তাহলে কি থাকবে, উঁ? তুমি মরে গেছ বলে কখনো একে মেরে দিও না। তুমিই মরে যাবে, এ মরবে না। যেহেতু আমি মরে গেছি সেই হেতু একেও মেরে দিলাম। আমার যোগ্যতা নেই, নিতে পারলাম না, জিনিসটাই ফালতু, ফেলে দাও। এ কথা কখনো বলো না।

প্রসাদ—যা কিছু সৃষ্টি কি একবারেই হয়ে গেছে? পরে পরে যা এসছে সে শুধু কি সেই সৃষ্টির রকমফের?

মা-মহাজ্ঞান—যা কিছু সৃষ্টি একবারেই হয়ে গেছে, হ্যাঁ, তাই বলতে পার। সেই সৃষ্টির রকমফের চলছে।

প্রসাদ—রকমফের বলতে?

মা-মহাজ্ঞান—এই যে 'ভেপার' দেখা গেল, যেখানে রং রূপ লেখা বেরুচ্ছে, সেখান থেকে স্তূপাকার হচ্ছে, বাড়ছে শুধু। ওখানে দেখা গেল কতকগুলো আকার—সেই জড়ের আকার বেড়ে যাচ্ছে। এমন একটা জায়গায় ধনভাণ্ড খুলে দিল যে তার শেষ নেই। সে একদিকে শেষ হচ্ছে একদিকে পূরণ হচ্ছে—আপনা ইচ্ছায় চলছে।* ঘুরছে

*'আপনা ইচ্ছায় চলছে'—ব্রহ্মকে সব সময়েই দরকার হচ্ছে। সে

ফিরছে—এর আর নূতন করে কি করবে—বারে বারে কি হবে। সেখানে কি উজাড় হয়ে যাচ্ছে?—যায় না। উবে যাচ্ছে?—না, তাও না। অনবরত 'ভেপার' সৃষ্টি হচ্ছে—সৃষ্টির আসা যাওয়া চলছে।

তবে যেদিন একটা কীটের সৃষ্টি হয়েছিল সেইদিন একটা মানুষের সৃষ্টি হয়েছিল—এরকম বললে চলবে না। একটা পোকা সৃষ্টি হল এবার সেই পোকার মধ্যে এমন জিনিস দেওয়া রইল যাতে সেই পোকা ঘুরতে ফিরতে রূপ ধারণ করবে বা নিজেকে রূপ বদল করতে পারবে। রূপ রঙ ও লেখা—লেখা বলতে সহজাত জ্ঞান।

গরিলা গরিলাই হয়েছিল—বানর বানরই। কিন্তু মানুষ হওয়ার পর যে বনমানুষ হয় নি, এ কথা বলতে পারবে না। বানর থেকে মানুষ নয় শুধু, কিছু থেকেই কিছু হয় নি। যে যার ধারায় হয়েছে। মানুষ এইরকম হয়েছিল। আকার পাল্টেছে, সূক্ষ্মতা এসেছে—জ্ঞানের বিকাশ দেখা যাচ্ছে। ওলটপালট হয়ে যায় নি কিছু।

কেন আমি তাও বলে যাই, এরকম জিনিস আমি ঈশ্বরের কাছে কোনদিন পাই নি। সেই জ্ঞানেই তোমাদিগে বললাম। আমার সঙ্গে যখনই তার কথা হয়েছে বা এখন যখন হচ্ছে, এ ধরনের কথা তিনি বলেন না। পোকা থেকে পশু বা পশু থেকে মানুষ, এমন কিছুই বলেন না। শুধু বলেছেন, জীবকে লক্ষ্য করে দেখবে জ্ঞান অজ্ঞান মেশানোই জীব। একমাত্র শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে গিয়ে পৌঁছতে পারে মানুষ। আর কোন সৃষ্টি নয়। এইজন্য মানুষের দেবতা আখ্যা।

সৃষ্টির রকমফেরের আর একটা দিক চিন্তা কর। একটা মাছের পেট থেকে অসংখ্য ডিম বের হয়। অবস্থার চাপে অর্ধেক টেকে

তো একেবারে সরে যাচ্ছে না। সে জিনিসটা কি নেই? এ তো ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে না। একটা শক্তিকে অনুমান করা যাচ্ছে যে সেটা আছে। তালে শক্তির কাজ কি? সে তার যেখানে যেমন দরকার প্রয়োগ করে যাচ্ছে। আপনা ইচ্ছায় হচ্ছে—আপনা ইচ্ছায়' মানে যা দেবার দিয়ে দিয়েছে। চলছে সৃষ্টি। এবার সে শক্তি নিতে নিতে নিতে নিতে শেষ তো হয়ে যাবে। না শেষ হবে না এমন ভাবটা সেখান থেকে লক্ষ্য রেখেছে। অফুরন্ত ভাণ্ডার।

কি না সন্দেহ। তারপর মাছেই খায় মাছের ডিম। সিকি দাঁড়ালে গেবে যাবে পুকুর। একটা বাঘের নাকি বারো বছরে একবার বাচ্চা হয়। তার সৃষ্টি যে কম দরকার। আবার কোন কোনটার হবেই না। একটা আম গাছ, তাতে বছরান্তে এত এত ফল ধরবে। প্রয়োজন আছে তাই এমন সৃষ্টি। তাহলে বদল হচ্ছে কোথায়? সবই একসঙ্গে —রকমারী রকমফের করে দিচ্ছে।

সৃষ্টির আদিতে 'ভেপারের' এক অবস্থায় কতকগুলো পোকা-মাকড়ের সৃষ্টি হয়েছিল। তারপর ভেপারের আর এক অবস্থায় সৃষ্টি হল জীবের। তারপর বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টি হল মানুষের। ঐ যে রঙ রূপ লেখা—সেই লেখার মধ্যে আমি উপলব্ধি করেছি যেন এক একটা শ্লেট* বেরিয়ে আসছে। তার এক ভাগ সহজাত সাধারণ জ্ঞান আর এক ভাগে আছে সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি।

*শ্লেট

প্রসাদ -শ্লেটের একভাগে যে সহজাত এবং সাধারণ জ্ঞান, তার পরিমাণটা কতখানি?

মা-মহাজ্ঞান—ধর চার ভাগ। চারের আড়াই বার করে দাও, দেড় ভাগ দেড় ভাগ রাখ। তাও বলবে কেন—বার আনা বার করে দাও। সহজাত বার আনা।

প্রসাদ—চার আনার মধ্যে তাহলে সাধারণ জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান? এই চার আনার ক'আনা আধ্যাত্মিক জ্ঞান মা?

মা-মহাজ্ঞান—চার আনার মধ্যে আড়াই ভাগ আর দেড় ভাগ। আধ্যাত্মিক জ্ঞান দেড় ভাগ।

প্রসাদ—তাহলে সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি নিতান্তই সাধারণ জিনিস?

মা-মহাজ্ঞান—দারুণ সাধনার জিনিস। নেই বললেই চলে। দেড় ভাগটাও আমি বেশী বলে যাচ্ছি। তাও নয়। লাখ লাখ সাধক দেখতে পাবে, লাখ লাখ ধার্মিক দেখতে পাবে, কিন্তু বিচার করে যখন দেখবে না, তখন ঐ আনায় পরিণত হয়ে যাবে এসে। ও আমি দেড় ভাগটা জোর করে বলে যাচ্ছি।

প্রসাদ—তাহলে মা, 'ভেপারের' একটা বিশেষ অবস্থায় জড়ের সৃষ্টি হয়েছে। আর এক অবস্থায় জীবের সৃষ্টি হয়েছে, আর এক অবস্থায়, বিশেষ বলব সেটা, মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। তাহলে কি বলা যাবে মা যে, ভেপারে'র আর একটা অবস্থায় মানুষের চেয়ে উন্নত কোন প্রাণীর সৃষ্টি হতে পারে, পরবর্তীকালে ?

মা-মহাজ্ঞান—উন্নত! না, সেরকম কিছু দেখায় নি। উন্নত- ঐ মানুষই হবে। কাঠামোটা এই থাকবে। ঐ মানুষেরই উন্নতি হবে। মানুষেব বুদ্ধি ব্রেন আরো উচ্চস্তরে উঠতে পারবে।

প্রসাদ—নূতন কোন প্রাণীর সৃষ্টি আর হতে পারে না ?

মা-মহাজ্ঞান— না।

প্রসাদ—তাহলে তো বলতে হবে, জীবের সৃষ্টির আগে গাছপালার সৃষ্টি হয়েছে ?

মা-মহাজ্ঞান—হুঁ, আগেই ঘাস গাছ সৃষ্টি হয়েছে। তারপরে জীবের। সেইরকম ভাবে, যা পাঠাবার পর পর সমস্ত তৈরি ছিল। পর পর পব পব আসছে—একটার পর একটা বেরিয়ে আসছে। উ ? আবার কখনো দেখা যাচ্ছে যে, এক সঙ্গেই এসে পৌঁছে গেল।

এটা আর একটা দিয়ে তোরা 'আইডিয়া' করতে পাববি—কোন একটি নারীর সারা জীবন সে তার স্তন খুঁজলে কোত্থাও এক ফোঁটা দুধ বের করতে পারবে না। কিন্তু যখনই সে সন্তান-সম্ভবা হল—পেটে আসে নি তখনই দেখবি। একটা নারীকে দিয়ে দেখবি গাছপালা দিয়েও দেখবি, পরীক্ষা করে দাঁড়িয়ে। আচ্ছা তখন দেখবি সে একটা সতেজ রূপ নিল। কেন ? সে আরো টানতে রইল রস রক্ত বাইরে থে কে। টেনে নিতেই হবে তাকে। আচ্ছা, যেই পেটের মধ্যে একটা আরিস পড়ে গেল, উঁ,—তখনো প্রকাশ নেই তার—অমনি চারিদিকের জিনিসগুলোকে ঠিক করে দাঁড় করিয়ে দিল। যেই আমাদের গুনতিতে দু'মাস কি তিন মাস হল অর্থাৎ ফুল মুকুল দেখা দিল, তেমনি দেখবি স্তনে দুধ এসে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছাচ্ছে। খাদ্য না হলে খাবে কি ?

প্রসাদ—তাহলে যা কিছু রহস্য তো সৃষ্টির মধ্যে, মৃত্যু তো কোন রহস্যে আবৃত নয়?

মা-মহাজ্ঞান—রহস্য মানে! নেই তো। খোলটা পড়ে যাচ্ছে। পুরানো হয়ে গেল। এ্যাঁ, বাষ্পটা একদিন স্তম্ভিত হয়ে গেল। একটা বাষ্প তো? মৃত্যু বলতে কি? একটা 'ভেপার'। শেষ হয়ে গেল ঐখানে। এ দেহ আর চলবে না।

প্রসাদ—তাহলে মৃত্যু হচ্ছে খোলের একটা স্বাভাবিক পরিণতি? মৃত্যুর মধ্যে কোন রহস্য নেই!

মা-মহাজ্ঞান—ওর আর কি রহস্য আছে।

প্রসাদ—মৃত্যুর পরেও বলতে কিছু নেই!

মা-মহাজ্ঞান—কিছু নেই ও যা কিছু, সব মনের আতঙ্ক। তাছাড়া কিছুই নেই। বাষ্পটা শেষ হয়ে গেল ঐখানেই। যে রইল খোলের মধ্যে ঐ তার নানারকম ভাবের দ্বারায় ঐগুলো এসে পৌঁছবে আবার। সেই যে বাষ্পটা শেষ হচ্ছে, যে জীবিত আছে যার খোল আছে, সেই বাষ্পকে সে গ্রহণ করে ফেলল। শেষ সময় তার কিছু অংশ সে টেনে নিল। সে স্নায়ু শিরার মধ্যে কিছু টেনে নিল। টেনে নিয়ে সে নানারকম জিনিস রঙ্গমঞ্চে দাঁড় করিয়ে দিল। (হাসি)

প্রসাদ—তাহলে মা, সমস্তই মনগড়া?

মা-মহাজ্ঞান—কিছু না। 'মন-গড়া' বলে তুই বুঝা দেখিনি, কেমন কেউ বুঝে! সে চাক্ষুষ দেখেছে—দাঁড়িয়ে আছে তার বাবা।—তাই কখনো হতে পারে, আবার বাবা নয়? তাকে তুই কিছুতেই বুঝাতে পারবি না। সে বুঝবে না তো, তার মনের সঙ্গে সে তো টেনে নিয়েছে। তার খোলের মধ্যে কিছু অংশ টেনে নিয়েছে যে সে।

যেমন মনে কর, একটা দূরে বাতাস করছে, তার হাওয়াটা এসে তোর গায়ে লাগল। অথচ পাখা নয়। অনেক দূরে চলে যাচ্ছিল, একটা আভাস বুঝলি।

'পড়ে থাকা খোল' নিয়ে কথা উঠলে মানুষের খোল-ফেলার-পর-পরিণতি প্রসঙ্গে মা বলেন—পরিণতিটা তৈরি করে নিতে হয়।

করলেই হল। সেটা জীবের শ্রেষ্ঠ মানুষ, সেই মানুষকে ঐ কাজটা দিয়েছে। মানুষই পরিণতিটা তার তৈরি করে। (হাসি)

কালকে আমি যে খোল ফেলে দেব, তোদের এখানে দাঁড়াব, ওখানে দাঁড়াব, সেখানে দাঁড়াব—তোরা দেখতে পাবি। তোরা পরিণতি তৈরি করছিস আমার। কিন্তু আমার যা দিবার যা করবার হয়ে যাচ্ছে। এই জ্ঞানটা কানে বেজে উঠবে। এঁ্যা, আমি শিরা-উপশিরার মধ্যে তোদের জড়িয়ে পড়ছি। সেইটিই তোরা দেখতে পাবি তখন।

প্রসাদ—তাহলে ভেপারের পরিণতি বলতে, ঐ কয়লা থেকে ছাই যা, তাই বলতে হয় ?

মা-মহাজ্ঞান—হুঁ হুঁ।

প্রসাদ—একটা বিশেষ 'ভেপার' থেকে জীবের সৃষ্টি হচ্ছে। তারপর যখন তার মৃত্যু হচ্ছে তখন সেটা বেরিয়ে যাচ্ছে মানে ? একটা তো রূপান্তর হয়ে গেল।

মা-মহাজ্ঞান—খোলের মধ্যে তো রয়েছে ভেপারটা। খোলের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেল। খোলের যা কাজ, সে খোলে আর সে থাকতে পারছে না। এঁ্যা, সেই গ্যাসটা সেই খোলের মধ্যে থাকতে পারছে না। তখন তো তাকে বাইরে বেরিয়ে যেতে হবে। কি করবে, তার মধ্যে কোথায় থাকবে ! সে তো চাপা হয়ে গেল।

প্রসাদ—না, আমি তা বলছি না। সে তো একটা অন্য আকৃতি নিল। 'ভেপার' থেকে মানুষ, আবার 'ভেপার' কেন বলছ মানুষের মধ্যে ?

মা-মহাজ্ঞান—কাদা দিয়ে একটা কিছু মূর্তি গড়া হল। এখন মূর্তি গলে গেলে সেই কাদাই তো দাঁড়িয়ে যাবে। ভাঙা হয়ে যাচ্ছে তো ভিতরটা। খোলটা রয়ে গেল। যেটা আসল জায়গায় এসে জিনিসটা পৌঁছয়, এঁ্যা ? আসল কি ? প্রথম যখন তিন মাস বা এক মাসের শিশু-বা .া পেটে, তখন সে দেখ.বি রক্তটাই, ডেলাটাই। সেইটা আকৃতি ধারণ করবে। যত সেটা বড় হতে থাকবে তত একটা আকৃতি নেবে। কিন্তু সেই খোলের মধ্যেই সে রয়ে গেল।

প্রসাদ—আচ্ছা মা, রকম আট আনা 'ভেপার' থেকে যদি এই খোলটার সৃষ্টি হয়েছে—সেই শক্তি নিয়ে আমি ধরা যাক, ষাট বছর বাঁচব। তাহলে ভেপারটা ষাট বছর পরে প্রাণবায়ু রূপে রূপান্তরিত হয়ে বেরিয়ে গেল। অর্থাৎ কয়লা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এবার আমি যদি ষাটের জায়গায় তিরিশে 'এক্‌সিডেন্টে' মরি, তাহলে এই যে আধপোড়া কয়লা থাকল,—

মা-মহাজ্ঞান—আধপোড়া! গোটাই পুড়ে যাচ্ছে। যখনই একটা জিনিস পুড়ে যাচ্ছে না, তখন তার আধ পোড়া দিয়ে আর কিছু কাজ হবে না। মূলতঃই একটা 'ভেপার'। যেটা আসল অংশ সেটাই যদি নষ্ট হয়ে যায়, বাকীগুলো সব নষ্ট হয়ে গেল। আর তাকে দিয়ে কিছু কাজ হবে না।

যা দিয়ে শুরু—অনেকগুলো 'পার্টস' দরকার মোটরের, কিন্তু আসল যেটা দিয়ে শুরু, সেটা শেষ হয়ে গেলেই সবগুলোয় 'মরচে' ধরে য'বে। সেগুলো দিয়ে আর কিছু কাজ চলে না।

প্রসাদ—তাহলে খোলটা পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণবায়ুও অকেজো হয়ে গেল?

মা-মহাজ্ঞান—আবার প্রাণবায়ু কি? আবার প্রাণবায়ু বলে কি আছে! এ্যাঃ?

প্রসাদ—ঐ যে 'ভেপার'টা খোলের মধ্যে রয়ে গেল?

মা-মহাজ্ঞান—রয়ে আবার গেল কোথায়! ঐখানেই শেষ হয়ে গেল জিনিসটা। রয়ে-টয়ে গেল বলে দেখিনি আমি কিছু।

প্রসাদ—তাহলে? এই খোলটার প্রতি লক্ষ্য রাখলে পরে আমি, ষাট থেকে তো আশী পরমায়ু করতে পারি আমার?

মা-মহাজ্ঞান—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটাকে বাড়ানো হচ্ছে। সেটাকে কমানো বাড়ানো যায়। সে এমন একটা স্নায়ুর জিনিস আছে, সে তার দ্বারাতে তাকে তৈরি করলেই, সে তৈরি হতে থাকবে। আপসেই সে তৈরি হবে। সে আপনা' ইচ্ছায় তৈরি হয় ভিতরে, আবার আপনা ইচ্ছায় মরে যায় ভিতরে। সে কার দ্বারাতে? না, পাঁচটা যন্ত্রের

দ্বারাতে। আর পাঁচটা যন্ত্রের দ্বারাতে সে তৈরি হয় এবং আর পাঁচটা যন্ত্রের দ্বারাতেই সে মরে যায়। আলাদা বলে কিছু নেই।

প্রসাদ—তাহলে ঐ যে কালকে বললে, প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায়—চোখ মুখ এ সবের মধ্যে দিয়ে—

মা-মহাজ্ঞান—আরে ঐটে যখন দমটা আটকে যায়—সেই দমটা আটকে গিয়ে এ-এমনি করে ওঠে (আঁক ভাব) সেই সময় বিকৃতি একটা মুখে-চোখে দেখা যায়।—'ঐ দেখ চোখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।' কিন্তু সত্যিকারের তা নয়। চোখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, ও সব বাজে কথা। ক্যাঁক করে উঠল জিনিসটা। চেপে দিলেই চেপে ধরলেই একটা এমনি করে—দেহেব বিকৃতি দেখা যায়। কোথাও কোথাও আবার দেহের কিচ্ছু বিকৃতি দেখা যায় না। স্বাভাবিক পড়ে আছে। মৃত্যু হয়ে গেছে তার মানে এত দুর্বল হয়ে গেছে ভিতরে যে তার কোন বিকৃতি হয় নি। একটা মানে জীবন্ত—কি বলবে ? জলন্ত জিনিসকে চেপে ধরা, উঁ, আর একটা নির্জীবকে চেপে ধরা—জোয়ানকে চেপে ধরা আর বৃদ্ধকে চেপে ধরা—দুটো এক কথা কি ? তার তো খরচ হয়েই গেছে।

প্রসাদ—ভেপার যদি মা, মূলতঃই শক্তি হয়—সেই ব্রহ্মের কাছ থেকে যেটা আসছে, সেই শক্তি থেকে আকার নিয়ে জড়ের সৃষ্টি হচ্ছে, আবার জীবনেরও সৃষ্টি হচ্ছে। তাহলে যেখানে জীবনের সৃষ্টি হচ্ছে সেখানে শক্তির সঙ্গে একটা কিছু আসছে না কি ?

মা-মহাজ্ঞান—কিচ্ছু আসে না। ঐ একই আসছে সব। ঐ জড় জীব একই ?

প্রসাদ—জড় জীবন একই আসছে বলতে। এ আবার কি রকম কথা বলছ !

মা-মহাজ্ঞান—ঐ এক রকম জিনিসই আসছে। জড় হবার কথা জড় হয়ে যাচ্ছে, জীব হবার কথা জীব হয়ে যাচ্ছে। ও ভেপারের ঐখান থেকে যা তৈরি হবার হয়ে যাচ্ছে। নূতন করে আর কিছু তৈরি হয় না।

বিষয়-বস্তুর গুরুত্ব বা গভীরতা উপলব্ধি না করে অনবরত মাকে এটা ওটা প্রশ্ন করার জন্য হঠাৎ মা-মহাজ্ঞান বিরক্তি প্রকাশ করেন। তিরস্কার করেন আমাকে—"এত সৃষ্টির দিকে লক্ষ্য কেন, রক্ষা না করে? এ সব এত বুঝি না আমি! উঁ, এত নেওয়ার দিকে ধান্ধা কেন? করার দিকে লক্ষ্য নেই। পাঁচজনকে বুঝাব? কিসের দ্বারাতে বুঝাবে? ও সব উপলব্ধির জিনিস। কেউ বুঝতে পারবে না। পড়ে বুঝবার জিনিস নয় ওগুলো। ওগুলো পড়ে অন্ধের হাতি দর্শন হবে। বাজে যত সব—।"

প্রসাদ—কিন্তু গুরু থাকতে তো গ্রহণই আসে।

মা-মহাজ্ঞান—না। অনেক সময় গ্রহণ আসে অনেক সময় পালন আসে। অনেক রকমই আসে। আমি শুধু গ্রহণেই লক্ষ্য দেখে যাচ্ছি, পালনে কোথাও লক্ষ্য নেই।

একটা জিনিসকে সাত বার ধরে বুঝাতে বলে খালি। একই কথাকে বারে বারে বারে বারে 'রিপিট' করে। ফক্‌কড়ি করবার জায়গা পায় নি।

ও অত আমি বুঝাতে আসিনি কাউকে। এত কি! কালকেই আমি বলে দিয়েছি না ওটা।

প্রসাদ—তাহলে ভাল করে বুঝে নেওয়ার দরকার নেই বলছ?

মা-মহাজ্ঞান—উঁহু, ঐটা পড় না, পড়লেই বুঝবি। ওটা বার বার করে 'রিডিং' পড়। পড়ে যা, পড়ে গেলেই বুঝতে পারবি—কোথা থেকে কি এসেছে।

প্রসাদ—পড়েছি মা। না পড়ে কি বিরক্ত করছি?

মা-মহাজ্ঞান—তাহলে এখন বয়স হয় নি, রেখে দে। তা আমাকে দিয়ে এরকম করে পরিশ্রম করানোর কি মানে হয় রে—আজে-বাজে কথা দিয়ে? একবার মেশিনে, একবার 'এ' করে একবার 'তা' করে। হাজার বার ধরে হাজার রকম দিয়ে আমাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে।

এমন কি, মায়ের পেট থেকে বেরোতে বেরোতে যখন আধখানা গলাটা টিপা হয়ে গেল—আধখানা ভিতরে আধখানা বাইরে—

ঐখানেই তার শেষ হয়ে গেল, ঐখানেই সে ছাই হয়ে গেল।

প্রসাদ—মা, সে ছাইটা দিয়ে কোন কাজ হয় না?

মা-মহাজ্ঞান—কিচ্ছু কাজ হয় না। কোন কাজই আমি দেখি না। আমি তো বলছি, আমি দেখিনি। হয় কি না, তোরা এবারে পরে বলবি। আমি জানি না।

প্রসাদ—তাহলে তো আমাদের নতুন করে উপলব্ধি করতে হবে।

মা-মহাজ্ঞান—হ্যাঁ, তোদের মতন—যদি আবার আমার উপরে কেউ এসে বলে যে, না, তা দিয়ে কাজ হয়। আমি সেটা দেখিনি। আমি কেন বলে যাব 'না'। ওরকম গুল মেরে দিয়ে চলে যাব, চাল মেরে দিয়ে? ওভাবে নাম কিনব কেন আমি? যদি এর উপর দিয়ে কেউ বলতে পারে। আমি এই পর্যন্ত গেছি। আমাকে কোনদিন আমার গুরু বলে নি।

জীবন স্তব্ধ হয়ে গেল। সেই স্তব্ধের ভিতরে একটা দম 'এমনি হয়ে' গেল (আঁক ভাব) জিনিসটা শেষ হয়ে গেল ঐখানে। ঐ শেষের আকৃতিটা দেখিয়ে দিল। আচ্ছা এবার যে হাড়গোড়গুলো রইল, তা মাটির তলায় পুঁতে রাখলে সার হল। সেই সারটার উপরে যে ফসলটা ফলবে, সেই ফসল খেলে, তার ভিতরে কিছু প্রতিক্রিয়া গেল, উঁ? যদি পুড়িয়ে দিলে ছাই হয়ে গেল, তাহলে সে ছাই-এর আর কি দাম থাকতে পারে। ছাই-এর মধ্যেও যেটুকুন রইল সেটি সবের মধ্যে—আকাশে বাতাসে মিশতে রইল। হাওয়ায় মিশে গেল কিছু মাটির মধ্যে রয়ে গেল, কিছু জলে ধুয়া হয়ে চলে গেল—এই রকম। এই ভাবেই তার হল, কাজে লাগল।

এ কথা একদিন আমি বলেছি যে, ঐজন্যে দেখবে কারো সঙ্গে কারো মিল নেই, অথচ একটা অন্য দেশের সঙ্গে এই দেশের মিল আছে। নিশ্চয় এমন ভাবে সেই বায়ু সে গ্রাস করেছিল বা সেই ফসল সে গ্রহণ করেছিল, তারপরে সেই ছেলে হয় তার। সেই ছেলে সেই রকম রূপ ধরবে।

বিস্ময় বিচার

['জন্মান্তর নেই' বললেই পরম বিস্ময়ে পেয়ে বসে। 'জন্মান্তর আছে' জানলে উৎপাত কত কমে যায়। জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতি, প্রারব্ধ কর্মফল, ইত্যাদি কত না যুক্তি দিয়ে সুন্দর মালা গাঁথা হয়ে যায়। সেই সঙ্গে প্রেতাত্মা থেকে মহাত্মা ধারায় ধারায় ভূমিকা নিতে পথ পায়। মহাপুরুষে খেই হারিয়ে বসেন 'নেই' শুনলে। সেখানে সাধারণ কেউ কি দিশেহারা হয়ে যায়।

এক জীবনেই সব। কেউ কিছু পাই বা না-পাই, সময় হলেই হিসাব দিতে হবে। যে যেমন করেই ভজিয়ে দিই না কেন, সাজানো থাকবে থরে-বিথরে। এলোমেলো ঘরকর্নায় কীর্তি হয়ে কথা বলবে কেবল নিরঙ্কুশ জ্ঞান। তাই মানতে হবে বৈ কি,—স্পৃহার আকার, জাতিস্মর ইত্যাদি নানান্ প্রসঙ্গ।

'মা-মহাজ্ঞান' প্রদত্ত যুক্তি-নিচয় বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনায় বিস্তর অবকাশ রাখে। সহসা মহাজ্ঞানের সভায় শোভায় একযোগে সাহিত্য-কলা-বিজ্ঞান সকলকে সমানাসনে দেখে আমরা বিস্মিত হই। বিশেষ করে বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার চিরকালের বিরোধ নিমেষে মিলতে দেখে আমরা কোথায় যেন একটা সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলি।

'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।' কথাটা যুক্তি গ্রাহ্য। তবে তর্ক যেমন পাইয়ে দিতে পারেনা, বিশ্বাসও তেমন সন্ধান করতে জানে না। তর্ক ছেড়ে যুক্তি আলোচনা ভূমিকা নিলে, গবেষণার পথ ধরে 'বিশ্বাস বল' বিচারের মানদণ্ডে আপনাকে মহা বলিয়ান খুঁজে পায়। এখানে সেই গবেষণার দুয়ার দিগন্ত খুলে গেছে। আমরা যারপর নাই বিস্মিত হই মায়ের নিগূঢ় বিচারের সারমর্ম উপলব্ধি করে।]

স্পৃহার আকার

প্রসাদ—মা, আকার বলতে কি বুঝায়? বিজ্ঞানের ভাষায় আমরা মোটামুটি যা বুঝি—কোন বস্তুর একটা আকার হয়। কিন্তু

শক্তি সে তো অনুভূতির অপেক্ষায় থাকে—শক্তিকে অনুভব করতে হয়। আমার স্নায়ুতে স্পৃহার যে আবেদন তা হল শক্তি বিশেষ। তাহলে 'স্পৃহার আকার' কথাটা দাঁড়াচ্ছে কি করে?

মা-মহাজ্ঞান—কোন জিনিস 'খাব' মনে করলেই 'কি খাব' প্রশ্নটা মুহূর্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে যায়। কিছু পেটে দিয়ে শান্তি পেতে চাও বা মনে একটা চাঞ্চল্য অনুভব করছ, কারো সঙ্গলাভ করতে চাও—দেখবে যেমন ক্ষুধা, যেমন খাদ্য চিন্তা, সেই মত তার একটা আকার সৃষ্টি হবে। এবার প্রকাশ দেখে বুঝা যাবে এবং সবের বিচার হবে।

প্রসাদ—আমাদের চাহিদা, রিপুর তাগিদ ইত্যাদি সব কিছুকেই স্পৃহার আবেদন বলে বলা চলে কি?

মা-মহাজ্ঞান—হ্যাঁ তাই।

প্রসাদ—এবং যার যেমন স্পৃহা তার তাই হল প্রকৃতি—এ কথা বললে কি কোন ভুল হবে?

মা-মহাজ্ঞান—যার যেমন স্পৃহা তার তাই প্রকৃতি আর যার যা প্রকৃতি তার তেমন স্পৃহা।

প্রসাদ—তাহলে কি মা বলব, 'কি খাব'-টাই স্পৃহার আকার? হ্যাঁ, তাই ঐটিই ঠিক।—মা।

এই স্পৃহার আকারের সঙ্গে গবেষণার মনের সম্পর্ক কি? এমন প্রশ্ন করায় যে ভাবে 'মা-মহাজ্ঞান' গুছিয়ে দেন।—

মন্দির পোড় হলে কি, সেখানে পরমাত্মা স্থিত এবং মন্দির প্রাঙ্গণে চলছে আত্মার খেলা। গতকাল এ নিয়ে মা বিস্তারিত বলে গেছেন। তাহলে স্পৃহা বলতে মূলতঃই স্বাভাবিক প্রবণতা। স্নায়ুতে স্পৃহার যে অবদান আছে তা হল জ্ঞান অজ্ঞান মিশ্রিত। খিদে পেয়েছে খাবে, তা এই স্পৃহাকে পরিচালিত করছে সহজাত জ্ঞান—বেড়ে নিয়ে খাও এবং সঙ্গে এক গেলাস জল রাখ ইত্যাদি।

এবার আমি মানুষ বলে হয়ত এই সঙ্গে যোগান দেবে সাধারণ জ্ঞান। তবে সেই সাধারণ জ্ঞান, যা বলছে, 'খাদ্যাখাদ্য মোটামুটি

বিচার কর বা ধীরে সুস্থে খাও'—তাও আসছে পরমাত্মার কাছ থেকে।

অর্থাৎ প্রাঙ্গণে আত্মার যে খেলা চলছে, পোড়ো মন্দিরের দরজায় চৌকাট নেই বলে, মন্দিরের কিছু কিছু জিনিস প্রাঙ্গণে চলে আসছে। এবার এল সূক্ষ্ম বিচার বোধ—'খাব কি, আমি খাওয়াব। খাওয়ানোর প্রশ্ন যখন, তখন আমার মোটেই খাওয়া চলে না।' শুরু হল সহজাত জ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞানের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা।

প্রাঙ্গণ থেকে মন্দিরের মধ্যে আত্মা চায় তার আবেদন পৌঁছে দিতে। সাধকের সাধনাই বল বা বিজ্ঞানের গবেষণাই বল বা সাহিত্যিকের সার্থক সৃষ্টির চেষ্টাই বল—সবের শুরু এর পর থেকে।

তাহলে পরিষ্কার আমরা বুঝতে পারি, যে জ্ঞান স্পৃহার গতি নিয়ন্ত্রিত করে তা হল সাধারণ জ্ঞান এবং যা স্পৃহার গতি স্তব্ধ করে তাই আধ্যাত্মিক জ্ঞান। 'খাব' ভাব স্তব্ধ হলে রূপান্তরিত হয়ে হয় 'খাওয়াব'।

তবে তুমি যে গবেষণা করছ, এ কথা কাউকে জানতে দিও না। কেউ যেন না জানতে পারে। সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে তুমি পাল্টাতে আরম্ভ করেছ। দেখ কিরকম আকার ধরছে মনের মধ্যে। ঐ গুলোকেই বলছে স্পৃহাকে ঘুরানো। যখনই তুমি গবেষণা করতে বসে যাবে তখনই তোমার চোখ ওখানে (নিস্পৃহায়) স্থির হয়ে যাবে। মন স্থির হয়ে যাবে। বাকী অন্য দিকের কাজ তোমার বয়ে যাবে।

তুমি যদি মূলতঃই গবেষক হও তাহলে তো তোমার সময় লাগবে না, এক কথা। দ্বিতীয় কথা—যারা তোমার আশপাশে থাকবে তারা তোমার গবেষণা দেখে দাঁড়িয়ে যাবে, তোমায় খাতির অভ্যর্থনা জানাবে। গবেষণার মনটা উবে গিয়ে আমিত্বের মনটা আগিয়ে আসবে।

[বছর আষ্টেক আগে 'স্পৃহার আকার' প্রসঙ্গে মায়ের বলা বাণী পাঠকালে না বুঝায় খটকা লাগে। প্রশ্ন করি—'সবের শুরু এর পর থেকে' এবং স্পৃহার গতি 'নিরন্তিত' বা 'স্তব্ধ' বলতে কি বলতে চেয়েছেন আপনি, গুরুদেব ?]

চাওয়া পাওয়া স্পৃহা ইত্যাদি—এই পিয়াসকে মিটালে তবেই আসছে সেই জ্ঞান। অর্থাৎ নিস্পৃহা। নিস্পৃহা শুরু—প্রথম স্পৃহার সঙ্গে মিলিত। (নিস্পৃহকে প্রথম মিলিত হতে হবে স্পৃহার সঙ্গে এসে।) এর গতিতে বেশ কিছুদিন দাঁড়িয়ে থেকে তবেই যে নিস্পৃহ তার গতিতে রূপ দেয়। রূপ দিয়েই কিন্তু ওর শান্তি নেই। ওকে স্পৃহার সঙ্গে মিতালি করেই চলতে হবে। আর মাঝে মাঝে সে (নিস্পৃহ) তার দিকে ছুটবে।

কিন্তু মনে থাকবে ভয় ভীতি। কারণ স্পৃহা তখন শক্তিশালী শত্রু। কখন ঝপ্ করে ছুটে এসে পিছন থেকে আছাড় মারবে। এই ভয় নিয়েই বেচারা নিস্পৃহকে যেতে হবে। এইভাবেই প্রায় এক রকম আমরণ তাকে নির্ভীক অন্তর নিয়ে ভীতির ভানে চলতে হবে।

শত্রুই বল আর মিত্রই বল, স্পৃহা তাব পিছন ছাড়ে না। কিন্তু স্পৃহা বেশ বুঝতে পারে, 'আমাকে কৌশলে কলা খাইয়ে দিচ্ছে।'

আর নিস্পৃহ পাশ থেকে এই কথাই বলে উঠে—

দুর ছাই।
কি আর করে নিলাম,
ভাবছি শুধু তাই।

কিন্তু কলরবে কোরাণ পুরাণে সর্বত্রে ছড়িয়ে যায়—ত্যাগী মহাপুরুষ।

স্পৃহা তখন চেঁচিয়ে উঠে।—

এ আখ্যা পেলি কোথায় ?
আমাকে যে কলা খাওয়ালি
আমি কি বুঝি নাই ?

খুব তো গুসুমুসু মিতালি করে
ঘুপসি দিয়ে প্রবেশ করলি আমার ঘরে।
এখন দেখছি যে তোর দর দালান!
তুই যাই বল, মুন্‌সিয়ানায় মুন্সী বটে!

নিস্পৃহ চুপটি করে মুখটি টিপে চাপা বুকে হেসে উঠে স্পৃহা—

হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন তো তুই হাসবি বটে!
আমায় কাঙ্গাল করে
করে নিয়েছিস কেল্লা ফতে।
এবার যানবাহনে আসছে যেজন
নেই তো সেথা শঙ্খধ্বনি বাদ্য বাজন।

আড়ের পাড়ে পাড় রইল পবন-বীর।
অতি দ্রুত অতি ধীর
আগিয়ে গেল এ সে কোন্ বীর?
এখানে নয় মিতালি।
হাতে আছে সব সেই প্রশ্নগুলি।
বুঝাতে হবে; মিলিত হবে মহাজ্ঞান।
রয়েছে দাঁড়ায়ে হোথায়।

দেখিলে হয় যে মনে—
নেই তৃষ্ণা নেই ক্ষুধা
কিন্তু পাত্র হাতে খাবে ক্ষীর।
বীর তখন বীর্যহীন,
পড়ে রয়েছে অতি ক্ষীণ।

এবার শুধু বলছে ফিরে—
কে তার শব্দ শুনে
গুরু বলে গুরুত্ব তোলে ঃ
ফাঁকা মাঠের ফাঁকা আওয়াজ
যায় মিলায়ে ধূলির সাথে।
কেউ ফিরে না—ফিরে না তাকায়।

এসেছিলো যে অতি ধীরে
বসেছিল যে কোণের ঘরে চুপটি করে,
আজ তার ধ্বনি
দল-মাদলে কামান দাগে ;
সবাই চমকায় জানি।

স্পৃহা—

পরাজয়ের সুরে বলি বারে বারে—
তোমার দয়ায় তোমার কৃপায়—
কেউ করে না আমায় আদর,
খোলে আদর করে।
ঐ খোলেতেই ছিলাম মোরা—
মোরা দু'জন মিলে।
ধন্য আমি ধন্য জানি,
তোমার কৃপা বলে।

[জাতিস্মর কথাটা আমরা বাস্তবে শুনেছি। কি একটা অবাস্তব সত্য যেন এখানে উঁকি দেয়! কালে-ভদ্রে কয়েকটা চমকপ্রদ উদাহরণ মনকে দারুন দুলিয়ে দিয়ে যায়। কিন্তু ঠিক যুক্তি দিয়ে বিচার করা সম্ভব হয় না। কেউ না বুঝতে পাই এর গোড়ার কথা কি ?

আজ মায়ের জ্ঞানের আলো-এ দাঁড়িয়ে এ সম্পর্কে একটা ধারণা হল। প্রসঙ্গটা খোকনকে নিয়ে উঠল। সকালে এক সময় ওকে বলছিলাম—"ছাখ, মা মোটেই জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী নয়। গতকাল মা পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন—"মৃত্যুতেই জীবনের পরিসমাপ্তি। 'মরণের পরে' বলে কিছু নেই। মৃত্যুই জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি।"

উত্তরে খোকন বলে—'আমি কিন্তু জন্মান্তর বিশ্বাস করি। আমার প্রায় থেকে থেকে মনে হয়—এ জায়গা আমার পরিচিত, অমুক জিনিসটা আমি ব্যবহার করেছি—ইত্যাদি কিছু কিছু ভাব। এগুলোকে কি বলবে ?'

আমি আর হালে পানি পাই না। 'মা-মহাজ্ঞান' শরণাপন্ন হই। তিনি ব্যক্তি ধরে ব্যাপক—পথ ছেড়ে প্রান্তরে গিয়ে দাঁড়ান। প্রান্তরের পারে নীল নীলিমা ভেদ করে লক্ষ্যে পড়ে 'সেই সুদূর দিগন্ত'।]

মা-মহাজ্ঞান—খোকন জন্মের আগে দীর্ঘদিন আমার স্নায়ুতে আমার সতীন ও নন্টুকে নিয়ে যে কল্পনা চলেছিল তা যাবে কোথায় ? সেই আসছে 'স্পৃহার আকার'। বিয়ের পর এ সংসারে এসে স্বামী ও আর পাঁচজনের কাছে দিদির কথা শুনতাম। নানাভাবে নানাকথা আমার গভীর ও উপর মনকে ছুঁয়ে যেত। উপর মনে তমসা ছুঁয়ে ছিল, তমসাচ্ছন্ন ছিলাম না বটে। সেই সব নিয়ে নানা রকম স্বপ্ন দেখি সময় সময়। কালে যুক্তিবাদী মন হবে বলে এত কথার মূলে মাত্র দুটি স্বপ্ন দেখি। তখন শুধু ভেবেইছিলাম। ভেবেছিলাম বলেই স্বপ্ন দেখেছিলাম । এখনও ভাবি তবে উপর মনে। এবং শুধু ভাবছি না,

ভাবছি এবং ভাঙছি।

স্বপ্ন যখন দেখি, তাহলে সেই সব নিশ্চয় উপর মনে উঠেছে এবং যখন উপর মনে উঠেছে তখন নিশ্চয় এক কালে গভীরে ঠাঁই পেয়েছিল। কোন ভাব অন্তঃস্তলে না ছুঁয়ে গেলে তা হঠাৎ কথা নেই বার্ত্তা নেই স্বপ্নের বিষয় হতে পারে না। পঁচিশ বছর আগে কাউকে দেখেছ, তার কথা মোটেই মনে নেই, হঠাৎ তাকে স্বপ্ন দেখলে। ঐ একই কারণ।

যা যা দেখতাম তাই সকলের কাছে ব্যক্ত করতাম। বলতে বলতে আরো কথা কাহিনী আসত, স্পৃহা একটা স্পষ্ট আকার নিত। স্নায়ুর মধ্যে সেই সব ভাব থেকে থেকে পাক খাচ্ছে। তারপর 'শান্তিভবন' (শ্রীক্ষেত্র) তৈরি হল, নণ্টুর জন্ম হল। নণ্টুই হল সেই সতীনের ছায়া। ছেলের ভাব ভঙ্গিতে মিল পেলাম। বিচার করে যা না বুঝলাম তার চেয়ে ঢের বেশী বাস্তবের সকলের বলার চাপ।

নণ্টুকে নিয়ে ক'বছর কাটল। চার বছর ছেলেকে ঘিরে অনেক সাধ আহ্লাদ বাপ-মায়ের মনে। তবে বেশী দিন ও পৃথিবীর বাতাস ভোগ করল না। কিন্তু বহু স্মৃতি জড়িয়ে গেল। মরেও সে মরে নি। আমি স্বপ্নে দেখি—মা, তুমি বালিশ বিছানা সব রেখে দাও। আমি আবার আসব আবার শুব। এর মধ্যে নণ্টুর মৃত্যুর আগেই কিন্তু মলি জন্মে গেছে। যাই হোক তারপর শেষ খোকনের জন্ম। তাহলে বলাবাহুল্য এই ছেলের স্নায়ুতে বর্তমান দিদি ও নণ্টু। তাই ওর থেকে থেকে মনে হয়—এ জিনিসটা যেন কবে কখন এখানে ব্যবহার করেছি, ইত্যাদি। তবে ঐ মনেই হবে, কোন 'গ্যারান্টি' নেই।

প্রসাদ—কিন্তু মা, এক একটা ছেলে যে পূব জন্মের স্ত্রী পুত্র বাড়ি ঘর সব চিনতে পারে?

মা-মহাজ্ঞান—আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না। তেমন জিনিস আমি ধ্যানে জ্ঞানে পাই নি। শোনা গল্প। আমি উপলব্ধি করে কিছু পাই নি। একটুখানি কেউ হয়ত চিহ্ন দিয়েছে, কিন্তু তাকে হৈ হৈ করে সকলে ঘিরে ধরেছে, এবং তার মূলে সে একটা বলে বসেছে।

আর তা যদি লেগে গেছে তো ব্যস—

প্রসাদ—কিন্তু মা, কামারপুকুর গিয়ে এই সেদিন (বছর ৭/৮ আগে) তুমি তো বলেছ তোমার অনেক অনেক জায়গা পরিচিত মনে হয়েছে। তার মানে ?

মা-মহাজ্ঞান—রামকৃষ্ণের কামারপুকুর ছিল আমার ঠাকুর্দার ভিটা—পূর্বপুরুষের বসবাস। বাবা জন্মানোর কিছুকাল পর ঠাকুর্দা চলে আসেন প্রথম নোয়াদায়, পরে গড়বেতায়। বাবার বাল্যস্মৃতি অনেক কিছু কামারপুকুরের সঙ্গে জড়িত। মাঝে মাঝে হয়ত যাওয়া আসা ছিল, এটা অনুমান।

তারপর রামকৃষ্ণের নাম ডাকের সঙ্গে কামারপুকুরের স্মৃতি জ্বলজ্বল করে উঠেছে। হাজার হলেও দেশের ছেলের উপর টানটাই একরকম। তাই বেশ বুঝা যায় বাবার শেষ বয়সের চিন্তার সঙ্গে কামারপুকুব জড়িয়ে পড়েছিল এবং আমি বাবার অধিক বয়সের শেষ সন্তান। বাবা ছেলেবেলায় যেখানে যেখানে খেলেছে, রামকৃষ্ণের জীবনের আলোয় সেই সব স্থান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই বটতলা, শিবমন্দির, হালদারপুকুর সবের স্মৃতি কেমন যেন আমার স্নায়ুতে একটা আবছা আকার ধারণ করেছিল।

তাই বলে ভেবো না রামকৃষ্ণের পরিবর্তে মা! আমার বাপ-ঠাকুর্দার রক্তের সঙ্গে আমি এই ভাবাটা চিন্তা করে নিলাম। এটা কিন্তু শুধু আমারই ক্ষেত্রে নয়। বহু ক্ষেত্রে বহুজনেরই দেখা যায় বা শুনা যায়—অনেক কিছুই তার পরিচিত লাগছে। কে তাদের আর পূর্বপুরুষ খুঁজতে গেছে! আর বিচার করতে গেছে! আবার অনেক সময় দেখা যায়—পূর্বপুরুষ খুঁজেও, কিছু না পেয়ে, তাহলে তার হল কেন ?

আঃ অত দূরকে যাচ্ছিস কেন ? এক একজনের স্মৃতিশক্তি মেধা—সে নিয়েই জন্মায়। কারো বা গান, কারো বা পড়াশুনা, কারো বা খেলাধুলা—ডুবুরী হওয়া।

এই সব নিয়েই আমি বলেছি না—পিতা-মাতা প্রকৃতি পরিবেশ ? এই নিয়েই খোলের গঠন, জীবন মরণ। আরে তাই না আমি বললাম

যা বলেছি—আমি সেই 'আসমানী শিকল'। যাকে যে লাইনে কাজ করতে হবে, সেই ভাব-ধারা নিয়েই তাকে জন্মাতে হবে। এবার দেওয়া থুয়ার সঙ্গে বাড়া কমা চলবে।

সঙ্গম-মুহূর্ত-কালে অজানা-অচেনা অতিথি কি আসতে পারে না তাতে কারো হাত নেই। যেমন ধরা যাক ছোট একটা উদাহরণ দিয়ে। বিয়ে বাড়ি, শ্রাদ্ধ বাড়ি, ভুজনা বাড়ি, ইত্যাদি ইত্যাদি—

সেই জনতার ভিড়ে,
বিনা আহ্বানে,
(করো না অতিথি মনে)
প্রবেশ নিষেধ জেনে,
ঢুকেছে সেইজন সেই ফাঁকে
কখন এখানে!

জনতার ভিড় মিটে যায়।
চারিদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।
ধুয়া মুছা কোণে
তার আকার দেখা যায়।

হায় এবার একে
কি করে সরানো যায়!
কোণ ঘিরে আকার ধারণ করে
এ এখন দেওয়াল প্রায়।
ছাতে শুধু ঠেকি ঠেকি ঠেকি।
কি করে ইহারে বকি!
পালা পালা যদি বলি?
আমারই তো মাথার ছাদ!
না না, বলো না বলো না।
হ্যাঁ তাই তো!

বলতে পারব না তো!
তাহলেই তো হুড়মুড়িয়ে
ছাদ ভেঙে পড়ে গেলি।

হায় সন্তান!
কি দিয়েছিনু তোমায় শুনি?
দিই না তো আমরা জানি।
তবে কেমন করে এলে তুমি!
এইখানেই যে স্থিতি তোমার
দেখতে পাচ্ছি আমি
তখনই আমার অন্তিমকাল
দৈববাণীর উদয়-সময়
নির্বিকারে তায়ে ধরেছি হাল।

এবার বুঝলি তো? তোদের ভাবার কোন অবকাশ রেখে গেলাম না। আজ নয়, যুগের কোনদিনই নয়। এ বিষয় বস্তু নিয়ে আরো অনেক কিছু বলা যায়। কিন্তু তা আর দরকার নাই।

যা দিলাম তাই নিয়ে স্বার্থপরতা ভুলে গেলে—এই জীবে প্রেম—যেটা তোরা বলিস সব সময়। কোন একজনের মুখ থেকে বোধহয় কখনো ফট করে বেরিয়ে গেছিল। সেইটিই তোরা অমোঘ অস্ত্র বলে ধরে নিয়েছিলি। এ নিয়ে তো আর মাথা ফাটাতে হয় নি বা মাথা-ব্যথা নেই। তাই সব জায়গায় চালিয়ে দিস।

তাই আমি বলে যাচ্ছি—পালন বিচার করলে এক জায়গায় সব খুঁজে পাবি।

শুধু একই কথা
বারে বারে বলে যাওয়া,
পালন বিচার যুক্তি বুদ্ধি বিবেক—

এই নিয়েই সব সময় কাজ করা চাই।
তা আসে একমাত্র
পরিমিত আহার বিহারকে লক্ষ্য করলেই।
তা না করে 'পালনে' পাঁয়তারা
আর 'বলনে' আগড় তাড়া ভেঙে আগে ভাগে—
ওরে আমার রামা শ্যামা যদু মধু
কে কোথায় আছিস—
আয় আয় ছুটে দাঁড়া।

তবে, কি আর বলব বল!
আমি যা দেখে গেলাম
জীবের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ এটা যেমন ঠিক
তেমন গুহ্যদ্বার নাভিমণ্ডল
এদের চিন্তা রয়েছে ধরা।
তার বাইরে আর কি ভাববে, কি ভাবছে।
আমার আশিস্ রেখে যাই
সবাই যেন মন সরিয়ে মন পায়।

এক তো 'স্পৃহার আকার' থেকে 'জাতিস্মরের' সৃষ্টি। আরো যুক্তি আছে—ঠাকুদ্দার জিনিস বাবার কাছে আসে, বাবার জিনিস চাপা পড়ে যায়, কিন্তু বাবার জিনিস আমি পেয়ে যাই। বাবা ফুটাতে পারে নি আমি ফুটিয়েছি। এ রকম অনেক নজির মেলে। বাপ যা ছেলে সবসময় তা হয় না। কিন্তু নাতির সঙ্গে ঠাকুদ্দার অনেক মিল পাওয়া যায়। ঠাকুদ্দার জিনিস বাপের মধ্যে সুপ্ত ছিল. নাতি এসে তা ব্যক্ত করল।

আবার এক যুক্তি—হয়ত স্নায়ুর মধ্যে আসে নি। 'স্পৃহার আকারে'র প্রশ্ন উঠছে না, কিন্তু এমন কতকগুলো জিনিস জাবন্ত দেখা যায়, মনে হয়, যেন দেখেছি, পরিচিত। এত সেটা নিজের মধ্যে

সরগড় থাকে জানা থাকে যে খুব চেনা চেনা মনে হয়—খুব 'এনার্জি' ব্রেন হলে। একটা অঙ্ক একজন খুব সহজেই ধরে ফেলে, কিন্তু ক্লাসে সকলে বুঝতে হয়ত হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে।

এই সব নানা যুক্তি ও উপলব্ধির মূলে আমি জন্মান্তর বলে কিছু পাচ্ছি না। আর একটা জায়গায় আমি উত্তর পাই। এই যে ভূত দেখতাম আগে, তা ভূত তো উবে গেল। আমার ধ্যানেই তো ভূত পেয়েছি এক সময়। যখন আরো গভীর বিচারে বসলাম, গভীর জ্ঞানী হলাম তখন কোথায় গেল ? ছিলই যদি গেল কোথায়, আছেই যদি আর দেখা নেই কেন তার ?

আর জন্মান্তর আমি দেখেছি, মানুষ মরে টিকটিকি হওয়া, সোল মাছ হওয়া, কুমীর হওয়া ইত্যাদি।—'দেখি, তুমি কোথায় উঠতে চাও।' যখন আমার এ সবে মন ভরে নি তখন সব সরে গেল। একটা করে ছায়া আসবে তো—ধাপকে ধাপ—এক লক্ষ ন'টি ধাপ কি সোজায়। ঐখানে যেয়েই যদি আটকে গেলাম তাহলে আলবাত জন্মান্তর আছে বলে আমি বলে দিয়ে যাব।

এক লক্ষ ন'টি ধাপের শেষে কিছুই নেই। ঐজন্যই বলছে সাধনার শেষ নেই। যবে খোল ফেলবে তবে শেষ। তবে এমন একটা অবস্থা আছে যখন সিদ্ধিলাভ হয়ে যাবে যখন লোকশিক্ষাও চলবে এবং তোমার কাজও চলবে। একে একে সব গৌণ হয়ে যায়। তর-তর করে সব আয়ত্ত হয়ে যায়। সময় লাগে না।

মানুষ মাত্রেই জাতিস্মর। তবে সবাই ব্যক্ত করতে পারে না। মূলধন কম নিয়ে জন্মায়। তারপর যাও বা কেউ একটু আধটু বলতে পারবে, তা দিনের পর দিন তার নানা ভোগ ও ভাবনা বাড়তে থাকবে এবং ঐ আবছা আকার সম্পূর্ণ মুছে যাবে। তাই বা জাতিস্মর দেখা যায় ঐ অল্প বয়সে। অধিক বয়সে আর জাতিস্মর হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

তবে জাতিস্মর হলেই যে সে চিন্তাশীল গবেষক বা সূক্ষ্ম বুদ্ধি নিয়ে জন্মেছে, এমন কোন কথা নেই। তবে এইগুলি থাকলে তাকে পাঁচ

রকম ভাবতে বা বুঝতে সাহায্য করে। তবে তার দ্বারা জ্ঞানের রাজ্যে কিছু ভ্রান্তি বৈ আর কিছু বাড়তে পারে না।

কথাটা অতি সত্য, জাতিস্মর বোধ কারো কারো দীর্ঘকাল হয়ত বজায় থাকতে পারে। কিন্তু তাই নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখা এবং সার্থক উপলব্ধির মূলে প্রচলিত জাতিস্মর বাদের উপব বিস্তারিত বিপরীত ধাবায় বলে যাওয়া এ দুর্লভ। এই প্রথম বললে নিশ্চয় ভুল বলা হবে না।

['মা-মহাজ্ঞান, মন্দিরে মাতৃবেদীর দেওয়ালে একটি লেখা সবার মাথার উপর খাঁড়া হয়ে ঝুলছে—

তুমি কি ঈশ্বব চাও?
স্থায়ী, না অস্থায়ী?
না কি এখুনি?
স্থায়ী হলে মবে যাও,
অস্থায়ী হলে দাঁড়াও,
এখুনি হলে নিয়ে যাও।

জনৈক ভক্ত একদিন মন্দিবের প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে বার বার ছত্রগুলো চিবিয়ে পড়াব চেষ্টা করছিলেন। মোটামুটি 'এখুনি' এবং 'অস্থায়ী' প্রসঙ্গ জিভেব উপর নিয়ে বার কয়েক পাকালয়ে পেটে পুরে দিলেন। কিন্তু কিছুতেই যেন কাযদা করতে পারছিলেন না 'স্থায়ী' প্রসঙ্গটি। দাঁত বসাতে গিয়ে মাড়ি ঠেলে উবড়ে পড়ার উপক্রম হতে আমাব শরণাপন্ন হন।

হ্যাঁ, কথাটা ভুল কিছু নয়। মরেই যদি যাবে তাহলে ঈশ্বর লাভের প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর চিন্তা তো। তবে তার বোঝা উচিত ছিল, এ মরণ কার মৃত্যু-কামনা? খোলের অবসান, না খলের অসম্মান। স্পৃহার মান গেলে—মৃতপ্রায় পড়ে থাকলে, তবে তো পথ পাবে সেই মহাপ্রাণ। এমন কত কথাই তো ছুঁয়ে দিয়েছেন মা।

'মা-মহাজ্ঞান' সেই সন্ধ্যায় যথা নিয়মে লোক-শিক্ষারত, নিজ আসনে সৌম্য সমাসীন। আমি সরাসরি প্রশ্নটি আবারও নিবেদন করলাম তাঁর শ্রীচরণে। তিনি ভক্তটিকে 'অস্থায়ী' ও 'এখুনি' ধরে প্রশ্ন করায়, সে তার আমতা আমতা করতে থাকে। জননী তখন তাঁর সকল অজ্ঞতা ক্ষমার চোখে দেখে 'স্থায়ী'র বিচার ব্যাখ্যায় ধরলেং অনবদ্য গান।—]

যদি পাবি ওরে জন্মান্তরে
তবে লিখিলাম কেন—কেন আমি,
এ জনমে তোর ওরে এমন করে?
যদি পাবি ওরে জন্মান্তরে।
ওরে ভাবলি না কি তাই—
যখন রে তুই চলে যাবি
তোর সাথীরা সঙ্গে রবে—
রবে তারা রে সবাই—সবাই।
ওরে তাই লিখেছি এমন করে।

ফেলে চলে আয় রে ছুটে
মরে যাবি ওরে দৃষ্টিপাতে
এইখানেতে পুনর্জীবন
গড়বি রে তোর আপন হাতে।
আমি তাই লিখেছি
বুঝে দেখে।

ওরে অভাজন,
কেন রে তোর এমন মন!
ভাবলি না কি একটুখানি
যেথায় যাব রব আমি,
সঙ্গের সাথী হবে আমার—

আমার তারাই ত'জন
ওরে অভাজন।

কেমন করে যাবি রে মরে
দেখাব এখন।
আয় ছুটে আয়—আয়
অদল-বদল করব হেথায়
ও তোর এই তো জীবন
এই তো জীবন।

যারে পেলি না তুই ইহজীবনে,
কেন অমন করে ভ্রান্তি এনে
শান্তি পাস রে মনে—
কেন শান্তি পাস রে মনে?
"পাব আমি পাব জানি
আমার জন্মান্তর—
জন্মান্তর যেখানে।"

জনমেতে নে রে চেয়ে
কেন চাস রে তুই পিছন ফিরে
ওরে মরণে—ওরে মরণে?
জন্মান্তরে পাব আমি!
দেখি এখন হেথায়।
নয় তো আমার এ ধন এখন
আমি চাইব কেমনে!

ওরে—ওরে মূর্খ মানব—
মানবজন,

বলি তোদের একটুখানি,
জনমেতে আপন করে—আপন ঘরে
বুঝে পড়ে কর রে বিতরণ।
ওরে মানবজন।

পারবি না যা এখন জানি,
জানি এ তো তোদের বেগে কাটা।
শান্তি খুঁজিস—
শান্তি খুঁজিস মনের কোণে,
যখন হোক যাব আপনি।
এ জনমে হায় যদিও বা না মেলায়,
তবে নেব গিয়ে—
নেব গিয়ে আমার বলে
আমার—আমার ধন জানি।

বুঝে পড়ে নে রে এখন,
লিখেছি আমি।
ওরে খুঁজে পড়ে দেখলে পরে
মিলাবে তোর আপন ঘরে।
কে বলে জন্মান্তর
কোথায় কতখানি!

ওরে আহাম্মক মানব,
একবার নয়ন মুছে চা' দেখি রে
পড়বে মনে সবখানি।
লিখেছি তাই রে আমি।

প্রসাদ—তাহলে কি মা জন্মান্তর বলে কিছু নেই ?

মা-মহাজ্ঞান—জন্মান্তর বলে কিছু পেলাম না আমি, কিছু পেলাম না ঘেঁটে। জন্মান্তর আমি যেখানে পেলাম সেখানে বলছে—যে রইল—যে জীবিত রইল তার অন্তরের মধ্যে যে জিনিসটা বিরাজ করতে রইল সেইটার দ্বারাতে, যে চলে গেল তাকে সে, যতরকম রূপে হোক দেখতে পাচ্ছে। বহুরূপ নিয়ে সে ঘুরছে। কিন্তু যে চলে গেল তার আর কোন পাত্তা নেই। সে লয় হয়ে গেল। চিরকালের মত।

যেমন একটা প্রদীপ জ্বাল--এক প্রদীপ তেল ও একটা সলতে দিয়েছে। মালিক দাঁড়িয়ে থাক। সলতে পুড়ে আসবে যেটুকু পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে সেটা লয় হয়ে যাচ্ছে। তার কোন হিসাব থাকছে না আর। কিন্তু এখানে যে শেষ হচ্ছে আর একজন জোগান দিচ্ছে ঠিক। তেল আর সলতে জোগান দিয়ে যাচ্ছে। এ ঠিক এর কাজে আছে। আর ওদিকে যে শেষ হচ্ছে ওর আর কোন হিসাব নেই, লয় হয়ে যাচ্ছে বলে। এইটিই বা জন্মান্তর বলতে।

প্রদীপের মুখে যেমন প্যাঁপড়গুলো উঠে কাল কাল—সেগুলো পড়ে গেলে যা হয় এই জন্মান্তরেও তাই হয় ছাখ। কিন্তু যে তেল দিচ্ছে সলতে দিচ্ছে সে ঠিকই আলো পেয়ে যাচ্ছে। সে ঠিক জোগান দিয়ে চলেছে। অতএব তুমি শেষ হয়ে যাবে। তুমি প্রদীপের প্যাঁপড় বলে শেষ হয়ে গেলে। তোমার জোগান দেবার লোক রয়ে গেল—রেখে গেলে—দেখবে ঠিক জোগান চলবে।

জন্মান্তর বলে কিছু পেলাম না।

মানুষ যতক্ষণ না শ্রেষ্ঠ হয় ততক্ষণ জন্মান্তর হবে তার—এ ঠিক নয়। মানুষ যতক্ষণ না শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে গিয়ে পৌছয় ততক্ষণ পর্যন্ত জন্মান্তর আছে তার কাছে। সে যখন শ্রেষ্ঠ মার্গে গিয়ে পৌছবে তখন সে বলে যাবে—জন্মান্তর বলে কিছু নেই। এবার তোমার কাজ—মনে কর তুমি সত্তর পঁচাত্তর বছরে যা করছিলে চলে গেলে। চলে গেলে মানেই তোমার কাজ হয়ে গেল—তোমার কাজ বাকী রইল। সব কাজ তোমার সারা হবার আগে তোমাকে চলে যেতে হয়েছে।

যেহেতু তোমার মেয়ের বিয়ে বাকী রয়েছে, ছেলের লেখাপড়া—সেটা কোন কথাই নয়। সেটা তোমাকে ধরে পাঁচজনে বলছে।—তার সব কাজ সারা হয় নি, সে তাই এসেছে, তাই দেখা দিচ্ছে সে তাই অমুকের পেটে জন্ম নিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। যা বলার তোমরা বলছ কিন্তু, সে তার শেষ হয়ে গেল।

প্রদীপে সমান তেল সলতের জোগান চলছে। যারা দিচ্ছে তারা দেখতে পাচ্ছে আলো। কিন্তু পাঁপড় যখন পুড়ে পড়ে যাচ্ছে তার আর কোন হিসাব নেই। অতএব কেউ পাঁচেই যাক কি পঞ্চাশেই বা একশ বছরেই মরুক—সব এক বিচার হবে।

প্রসাদ—তাহলে আগে যে মা বলছে স্পৃহার আকারের দরুন জন্মান্তর মানতে হয়।

মা-মহাজ্ঞান—হ্যাঁ। ঐখানেই জন্মান্তর মানতে হয়। সেইজন্য জন্মান্তর আছে জন্মান্তর নেই আমি দুটোই বলছি। শ্রেষ্ঠ মার্গে যতক্ষণ না পৌঁছচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত জন্মান্তর আছে। শ্রেষ্ঠ মার্গে গিয়ে সে ঘেঁটে দেখবে যে জন্মান্তর বলে যা কিছু সব ভুয়া। আমি নেড়ে চেড়ে ঘেঁটেঘুঁটে কিছুই পেলাম না।

তোমরা যে কেউ সকলে বলতে পার জন্মান্তর আছে। কিন্তু তোমাদের সঙ্গে সায় দিয়ে আমি শুধু মুচকি হাসব। বলব জন্মান্তর নেই। কিন্তু তোমাদের বিশ্বাসও ভেঙে দিয়ে যাব না। কেন না তাহলে তোমরা যা নিয়ে বুক ভরেছিলে, হঠাৎ তা ভুয়া বলে জানলে, তোমাদের বুক ফাঁকা হয়ে যাবে। অতএব তোমরা যা নিয়ে থাকতে ভালবাস তাই নিয়ে থাক। খামাকা অশান্তি করে কি লাভ।

তোমাকে একটা মাদুলি দিয়েছি। তোমার বাড়ির দুয়োরে ভূত আছে একটি। তুমি সেই মাদুলি ধরে পেরোও ঘরকে। যদি তোমাকে বলি, মাদুলির দ্বারায় ভূত আটকায় না, তাহলে তুমি ঐখানেই মূর্ছা যাও। তোমাকে উল্টে বললুম ভূত আছে যখন—মাদুলিতে ওষুধ আছে, ভূত আসতে পারবে না। তুমি ধরে পেরিয়ে

গেলে। বুঝেছ ?

প্রসাদ—শ্রেষ্ঠ মার্গে গেলে তো সে নেই—

মা-মহাজ্ঞান—তখন 'সে' নেই নয়, তখন তুমি বলবে—না জিনিসটাই নেই। সে চিরকালই নেই। সে আজ আছে কাল নেই, তা নয়; সে কোনকালেই নেই। এখন কতকগুলি লোক ধরছে 'সে আছে'। তোমরা দলে ভারি।

সবাই বলছ জন্মান্তর আছে; আমি একলাই বলছি নেই। অতএব তোমাদের সায়ে আমাকে সায় দিতে হবে—হ্যাঁ, তোমরা 'আছে' বলছ—তবে তোমাদের এই আছে বলাটাকে এত বেশী বলো না। ভুত আছে ঠিক কথাই। কিন্তু তাই বলে তোমার শোয়ার ঘরে খাটের উপরে নেই। ভুত আছে, তাই বলে গোয়ালে গরুর বাঁটে মুখ দিয়ে দুধ টানে না। ভুত আছে, নিম গাছে। হা হা হা হা।

যদি একবারেই বলা যায় ভুত নেই, তুমি আকাশ থেকে পড়ে যাবে—নেই মানে ? আমি চাক্ষুষ তাকে দেখেছি। সে দাঁড়িয়েছিল, আমাকে গিলে খেতে আসছিল, চোখ বুজে দিতেই হঠাৎ কি জানি কোথায় মিলিয়ে গেল। সেইজন্য বলতে হবে—আছে বলে শোয়ার ঘরে রান্না ঘরে ? খুঁজে দেখলে নিমগাছের ডালে বাবলা তলায় দু একটা পাওয়া যেতে পারে।

জন্মান্তর ঘাঁটলে কিচ্ছু পাওয়া যায় না।

'ভেপার' থেকে সবের সৃষ্টি। যদি একটা বাষ্প জাতীয় কিছু ধর তাহলে তার দ্বারাতে একটা মেশিন চলছে। এটা একটা মেশিন। ধর না কেন ঐটি আয়ু, প্রাণবায়ু—একটা কিছু। বাতাসে বাতাস মিলিয়ে যায় সেইরকম খোল পড়ে গেলেই সেও শূন্যে মিলিয়ে যায়, ধরতে দোষ কি! আয়ু বলে আলাদা কিছু আছে কি ?

যখন শিশু সাত মাসের পেটে তখন থেকে তার স্পন্দন শুরু হচ্ছে। তখনই তার মায়ের শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারায় তার শ্বাস-প্রশ্বাস শুরু হয়ে গেল। তখন সেই শিশু জন্মলাভের পর ধীরে ধীরে সময় পার করে বৃদ্ধ অতি বৃদ্ধ হল তখন স্বাভাবিক নিয়মে একদিন মেশিন অচল হয়ে

গেল—প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। বাতাসে বাষ্পে মিলে গেল। ফুরিয়ে গেল, তার আর কি-টা থাকতে পারে।

আমি কিন্তু কিছু খুঁজে পাই নি। এর আগে যদি কেউ বলে থাকে বলেছে বা আবার যদি কেউ বলে তো বলবে, আমি তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখলাম কিছু পেলাম না।

মা-মহাজ্ঞান—কি বলতে বললি, জন্ম রহস্য নিয়ে?

প্রসাদ—হ্যাঁ, সৃষ্টি রহস্য নিয়ে।

মা-মহাজ্ঞান—ও সৃষ্টির রহস্য নিয়ে। আমার সৃষ্টি রহস্য। সৃষ্টি রহস্য—কথায় যা বলা হয়েছে।

প্রসাদ—তবে যদি বল, তাহলে সে লোভটাও আছে। সৃষ্টি রহস্য এবং তোমার সৃষ্টি রহস্য।

মা-মহাজ্ঞান—না, সৃষ্টি রহস্য যা তাতে, কথাতেই ভাল ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। এটা গানের দ্বারাতে ব্যক্ত করলে কে কতটুকুন বুঝতে পারবে বা উপলব্ধি করতে পারবে! সেইজন্য যেটা গানের মধ্যে বলার নয় সেটা আমি কথাতেই বলছি। বলেছি। তবে একটা কি যে, সুরে তাকে শুনব। সুরের দ্বারায় শুনব! তাছাড়া এই কথাগুলোই তো।

মন মন রে আমার,
আমি কেমন করে করব সাধন,
বাঁধবি কখন।
মন মন রে আমার
আমার বলে জানি রে তোরে।
ও মন, তবে থাকিস না তুই
সর্ব সময় আমার কাছে—
থাকিস কতক্ষণ!
মন মন রে আমার।

যাকে আমার বলে বাঁধি ঘরে
জানি সেজন আমার বলে।
ও মন—মন রে।
যখন তোকে ভাবি আমি
এবার লাগাই আমার কাজে,
ও মন, তুই তখন কোথায়
যাস রে চলে—
কোথায় করিস ভ্রমণ।
মন মন রে আমার।

যাক যাক—
এই মনে হয় শেষে শুধু।
আমি যেমন করে হোক না
বাঁধি এরে যতটুকু
আমি লাগাম ধরে থাকলে পরে জন্মান্তরে-
আমি জন্মান্তরে করব উশুল
উশুল বাকীটুকু।
ও মন মন
তখন আবার আরো ভাবি—
এ যে এমন করে
বধলি রে তুই,
আমি জন্মান্তরে গিয়ে তোরে
বধিব জানবি তোয়।
ভাবিস নারে বলিস নারে
অকালে শুধু।
মন মন রে আমার।

আমি এই ভেবে তাই
করি সাধনা।
যতটুকুই হোক না আমার
আমি—আমি শোধ নেবো তার,
ছাড়ব না
কভু কখনো এক আনা।

মন রে, মন
এই ভেবে তাই
আমি শান্তি যে পাই—পাই।
সাধনার ধাপে ধাপে
কতদূরে নাগাল আছে
কভু ভাবি নাই—
ভাবি নাই।

মন রে,
আজ যারে তুই দিলি রে ফাঁকি,
ছুটে চলিস শুধু রে তুই
অদূর দেশে
ও উড়ো পাখি।
থাম্ রে তুই থাম না
আমি দেব শিকল পায়ে যখন,
তুই বারণ করবি আমায়
আমি শুনব না আমি শুনব না।

করব মনে তখন জানি,
আমার আগের আছে সাধনা।
ও পাখি, এমনি করে কাঁদিয়েছিলি,

তাই তো তোরে কৈশোরেতে দিয়ে শিকল-
শিকল দিয়ে বেঁধে—বেঁধে রাখি।
মন, মন রে আমার।

আমি এই শান্তি ভরে
ওরে যাই নিদ্রা ঘোরে।
হায় রে—হায় রে মন—মন
এ কি উন্মাদনা,
না কি অঘটন?
ঘটল আমার—আমারই এখন।
মন মন রে।

যেন কেউ এসে,
বলে চুপি-চুপি সে—
কারে বাঁধবে শুনি শিকল টানি?
কোথায় তুমি
কোথায় তোমার সাধনা শুনি?
কে তুমি বাঁধবে তারে
দেখাও আগে আমায় কেবল—কেবল,
কারই মাঝে উন্মাদনা
উৎপাত সে সৃষ্টি—সৃষ্টি করে,
কে সে মন, শুনি?
হায় আমি চমকিনু দেখে
একি আমার আঁখিতে এসে
আমারে জাগায়—জাগায়!
আমি চঞ্চল হয়ে
চারিদিকে চেয়ে দেখিনু—
দেখিনু কোথায়?

সমুখে আমার পড়ে আছে তাই।
একি, দেখে মনে হয়
চিনি—চিনি যে ইহায়।
কবে যেন তারে দেখেছিনু—দেখেছিনু ?
পরিচয়—পরিচয় জেগেছে আমার—
আমার অন্তরে।

হায় একি হল!
তবে কি সাধনা ?
জানি না জানি না।
তবে কেমনে তারে জানা যায় ?
কে তুমি জাগালে
ওগো আমারে কাঁদালে,
নূতন পথের নূতন করে
সন্ধান—সন্ধান আনালে ?

দেখে মনে হয়,
যা কিছু করেছি আমি
কিছু নয় কিছু নয়।
আমারই মনের তারে
আমারই মনের ঘোরে—
আমারই মনের ঘরে।
সে যে বাঁধা রয়।
সে যে বাঁধা রয়।

হুঁ হুঁ হুঁ হুঁঃ। আর বলব? (হাসি)

আচ্ছা, দেখ একটা কথা বলছি আমি। আমি না একটি মানুষ, উঁ? অতি ক্ষুদ্র একটি মানুষ। কেন? না, বৃহৎ এমন কিছু আমি নয়। মানুষ—মানুষের মধ্যেই আমি ক্ষুদ্র। বুঝতে পারলি?

আচ্ছা। হঠাৎ আমার যেন কেমন মনে জাগল, ঈশ্বর। সকলের কাছে শুনি, ঈশ্বর আছে। দেবতা আছে ভগবান আছে। আচ্ছা, সেই ভগবান কেমন?

—'হ্যাঁ গো, ভগবান কেমন গো?

—হুঁ হুঁঃ ভগবান কেমন? তা তাকে সাধনা করলেই পাওয়া যায়।

—ও তাই না কি, সাধনা! হ্যাঁ গো, সে আবার কেমন গো?

—তা জানি না।

—বলো না। কেমন গো, দেখতে কেমন দেখায়?

(হাসি)। দয়া হল।

আর একজন ফিরে উত্তর দিচ্ছে—তাকে কি আর সব সময় বলা যায় গো! তাকে বলা যায় না। তাকে সাধনা করতে হয়।

—সাধনা কেমন করে করব গো? আমি তো তা জানি না সাধনা করতে।

—তা জান না? তা বলি, শোন।

বলে সাধনার পদ্ধতি সে বলতে শুরু করল।

—সাধনার পদ্ধতিটা কি? না, এই আগেই নিয়ে আসবে তুমি একটি মূর্তি।

—কি মূর্তি আনব গো?

—আচ্ছা তোমার যেটা ভালো লাগে।

আচ্ছা, তাই ভাল, আমাব যেটা আমার ভাল লাগে।—হ্যাঁ গো, আমার কেমন ভাল লাগে বল তো? আমি তো তা বুঝিনি।

—আচ্ছা তোমার তোমাকে ভাল লাগে?

—হ্যাঁ, আমাকে ভালো লাগে।

—আচ্ছা তাহলে তোমারই মতন মূর্তি আনবে। (হাসি)

আচ্ছা, তাই। আনল।

—আচ্ছা তারপরে কি করব?

—তারপরে? নিয়ে এসো উপাচার।

—উপাচারটা কি গো?

—আঃ, উপাচার আবার বোঝ না! এ তুমি না বুঝলে তুমি আর সাধনা করে কি পাবে! সামান্য কথা বুঝতে পার না, উপাচার! ফুল চন্দন তুলসী দূর্বা—আর কি! ঝাঁঝ ঘণ্টা ঢাক ধূপ ধুনা। আরো—সন্দেশ, চাঁদমালা—আরো আরো আরো।

—আঃ! অত রেগে যাচ্ছ কেন! বল না, ভাল করে বল না। এত রেগে যাচ্ছ কেন? আমি তাই শুনতে চাচ্ছি।

—এই তো বললাম, এই রকম করে সাধনা।

—তাই করলাম। এতো তো আমি পারব না।

—তবে জানতে চাইলে কেন এতো?

—না, আমি জানতে চাইলাম কোথায় পাব?

হ্যাঁ, তা যেটা আমি পারব সেইটেই আমি জোগাড় করলাম। কেন, সব তো পারব না। এ্যাঁ, ঢাকির কাছে গেলে ঢাকি আমাকে তাড়িয়ে দিল। চাঁদমালা—আমি তো তৈরি করতে জানি না। এ্যাঁ, তাহলে কিনতে হবে। পয়সা কোথায় পাব? কে দেবে, কেন দেবে?

—ও।

এই রকম বিনিময় 'ই' সে—আচ্ছা হল। উহুঁ, ভগবান তো নেই। তাহলে?

—হ্যাঁ গো, কৈ তা তো পেলাম না ভগবানকে।

—ঐ তো পেয়েছ।

—কৈ!

—ঐ তো বেল।

—না, ভগবান তো কথা বলে নি।

—হুঁঃ আবার আর একজন, কথা বলবে!

—তাহলে কথা কি করে বলে বল ?

আচ্ছা, এরকম ধরনের গল্প বললে অনেক দেরী হয়ে যায়, না ? এটা বাজে সময় নষ্ট করা। তবুও তোমাদের বোঝানো হচ্ছে। যাক গে, সংক্ষেপে আরো চেষ্টা করি তাড়াতাড়ি এটা শেষ করবার জন্যে।

তাহলে কি করা যায় ?

—হুঁঃ। অমন নয় অমন নয়। ত্যাগ তিতিক্ষা আনো।

—ত্যাগ তিতিক্ষা! সেটা তো আবার বুঝিনি। ত্যাগ আবার কি—তিতিক্ষা ?

—ত্যাগের প্রতি ধিকার নিয়ে এসো।

—ত্যাগের প্রতি ধিকার! আমি যা খাইনি তা ঘেন্না করব! যা পরি নি, তা ঘেন্না করব! তা কি করে করব! এ্যাঁ ? ত্যাগ—তিতিক্ষা ? তা তো হয় না।

—যাও তোমার সঙ্গে বকতে পারব না।

প্রসাদ—মা, ত্যাগের উপর তিতিক্ষা, না ভোগের উপর তিতিক্ষা ?

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মা-মহাজ্ঞান তাঁর ধারায় বলে চলেন।

এই তো, তখন মনে জাগল—ত্যাগের তিতিক্ষা ? ত্যাগ করব, তার তিতিক্ষার কি!

থাম না, আসছি। এ বুঝিনি তো। (হাসি)।

তা ত্যাগের তিতিক্ষা ?

—জানিনি যাও। ত্যাগ তিতিক্ষা তোমায় বললাম, হুঁঃ! এটুকুও বুঝে মরো নি, তা আবার সাধনা করবে! জানো, সে কি জিনিস ?

—হ্যাঁ গো, কেমন গো ?

—যাও যাও, কিছু বোঝে না।

তাড়িয়ে দিল।

তাই তো, ত্যাগ আবার তিতিক্ষা! নিয়ে এলাম একটা খাদ্য খুঁজে কিছু। আচ্ছা, এটা আমি খাব না। না না, আমি খাব না। খাব না টা ত্যাগ। ছিঃ, ঘেন্না ঘেন্না! তিতিক্ষা—ছি ছি ছিঃ। কৈ, তা তো আমার মনে আসছে না ? খাবো না, উঁ ?

আবার নিয়ে এলাম। তাহলে, ত্যাগের প্রতি তিতিক্ষা ?

হ্যাঁ হয়। ত্যাগের প্রতিও তিতিক্ষা হয়। এর উত্তর অনেক আছে আবার। জানো, ত্যাগের তিতিক্ষা, সেটা আবার বলতে হবে।

যাক, এটাতে মিলাতে পারলাম নি। কিন্তু ত্যাগের তিতিক্ষা আছে। যে প্রশ্ন আমাকে করলে তুমি তার উত্তর হচ্ছে—ত্যাগের তিতিক্ষা আছে। তার উত্তর আমি দিতে পারব।

যাক গে, তা তো হল, ত্যাগ তিতিক্ষা ?

—হুঁঃ, অন্তরে ডাক অন্তরে।

—সে আবার কি জিনিস, অন্তর ? তাও করলাম ? অন্তরেই ডাকতে গেলাম। অন্তরে ?

—হুঁঃ অন্তর বোঝ না।

—না, তা তো বুঝিনি।

—এই যেমন করে অন্তরে এটা চাও ওটা চাও সেটা চাও, তেমনি ভগবানকে চাও।

তাই বলেই চাইতে এলাম, অন্তরে। কিন্তু সে শুনবে কেন ? আমি বলছি—ভগবান, ও ভগবান—ভগবান তোমাকে আমার চাই।

—মা জল দাও না।

—ওমা শুনেছ, আমার না এ হয়েছে।

—ভগবান, ভগবান, ও ভগবান, কথা বল না।

—এই শুনছো এই দেখো।

সেও তো আবার গেছে। এরপর অনেক ফেকড়া আছে।

তারপরে ? যাই হোক মুকালুম আর একটু। এই সব নানা ধরনের হল। এটা নিয়ে এই ছুঁলে পরেই তোমরা আমাকে পাবে। কথায় অনেক কথা—বুঝিয়ে দেব। বুঝলে ? নানা রকম। আমি শুধু ছুঁয়ে ছুঁয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি। কেন না, গল্প—অনেক বড় গল্প হয়ে যায়। এত গল্প—

আচ্ছা তখন—যে প্রশ্নটা আমাদের মনে ছিল, অবশ্য আমাদের মনে—হুঁ, আমাদের মনে—আচ্ছা আমার মনেই ছিল। এঁ্যা—যাক গে।

যখন সবকে সরিয়ে 'ভগবান ভগবান' বললাম—কিন্তু ছেলে নেই, ছেলের আকার। স্বামী নেই স্বামীর আকার। হ্যাঁ, আকার! এই যে আকার, সরাও। আকারকেও সরালাম।

আচ্ছা, তাহলে ? এবার—এবার কি আসতে পারে বল দেখিনি ? এবার আসছে—স্বামীর আকার নেই, কিন্তু কি যেন একটা আকারের মত। আকারের মত—ছেলে। আকারের মত। সব সব—সব সব আকারের মত, আকারের মত—আকার না, আকার না। উঃ এ তো পারছি না। ভগবান।

যাক, এবার স্থির করে নিলাম যে, আচ্ছাঃ, জন্মান্তরে পাওয়া যাবে। এ্যাঁ, তুমি যাবে কোথাকে ? মন, কিছুতেই তুমি ঘরে থাকতে চাচ্ছ না। এই মনে করছি যে, চরণে ফুল দেবই। কথা বলবই। উঃ, চরণে ফুল। না না সে ফুল—সেই যে দেখ ভাবো, কোথায় যাচ্ছে ফুল। কোথায় ফুল যাচ্ছে!

না না না—না, কেউ সে জানতে পারছে না। আমি পারছি। উঃ! না না না, পারলাম না, পারলাম না। এসেছে, এসেছে এতক্ষণে। পারলাম না। কিন্তু এখন ? এখন তার কর্ম সেরে শেষ করে এসেছে। যখন চেয়েছিলাম—যেখানে চেয়েছিলাম সেখানে পাইনি। এখন এসেছে। এখন। এখন তো আমার সেই আবেগ আর নেই।

এখন ? হ্যাঁ, চরণে দেব। আসুন না আমার কাছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কত ভালো কি সুন্দর।

কিন্তু কৈ—কৈ সে সুন্দর—কৈ না না। না না না—হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে হচ্ছে যেন আসবে। আসবে। হ্যাঁ, এবার পাব। পাব।

হ্যাঁ। না। না না, হতে পারে না। হতে পারে না। না। ঐ তো ঐ তো।

এ দেখেছ ? দেখেছ মনের অবস্থাটা—চিন্তা করতে পারছ ? না না না। দেখো দেখো দেখো, চিন্তা কর চিন্তা কর। মনের মধ্যেই। দেখো দেখো দুটো কি ভাবে শুরু করেছে। স্পৃহা। স্পৃহা নিস্পৃহা দুজনে যুদ্ধ শুরু করেছে। নিস্পৃহা—নিস্পৃহা, নিঃস্বার্থ সাধনা। স্পৃহা—স্পৃহার

সাধনা। সাধনা—স্বার্থ স্বার্থ। দুয়েই চূড়ান্ত সাধনা শুরু করেছে। তাহলে ?

তাহলে জন্মান্তর। জন্মান্তর—এ স্বীকার করতেই হবে। না হলে পেতে পারি না আমি। জন্মান্তর। হ্যাঁঃ। যাক শান্তি।

হুঁ এবার শান্তি।

তবে আর কি। সাধনা—জন্ম-জন্মান্তর ধরে তাকে পাওয়া যেতে পারে। পাওয়া যাবে। কেন যাবে না ?

মনে কর তুমি, আজকে—আচ্ছা অগে বল, কত মাইল রাস্তা যাবে তুমি ? ধর তুমি একটা বিশ মাইল রাস্তা যাবে। আচ্ছা, বিশ মাইলের মধ্যে মনে কর তুমি কোন প্রকারে দশ মাইল রাস্তা আগিয়েছ। তাহলে, আর কত থাকে তোমার ? আর থাকে তোমার দশ মাইল। এ্যাঁ ? আচ্ছা থাক। পরে এসে আমি সে দশ মাইল যাব। পরে এসে যাব—এই নিশ্চিন্ত। পরম নিশ্চিন্তে সেই দশ মাইল রাস্তা চলছ। উঁ ?

হঠাৎ একদিন দেখলে কি, যে দশ মাইল রাস্তা তুমি চিহ্ন দিয়ে এসেছিলে—এই দশ মাইল পর্যন্ত আমার যাওয়া, তুমি সে দশ মাইলের উত্তর আর কোন দিনই পেলে না। যখনই তুমি হিসাব করছ, সেই প্রথম থেকে তোমার দশ মাইলই হচ্ছে।

দশ মাইল রেখে গেছ ? কে—কে রেখে গেছে ? কে সে হ্যাঁ হ্যাঁঃ ? কোথায় ? সে কি !

(হাসি) বুঝ ?

তার মানে ? তার মানে ?

—মানে ? কোথায় ? এবার মানে চিন্তা কর তো।

সামনে তোমার যে হাতীটা দেখতে পাচ্ছ—হাতীর সমুখে ধর—তার খোরাক কি ? উঁ ? তুমি ধরলে তার খোরাক। কিছুদিন পরে সে হাতী সেখান থেকে নিশ্চিহ্ন, নেই। কেন ? না, হাতীটার সব চামড়াগুলো ঢিলা হয়ে গেছিল। সে যদি—মানে, পাঁচ পা রাস্তা যেতে তার এক ঘণ্টা সময় লাগত। কেন বল তো ? সে বৃদ্ধ হয়ে

পড়েছিলো। খোল। করতে করতে দেখা গেল সেখান থেকে সে নিশ্চিহ্ন।

আচ্ছা, সে জায়গায় দেখা যাচ্ছে—একটা গরু। উঁ? এবার দেখো। তার খোঁরাক কি? তুমি দেখলে, হাতীর যা খোরাক ছিল গরুর তা খোরাক তো নয়। তাহলে? তাহলে তুমি কি করে সে রাস্তার চিহ্ন রেখে গেছ, রাস্তাতে যেতে পারবে?

—তাহলে?

—কেন, তুমি কি করে বুঝলে, এই তার খোরাক?

এবার তাকে বিচার কর। গরু কি চাচ্ছে, হাতী কি চাচ্ছে? উঁ? এবার দেখো একটা কথা বিচার করে। হাতী যা চাচ্ছে, ঠিক গরুও তাই চাচ্ছে। সম্পূর্ণ মিল নিয়ে এসো। পাবে না। আচ্ছা, এবার বল—হাতীর স্থানে হাতীকেই দাঁড় করাও। তুমি বলবে হাতীর স্থানে গরু এলো কেন?

মানুষ মরে মানুষই হবে—তাই তোমার জন্মান্তর মনে হয়েছিলো। আমি এ জন্মে রেখে গেলাম, পর জন্মে পাব। আমি মানুষ হব। তুমি কি করে জেনেছিলে তুমি মানুষই হবে? উঁ?

আমি তোমার পরের উত্তর দিচ্ছি—হাতীর স্থানে হাতী। তুমি আগে বল—আমাকে উত্তর দাও, তুমি মানুষই হবে, এঁ্যা?

যখন যে খাঁচাতে দরকার তখনই সেই খাঁচাতে সেই পাখিকেই রাখা হয়। খাঁচা তৈরি করে কে? একজন কারিগর। উঁ? পাখি সে উড়ে বেড়ায়। তাকে আবার একজন কেউ ধরে। ধরে নিয়ে এসে তার পছন্দসই খাঁচাতে দিতে পারে কি? একটি খাঁচা নিয়ে এসে দেয় সে। সে খাঁচা তাকে 'স্যুট' করল কি করল নি, পরে তাকে মানিয়ে নিতে হবে। পরে তাকে মানিয়ে নিতে হবে।

এটা হয়তো উদাহরণে তোমরা খুব বুঝতে পারবে না। কিন্তু খুব বুঝবার আছে খুব চিন্তা করবার আছে। এ সব প্রত্যেকটা জিনিস সাধনার লাইন উপলব্ধির লাইন। সেই জন্যে কেউ মোটামুটি তর্ক করতে এসো না। কেউ তর্ক করতে চাইবে না। শুধু উপলব্ধি করতে চাইবে।

আচ্ছা, এবার বল—তুমি ধরে নিয়েছ তুমি মানুষই হবে—তুমি ধরে নিয়েছ—তুমি তুমি, ধরে নিয়েছ। তুমি মানুষই হবে। আচ্ছা, তুমি এ কথা পেলে কোথা থেকে ? তোমার কল্পনা এঁ্যা ? তোমার কল্পনা। আচ্ছা, এবার তোমার 'কল্পনা' চিন্তা কর। তোমার জাতকে চিন্তা কর। তোমার জাত থেকে এই কল্পনাটা এসেছে। আর কাউকে চিন্তা করলে পাবে কি তুমি ? তা পাবে না। কিন্তু তোমার জাতকে চিন্তা করলেই তুমি পাবে।

আচ্ছা তাহলে বুঝে দেখো যে, তুমি মানুষ হলে না। তুমি মানুষ হলে না। তাহলে তোমার আর দশ মাইল পথ যাওয়া হবে কি করে ? উঁ ? তুমি যা করে গেলে তোমার সেইটেই করা হল। পরে, রেখে গেছ, উঁ ? তুমি মানুষই হলে। তুমি মানুষই হলে, এঁ্যা ?

হাতী আর গরু—অনেকটা প্রায় একই রকম। অনেকটা একই রকম। পশু দুটাই মানুষ দুটাই। কিন্তু দুজনের স্বভাব একই রকম নয়। অনেক বিষয়েই হয়তো মিল পাবে। কিন্তু অনেক বিষয়ে মিল পাবে না।

তাহলে ? সেই মানুষ হয়েই যে তুমি পেলে—তাহলে তোমার চিহ্ন তুমি খুঁজে বের কর। উঁ ?

একটা সামান্য হাওয়াকে নিয়ে এত চিন্তার কি আছে! এঁ্যা ? এবারে হাওয়ার স্থিতিকে চিন্তা কর। অবস্থানকে চিন্তা কর। ক্ষেত্রকে চিন্তা কর। উঁ ? হাওয়াকে নিয়ে চিন্তা করো নি। তাহলে ভুল করবে।

তাহলে ? তাহলে ?

তাই বলি ওরে আমি
যদি বাঁধবি রে মন
তবে এখুনি কর সাধনা।
তেমনি করে
তোর মনের আগুন মনেরই গুণ
দিকে দিকে রবে পড়ে।

ওরে কেন অমন করে ভেবে
শান্তি পাবার লোভে করিস সাধনা—
ওরে করিস সাধনা ?
ধাপে ধাপে তাই এখুনি রে আয়।
কোথায় রে তোর চিহ্ন রবে
কোথায় রবি,
ভাবিবে না—ভাবিবে না কেউ—
কেউ তাই।
ওরে আয় ওরে আয়।

যেইখানেতে যাবে সেজন
সে তো নয় রে বাঁধা কারোর কখন।
খেলবে খেলা এমনি করে
খেলা ঘরের সৃষ্টি বলে।
আছিস রে তুই এখন যেমন
তেমনি ভেবে আয় রে চলে।

কখন রে সে তরু ছায়া,
কখন রে সে বনলতা,
কখন রে সে কোথায় আছে,
কে জানে কে চিনে তার ঠিকানা।
কখন আবার পশু—পশু সেজন
কখন মানব—অতি মানব
করবে বিরাজ সবার মাঝে।
জানবি তোরা বলবি ওরে
এই বিধাতার সৃষ্টি—সৃষ্টি জানি,
এ তো বিধির লিখন।

ওরে ওরে
কেন বাষ্প নিয়ে শুনি
এত কানাকানি!
আছিস এখন—এখন যেমন
তেমনি করে ভাব রে শুধু—শুধু।
যারে জানিস নি
কেন তারে টেনে ভ্রান্তি এনে,
শান্তি পাস রে—
শান্তি পাস রে মনে শুনি?

তাই তো বলি
সব সাধনা দে রে ফেলে।
সাধনা—সাধনা—সাধনা,
তোমায় কোটি প্রণাম জানাই
জানাই আমি—আমি।
জ্ঞানের রাস্তায় দাও গো যেতে
আমায় জ্ঞানের রাস্তায় দাও গো যেতে
আমি মেলি আমার নয়ন দু'খানা।
সাধনা—সাধনা।

শুধু করব বিচার
আমি মানব—মানব, ক্ষুদ্র জেনে—জেনে,
কেমন করে পারি ছুটতে।
সেই—সেই দিগন্তে
আছে বলে জ্ঞান ভাণ্ড—
জ্ঞান ভাণ্ড।
বিচার—বিচার আমার—
আমার—আমারই বৈঠকখানা।
সাধনা—সাধনা।

সবের সমাধান শান্তিময়

[যত অশান্তি সমস্যায়। সমস্যার শেষ নেই। সমস্যা সংসারে সমস্যা সন্ন্যাসে। সমস্যা দৈনন্দিন জীবনে সমস্যা মহ প্রস্থানে। তবে জন্ম নিয়ে যত সমস্যা, মৃত্যুর পরে কি কিছু নয় ?

'জন্মান্তর আছে' মানলে অবশ্য উভয় ক্ষেত্রে বিস্তর সমস্যা, মীমাংসা না পেয়ে, আবহমানকাল ধরে অন্ধকারে খাবি খায়। তবে 'মা-মহাজ্ঞান' প্রদর্শিত পথে, 'জন্মান্তর নেই' সার-সিদ্ধান্তে আপনাকে স্থিত অনুভব করলে, এই যা সত্য উপলব্ধি হয়—সমস্যা জন্মেও নেই সমস্যা মৃত্যুতেও নেই। জন্ম মৃত্যু উভয়ই খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। সে সম্পর্কে ইতিমধ্যে আমরা বিস্তারিত অবগত হয়েছি।

কিন্তু কি আশ্চর্য, সেই একান্ত স্বাভাবিকতার ফেরে সুস্থ পা ফেলার অবকাশ মানুষমাত্রে এক জীবনেই পেতে পারে। আমাদেরই আছে যোগ্যতা, মহাজ্ঞান ও মহাশক্তির ভাবরূপ হৃদয়ঙ্গম করার। জড় জীব সকলকে পরিচালিত করেন কে, কোথায় তাঁর অবস্থান, কবে কখন কোন দিগন্তে তিনি পরম সক্ষম বলে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন —ইত্যাদি অসংখ্য প্রশ্নে মন আন্দোলিত হয়।

এখানে মাত্র কটি নিবেদন করে, যখন যেমন বুঝে পেয়েছি 'মা-মহাজ্ঞান' ভাবরূপ, তাই তুলে ধরলাম। এই ক্ষুদ্র তুচ্ছ ধরে বৃহৎ বিশাল নেমে আসবে। তবে কোথায় সে সাধক সর্বত্যাগী, যিনি বুঝবেন কে তিনি সুমহান দর্পহারী ? তিমি পরম 'শান্তিময়'। 'সবের সমাধান' 'মা-মহাজ্ঞান' শ্রীপদমূলে। চির-অব্যক্তকে ব্যক্ত করেছেন তিনি। তাঁর শক্ত হাতে হাল ধরা। আমরা এপার ওপার হয়ে সব ব্যাপারেই এবার নিশ্চয় যে যার নিজের ধার বুঝে নেব।]

উৎস তোমার ক্ষুদ্র জেনে
চিন্তা আসে—
ভ্রান্তি কেন আমার মনে।
উৎস তোমার ক্ষুদ্র জেনে
কেমন করে মন বাঁধিব ;
বৃহৎ তুমি করব আমি
সত্য মনে !

বল গো আমায় শুনি
চারিদিকে চেয়ে আমি দেখি
যায় দৃষ্টি কতখানি।
আমার নাগালের বাহিরে
বৃহৎ তোমায় দেখছি আমি,
জানছি তোমায় সত্য বলে।
এ বৃহৎ বিস্তার দেখে
কেমন করে ভাবব তোমায়, তুমি ক্ষুদ্র—
যায় না দেখা যায় না ধরা !
মন মানে না আমার তাতে।

বল তুমি আমায় শুনি,
ভ্রান্তি নিয়ে আমি দাঁড়াই কোথায় !
ওগো জেনেছি সত্য বলে, মেনেছি মানি।
দাও বলে দাও আমারে তুমি,
এ হেন সত্য দেখে কেমন করে বুঝব তোমায়
তুমি ক্ষুদ্র—যায় না দেখা।
মানতে হবে সইতে হবে বুঝতে হবে—
তবে পাব তোমায় আমি।

কেন চাও জানিতে অমন করে
দাঁড়িয়ে আছ কোথায় তুমি!
আগে চিন্তা কর; মেলাও নয়ন তাহার পরে।
এ হেন অট্টালিকা কেমন করে যাচ্ছে দেখা!
ভাব দেখি একটুখানি
কোথা হতে উৎস ইহার,
দাঁড়িয়েছ আজ, কোথায় তুমি।

যদি না জানিতে তখন তুমি
কেমন করে দাঁড়াতে হেথায়
দেখতে সুন্দর ভবনখানি।
ভাব তুমি গুণমণি ভাবলে বুঝবে তবে
তোমার মাঝে আছে তারা
দেবে মিলায়ে সবই তোমায়
গুনে নেবে মেপে নেবে
লেগে ছিল ক'ফিট
সুতা এখানে।

আছে ক্ষুধা সবার জানি,
ক্ষুধা নইলে সৃষ্টি যে রে
হবে আমার বিফল মানি।
আছে ক্ষুধা সবার জানি,
সে ক্ষুধায় নাই রে সুধা
মন, উদর পুরবে মানি।
ক্ষুধা পেলে করবি বিচার।

ক্ষুধার সাথে আসে রে মিশে
তোর জ্ঞান বুদ্ধি জানি।
শুধু কি মন পূরণে ছুটবি রে তুই!
অবশেষে দাঁড়াবি এসে ;
কোথায় পাব দিতে সুধা আমি!

পেয়েছে ক্ষুধা তোরই জানি।
চিন্তা করে কর রে বিচার,
শ্রেষ্ঠ মানব সৃষ্টি আমার,
ভুলিস নারে কখনো কোথাও।
দাঁড়াবি রে—দাঁড়াবি রে তুই ধীর হয়ে তাই,
ভাবিবার সময় পাবি।
খুঁজে তারে তবেই পাবি।
ক্ষুধার সাথে সুধা আছে,
দিয়েছেন যে ক্ষুধা আমাকে
শুধু খুঁজে নেব আমি।

করবি রে তুই উদর পূরণ।
চিন্তা করে দেখবি তখন 'ছুটেছি কোন্ বেগেতে?
কোথায় স্থিত হবে আমার—
দাঁড়াব কোথায় আমি!
পেয়েছে ক্ষুধা, মনকে রে তোর আগে শুধা ;
খেয়ে নিলে খুঁজে পাবি কোথায় শুনি?
কেমন করে চিনবি রে তুই
তারই সাথে ছিল মেশা সুধা।

বারে বারে তাই
কেন পাগল করিস মনটা রে তোর?

ওরে ভাবিস নারে হায়!
শুধু উদাস হয়ে চাস রে দূরে,
মন যে আমার পাগল করে ;
বোঝাতে পারি না তারে
কেমন করে বোঝাই।

চিন্তা করে দেখলে পরে?
নিয়ে আয় নয়ন দুটি
ফেরাস না রে কারোর পরে।
ফেলে দে' ঐ দু'টি নয়ন
ছুটেছে যে মন পাগল হয়ে দৃষ্টি করে তাই।
থামারে পাগল মনেরে তোর
খুঁজে পাবি ক্ষুধার সুধা
রয়েছে নিকটে যে হায়!
কেন অন্ধ হয়ে বেড়াস ঘুরে?
শুধু আড় নয়নে মিছে ওরে
তারই পানে চায়।

ভেবে ছাখ বারে বারে
চাইছে উদর, পেয়েছে ক্ষুধা
বোঝে নাই কি দেব তারে!
শুধাই এবার জিহ্বারে তোর—
কি খাবি এখন শুনি?
কি জেগেছে বাসনা তোর,
ছাখ না খুঁজে দিয়ে তারে।
কোথাও লালা ভাসিয়ে ফেলে,
কোথাও আবার অধর বহে—
কোথাও এসে ভেজাতে যে
কষ্ট করে।

চিন্তা করে তাই
কর রে পূরণ—জ্ঞানমণি,
জ্ঞান অপমান সহে নাই সহে নাই।
যে দিয়েছে ক্ষুধা তোরে—
যেমন করে ক্ষুধা দিয়ে চিনেছিস তুই স্রষ্টারে,
তেমনি করে ভাব দেখি রে
দেয় নি কি জ্ঞান সে তোরে।
তবে কেন হায় জ্ঞান বিবেকে
তাড়ালি রে তাকে—
কে আছে চিনি নাই।

যদি রে মন চেয়েছে জানি
তবে স্বীকার করার নেই রে কাজ
করিস না রে চিন্তা তাঁরে,
শুধু বুঝে নিবে হিসাব
মিটাবে সময়ে জানি।
এমনি করে দেখ রে খুলে
মন ছুটাবি পাগল করে।
কেন বারে বারে শোনাস মোরে—
মন যে আমার পাগল করে।
বেঁধে ফেল শৃঙ্খলে তায়
পারবি না রে রাখতে ধরে।

যদি ভাবিস রে তুই—
আমি জ্ঞানী
নজরবন্দিতে রাখিব তাকে—
'কোথায় যাবে এ মনখানি'।
হারিয়ে যাবে, পাবি না তারে।

বেঁধে ফেল,
নয় রে কাছি, শৃঙ্খল ডোরে।
যাবে না ছেঁড়া তারে।
খোলার প্রশ্ন আমার ঘবে,
ডাকতে হবে আমায় জানি।

কোথায় আছ, কে গো তুমি!
বাঁধা মন দাও গো খুলে
ফুল ফুটেছে বাগান ভরে
এ ফুল আমার যাবে যে ঝরে
দিতে হবে তার চরণে ভরে।

আসিব আমি।
জানে না মন আমায় জানি,
বেঁধেছে তার জ্ঞানমণি।
আসবে বিবেক সঙ্গে যে তার
কত প্রহরী দাঁড়াবে ঘেরে রে মানি।

ক্ষুধার সাথে সুধা আছে
কেউ কি বুঝিস নি?
ক্ষুধার জ্বালায় অমন করে
কেন দগ্ধে বেড়াস তাই রে শুনি?
কর রে শীতল—
ওরে জ্বালা নিবারণ
হবে রে জানি।

সবের সৃষ্টি করেছে একা,
বহু মুখে বহু পথে রয়েছে তিনি

বহু দিকে দেখলে তাকে দেখতে পাবি—
পাবি রে দেখতে জানি।

এসেছি গো তব দ্বারে
চাহিছি তোমায় জেনো ;
আমায় শুধায়ো না আর গো ফিরে।
এসেছি গো তব দ্বারে।
কে চায় সত্য তোরে!
শুধু এসেছি জানতে আমি,
করেছ সৃষ্টি কেমন করে?

জানি আমি জানি
ভিক্ষা তোমায় বৃথাই চাওয়া
দাঁড়িয়ে আছ শূন্য হাতে তুমি।
চাহিতে আসি না
জানি নাই গো ধনী তুমি।
তবে কেমন করে চাইব তোমায়—
তুমি কাঙাল।
শুধু হয়ো উদার
একটুখানি আমার প্রতি।
যেন রাখতে পারি, ডাকতে পারি
তোমায় বারে বার।

কি চাহিব ভিক্ষা শুনি?
বলবে আমায় বলবে ফিরে

বাঁধা আছ আপন ডোরে
দিও না ছিঁড়ে তারে ; খুলে দেখো তুমি।
তবে চাইব কেন ভিক্ষা তোমায়
তাই গো বল শুনি ?
শুধু এসেছি কর্মে আমার
বলে দিবে আমায় কেবল—
আমি জ্ঞানী বলে জানি।

এসেছি চাইতে তোমায়,
এবার বোঝ, কি গো আমি।
থাকব আমি আমার ঘরে
আর রব না পর কুটিরে।
কখন তারা বলবে আমায়—
চলে যা চলে যা,
দেব না থাকতে তোরে।
তাই এসেছি জানতে আমি
নিজ কুটির বাঁধব যে গো
করিব অতিথি তোমায় আমি।

আসবে তুমি আমার ঘরে
আমি ডাকব তোমায় বারে বারে
পাতব আমার হৃদয়খানি
ধোয়াব আমার—
বহিয়েছি গঙ্গা জেনো সেই গঙ্গাজলে।
এসেছি জানতে আমি, কে তুমি!
সৃষ্টি আমার জান গো বলে
বলে দাও শীঘ্র করে
ফিরে চলে যাই

আমার মন বাগানে যেদিন আমি ফুটাব কুসুম,
তুমি অতিথি যাবে জানি গো
বাগান আমার দেখিবার তরে।

জানি আমি জানি
বনের মাঝে জন্তু থাকে ;
নয় লোকালয়ে তিনি।
দাও বলে দাও শীঘ্র করে
শুধু আরো বলে দাও আমায় তুমি।
অস্ত্র আমি চালাব জানি।
ওগো পড়বে না ধার অস্ত্রে আমার।
আমি করিব না আর যে দেরী
হয়ে যাবে বিলম্ব বলে।

দাও বলে দাও আমায় তুমি
ডাক দেব গো তোমায় জানি।
বন বাদাড়ে যাবে না আমার,
জানি করলে বাগান আমার ঘরে
ওগো অতিথি, হবে পার পথ যে তুমি ;
চাইবে ফিরে লোভেতে পড়ে।
আমি আসি নাই চাহিতে ভিক্ষা তোমারই দ্বারে।
করব আমার কর্ম জানি
আমার ক্ষেতে হব চাষী
আমি কুলী মজুর মানি।

আমি আসি নাই তোমার দ্বারে।
ভেবো নাই কখনো যেন
দেবে ভিক্ষা আমায় তুমি মন মাতানো।

ভিক্ষা দিয়ে করবে বিদায় অনেক দূরে।
দাও বলে দাও আমায় তুমি
ওগো অতি শীঘ্র করে।

না, আমি বলব নি আর, যাও। না। কি বলেছিলুম বলদেখিনি? তা বল দেখি। বলব কখন? কখন বলব—(হাসি)। না আর বলব নি। তুই জান্নুস নি।

খুব। তুই ডাকছিলি আমি জানি। কি মন খারাপ লাগছিল—ভাল লাগছিল না। হ্যাঁ, হোক না। তবুও তো—মায়ের জন্যে মন কেমন করবে নি? মনে হচ্ছিল মায়ের কাছে যাই।

মিথ্যা কথা বলেছি একটা। মিথ্যা কথা বলেছি। হুঁ হুঁঃ। আমি জানি তুই বুঝতে পারবি। না, সেটা কিসের চঞ্চলতা জানিস—ভুল হবে বলে। তাই জন্যে। এমনিতে কিছু না। সেই।

হ্যাঁ, মন কেমন করছে। চঞ্চলতা আর কিছু নয়, তাই বলে কি তোর সঙ্গে কথা বলব নি বলে বলেছিলুম? আমি বলেছি তো, কখন কথা বল!

মিথ্যা কথা, আমি ও রকম বলিনি। হ্যাঁ চঞ্চল, আমি তো বলছি চঞ্চল। তুই বলে তাই বললুম, অনেক কাজ আছে। তুই আর বকবি নি, আর বকবি নি বল? না, তুই জানিস—আমাকে আমার বাবা শিখিয়েছে তুই জানিস? ভুল হবে না কোত্থাও। ভুল করব না। (হাসি)।

তাই জন্যে তো বলেছি। আমি জানি যে। না, শিখা যে। আমি দেখেছি জানি শিখেছি। তাই চঞ্চলতা। না? ও মিথ্যা কথা নয়। ঐ তো বললুম। স্বীকার করছি তো আমি। হ্যাঁ চঞ্চল। হ্যাঁ পারলে পারতাম, হ্যাঁ পারতাম। ইচ্ছা করেই পারিনি। হয় কখনো? তা' পরে ভুল হয়ে গেল যখন বকবি তখন? (হাসি)।

কি রাগ হয়েছিল! খুব রাগ হয়েছিলো। না। আমি বলতে জানিনি আমি বলব নি। আমি বলবই নি। না বলব নি।

বুঝাতে পারিনি কেন বলদেখিনি ? কিছুতেই না। ভুল সে ভুলই হয়ে যায়! কিছুতেই হয় না হয় না! পারছি না আমি। চেষ্টা করেও না, কোন সময় না। তুই জানিস নি। (হাসি)

একটিও গুটি ছাড়বি না। এতটুকুনও না, যে রাস্তায় যাবি। পরিষ্কার রাস্তা চাই। তবে হবে।

ঐ তো, আমি বলেই দিচ্ছি। পরিষ্কার রাস্তায় তুই পা ফেলে দেখবি তোর পাগুলো কোথায় পড়ছে। কি রকম লাগছে। আর অপরিষ্কার রাস্তায় পা ফেলে দেখবি তখন কি রকম লাগছে। আবার কাঁটা গুটি তাদের মাঝখানেও পা ফেলে দেখবি, সেখানে কি রকম লাগছে।

হ্যাঁ রে, তাই। আবার ভেজা কাদা তাতেই পা ফেলে দেখবি, তাতে কি রকম লাগছে। তাহলেই বুঝা যাবে। হ্যাঁ কেন ?

আরো বলব ? না বলব নি, আর বলব নি।

আমি জানি। তুই আমায় ডাকছিলি তখন কি করে যাব! যেতে পারব ? যেতে পারব না। বুঝতে পারব নি তখন—কিছু কথা বুঝতে পারব না। তুই ফিসফিস কানে বলবি, আমি তখন বুঝতে পারব নি· শুনতে পারব নি। ভাল করে না শুনলে আমি করতে পারব নি।

না। ভুল কি আবার, ভুল! না আমি পারব নি, শুনবই নি। যা করব তা ঠিক করে করব। হ্যাঁ। শিখিয়েছিস কেন তুই আমাকে, তুই আমাকে শিখিয়েছিস কেন ? যা করব তা ঠিক করে করব। না।

কি বলছি বলদেখিনি—কি বললুম বলদেখিনি, বলতে পারবি কি বললুম বলদেখিনি ? বলতে পারবি ? জানিস, বলতে পারবি ? বলতে পারবি না। বলতে পারবি না তুই। একেবারে না, বলতে পারবি না।

ধন্য তোমার কর্ম ভাবি
করিলে অতিথি, দাঁড়ানু দ্বারে হয়ে ভিখারী।
এবার এসো তুমি এসো কাছে

নেই শুধাবার কিছুই আমার
করেছ কাঙ্গাল।

যাই বলে যাই বারে বারে—
দেখি নাই কুসুম আমি।
গড়িছ বাগান এমনি করে,
গন্ধে ছুটে এসেছি আমি।
এস এস—নয় ভক্ত আমার তুমি।
দাও দরশন আমায় এসে
রেখো মনে আমায় তুমি।

কে ডাকে এমন করে!
কেমন করে যাই গো—প্রভু,
আমি আমার কর্ম ফেলে।
বাজে আমার কানে শুনি এমন কঠোর বাণী প্রভু,
জান নাই কি—
রেখেছি মাথা কোথায় আমি?

তবে কেন এমন করে
বাজ ফেল গো বক্ষ পরে?
অস্ত্র আমার বায় যে পড়ে।
জানি ছাড়ব না, হব কঠিন ওগো আমি;
তবু তোমায় রাখব ঘরে।

আমি দেখব তোমায় সদাই যে গো
ভাবব শুধু বারে বারে—
কর্ম আমার সফল জানি।
করেছিনু চালনা অস্ত্র হয়ে গেছে চুরমার;

রয়েছে অস্ত্র তেমনি আমার
জানি কাহার কৃপায় ধার পড়ে না ;
করব ছেদন ভুবনে—ভুবনে আমি

ও প্রভু,
নেই যে সময় দেবার সাড়া
প্রভু, জানো না কি আমায় তুমি।
চাহি না ভিক্ষা হব না ভিখারী
কাহারো দ্বারে ওগো আমি।
আমি কর্ম করে গড়ব জানি
ও প্রভু, তুলব গড়ে সোনার ভুবন।

দাঁড়াবে জনে জনে
রব না আর সেখানে
যাব মিলায়ে চরণে আমি।
ডেকো অমন করে
দিয়েছি যে মূলে হাত আমার লাগবে সময়
হয়ে যাবে ভুল ডাকলে পরে।
আমি যাব না, আমায় পাবে না।
শুধু দেখি ভাবি আমি
ওগো বারে বারে—
প্রভু, সৃষ্টি মাঝে এমন বাঁধন
দিয়েছ কেমন করে!
কোথায় আমার আপনজন
ভাবি সদা সর্বক্ষণ।
ও প্রভু, ভাবি শুধু জানি আমি
আমার দৃষ্টি মাঝে বন্দি যারা
ও প্রভু, শুধু তাদের লাগি
ভাবা আমার, জানি আমি।

ভাবিতে চাই না বলে
আমি দেব আমার এ নয়ন উপড়ে ফেলে,
যাবে দৃষ্টি জানি আমি দূর দিগন্তে চলে।
সৃষ্টি তোমার ভাবি আমি।
প্রভু, এমনি করে বাঁধ—

বল বল, না বল ? পারছি নি। না। কেটে গেলে আমি বলতে পারব নি, না। (হাসি)—না। না। ঘুরব নি। ঘুরব নি। (হাসি)

না বলছি না, করব নি তোমার কথাতে। নাঃ, বলতে পারব নি আমি, নাঃ। ঠিক তো, ঠিক তো। না। হ্যাঁ ? তাই তো ? কি ?

তুই ঘুরবি নি। বল ঘুরবি নি। না ? দেখবি দেখবি ? বলব দেখবি ? (হাসি)। আচ্ছা বলদেখনি শেষ হয়ে গেল, বলদেখিনি শেষ হয়ে গেল।

শেষ ? এর শেষ। এর কি শেষ, শেষ রে ? সে কি রে।

না জানিস নি। বলতে পারবি নি। না ঘুরব নি আমি, ঘুরব নি।

কি, বলে দেব ? আচ্ছা আচ্ছা। বলতে বলছিস।

সৃষ্টি তোমার এমনি জেনে
আর রব না পড়ে গো আমি ;
ভেবো নাই কভু মনে।
দৃষ্টি মাঝে বাঁধা যারা
কাম কামনায় আছে ভরা।
ওগো প্রভু, আমি তাই ভেবেছি এমনি করে
করে চুরমার আগে তাদেরে।

লোভ কাম অহংকার
রবে না রবে না

জানি যৌবন—আসিছে ভাটা দূরেতে আমার।
তাই জেনে গো আমি
এ নয়ন দিয়েছি ফেলে।
যাও ছুটে যাও সেই যে দূরে
দেখো না নিকটে—নিকটে তুমি।

আমি এসেছি বলে তোমারে
তোমার বাঁধা বাঁধন খুলব ওগো—
ওগো পথ বলে দাও আমায় তুমি।
তুমি ভিখিরি, হব গো আমি তোমার মতন ভিখারী বলে।
"নেই যে আমার কিছুই ওরে।"
শূন্য হাতে দাঁড়ালে এসে
বলে দিলে কেবলি মোরে।

তেমনি করে বলব আমি
হ' ভিখারী আপনার কাছে
ওরে আছে ভাণ্ড তোরই মাঝে।
শুধু বাঁধন দড়ি—
শুধু বাঁধন দড়ি রয়েছি ধরে কেবলি আমি।
এমনি করে দিবি রে টান
না করে আমারে ওরে আহ্বান।
আমি ছুটে যাব জানি রে কাছে
এসেছি অতিথি কাঙ্গালই বটে।

না বলব নি আমি, ঘুরব নি। না, তুমি অনেক বলা করবে। না বলব নি। না, তুমি অনেক বলা করবে আমাকে। আমি আর বলবই নি।

বলব নি। বলব নি বলব নি। না, আর বলব নি। না। চলে যাই? চুপ করে যাই। পরে বলব। পরে বলব। আচ্ছা তুই দেখবি।

(হাসি) না বলছি। চলে যাই।

হ্যাঁ গো, তুই জানিস? পরে আসব, পরে আবার পরে বলব। আর এখন বলব নি, না বলব নি। বলছি পরে বলব। আবার বলব, পরে বলব। না। কাজ আছে।

ও মজা! তুই আমাকে ভুলিয়ে ভুলিয়ে ডাকলে আমি যাচ্ছি! কাজ করব নি? কাজ করতে দিবি না।

হল না কে বলবে, হল না?

ব্রহ্মজ্ঞান

"সাধারণ জ্ঞানকে উপেক্ষা করে কখনোই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। কেবলমাত্র অধ্যাত্ম দর্শন সম্পর্কে ধারণা হয়ে থাকে। কালচার করতে করতে তাই বাড়ে। এইমাত্র যা। কোনকালেই উপলব্ধির সবটুকু নয় তা।

সাধারণ জ্ঞান নিয়ে কালচার কর। সেই সঙ্গে ত্যাগ যুক্ত হোক। ধীরে ধীরে ব্রহ্ম উপলব্ধি হবে। একটা আয়ত্ত করে অন্যটা নয়। উভয়ই একসঙ্গে চলবে। কিন্তু কখনই সাধারণ জ্ঞানকে অবজ্ঞা করে—মায়া বলে তাঁর সৃষ্টির প্রতি অবহেলা করে সার্থক পারমার্থিক জ্ঞান অর্জন করা যেতে পারে না।" এটি নেহাতই একটি ভাঁওতার কথা।

জিনিসটি বড়ই কঠিন। যতই সহজভাবে ব্যাখ্যা হোক না কেন, যারা ব্রহ্মজ্ঞানে যেতে চাচ্ছে বা যাচ্ছে, তারা এটিকে সম্পূর্ণ না হলেও অল্পবিস্তর উপলব্ধি করেছে। সঙ্গে সঙ্গে গভীর মনে বলে উঠেছে—ও বাবা, এ অসম্ভব। অমনি উপস্থিত বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা বা প্রচার করেছে—মায়াজাল ছাড়া এটি আর কিছু নয়। কিন্তু এই মায়াজাল এ যে সাংঘাতিক! কাঁটার বেড়া! একে পার হয়ে যাবে কে, ক্ষমতা কার কতখানি? অতএব সম্পূর্ণরূপে একটি দিক বাদ দাও।

এবার বলি, যেদিক বাদ দেওয়া হল সেদিকের খবর কি করে বিস্তারিত বলতে পারবে বা জ্ঞান লাভ করবে? আর সেই ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে না পড়লে সাধারণ জ্ঞান আসবে কোথা থেকে কাজ না আটকালে কি আর বুদ্ধি জোগায়! আর বুদ্ধি নিয়ে কালচার না করলে কি আর জ্ঞান আসে!

তবে হ্যাঁ, সব সময় যে বিয়ের প্রশ্ন আসছে তার কোন মানে নেই। বিয়ে করলে তো অতি উত্তমই। সমস্যা গ্রহণ করে হাসিমুখে জ্ঞানের সঙ্গে সমাধান আনা, সে তো অতি উত্তম। বলা বাহুল্য নামকাওয়াস্তে সংসার নয়। বিয়ে করলে চ্যাঁ-ভ্যাঁ মা বাবা অভাব অভিযোগ ইত্যাদি আসছে, নইলে নয়। এর উত্তরে হয়ত অনেকই জানাবে—কেন, বিশ্বপিতার ভূমিকায় দাঁড়াতে যাচ্ছি, আবার কয়েকটির কি প্রয়োজন! তখনই তার উত্তরে এই কথাই আমি বলব—বিশ্বপিতা হওয়া, আর জন্ম দিয়ে গর্ভে ধরে পিতা-মাতার ভূমিকা—হু'টি কি এক? একবার বিচার করে দেখ তো বাবা! যখনই বিয়ের প্রশ্ন এসেছে তখনই ছেঁড়া বা বিচ্ছিন্ন প্রশ্ন উঠতে পারে না। তখনই খোলা, নির্বিকার ইত্যাদির প্রশ্ন আসবে। কারণ বন্ধনেই যখন টেনেছিলে তখন কোন্ জ্ঞানে খণ্ডন বা ছিন্ন করিলে! এবং বলি, বঞ্চিত করিলে? তাহলে বিয়ের কথা উঠলে এতগুলো কথা আসে।

এবার এসো মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার কর—আমি অক্ষম, বিয়ে করলে ব্রহ্মলাভ করতে পারব না। তবে হ্যাঁ সেই সঙ্গে তোমাকেও আবার বাস্তব এই জয়মাল্যই দেবে—উঃ কি ত্যাগী পুরুষ কি ত্যাগী নারী! কিন্তু এ বললেও যে রেহাই নেই বাবা।

বিয়ে না করলেও যে সংসার আছে। কচি কচি ভাই বোন, অসহায় বিধবা মা বা সধবাই, দারিদ্র্যের উৎপীড়ন, পঙ্গু বৃদ্ধ পিতা ইত্যাদি। এদের নিয়েও যে বিরাট সংসার হয়। সেই সবের ভিতর দিয়ে যে সব ঘাত-প্রতিঘাত আসে, অনেককিছু কাজ আটকানোর জন্য দুর্ভাবনা, চিন্তা, অসহায়—এই যে মন—এইখানেই দেখা দেয় বুদ্ধি। সেই বুদ্ধি ধীরে ধীরে যখন কার্যকরী হয়ে দাঁড়ায় তখন অসহায়

মন আনন্দে নেচে উঠে।—যাক এই করে আমার এই হয়েছে। ঠিক, এইটিই ঠিক—এই তখন জ্ঞান।

আর বিপদ বিপর্যয় যখন আটকাতে পারা গেল না—অনিবার্য, আমার মনের দুয়ার করাঘাতে খুলে দিল—শুধু খুলে নয়, ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। না না না না না, আমার আর কিছু করার নেই, আমি কিছু করতে পারলাম না, সব শেষ। সব শেষ। লুটিয়ে পড়ল ধুলার ধরণীর উপর। সমস্ত বুদ্ধিই আমার হারিয়ে গেছে। আমার আজ আর কিছুই নেই।

সেই চুরমার কুচি কুচি বুকখানা নিয়ে—উঃ কিছু করতে পারলাম না। তাহলে বুঝি আমার দ্বারায় আর কিছু হবে না। হঠাৎ কোথা থেকে কি যেন হয়ে গেল। মুহূর্তে কে যেন আমার অন্তরালে দাঁড়িয়েছিল—একি আমার পুরানো চুরমার করা সেই বুকখানা নূতন নূতনই। নূতন শব্দ, নূতন সুর, নূতন সাড়া। কে বলেছে পারব না, ঠিক পারব। এ যে আমার নিঃস্বার্থ কর্ম, তাহলে ঈশ্বরের আমার কি প্রয়োজন ছিল। নিঃস্বার্থ কর্মই হচ্ছে ধর্ম।

আবার কানে মনে বেজে উঠল—ভয় নেই, ভয় নেই। নিঃস্বার্থ কর্মই যদি তোমার হয়ে থাকে তাহলে এ তুচ্ছ বিপদে ভয় কেন। সত্যি, সবল হয়ে উঠলাম। আবার নূতন উদ্যমে নূতন মনোবলে আগিয়ে চললাম।—সত্যিই তো তাই। যেখানে বিধবা জননীর পেটের কথা চিন্তা করেছিলাম,...

ছোট কয়েক টুকরা প্রশ্ন নিয়ে—
অতি ভয়ে ভয়ে দাঁড়ালি সমুখে আমার
মা, একটা কথা পড়ি তোমার কাছে—
ঠিক কি ভুল?
গতরাতে বলে এসেছিল
টুকেছিনু আমি আমার খাতাতে।

নির্ভয়-দান করে চাহিনু বদন পরে
আহা, বেচারা সদাই আমায় ভয় করে ;
কি করি বাবা বল !
অনেক জ্বালায় জ্বলি বলে, জানি বলে,
জানবি আমার
এ নয় কভু ছল।
তাই উঠিল ভরে স্নেহেতে
বলিনু অম্লান বদনে—বল বল,
সময় আছে, বলে দেব এখন তোকে।

এই, বলে বলতে বসে
ক' লাইনের কথা সেটি,
আরো সে অনেক আছে !
তাই হেসে হেসে বলনু ফিরে—
ওরে হতভাগা, এ যে অনেক কথা—
অনেক আছে।
ফিরে হেসে জানালি অমনি—
বল মাগো, লিখে নেব শীঘ্রই আমি।

হঠাৎ টুকরো এক ঘটনা ঘটে।
উঠতে হল আমায় সব ছেড়ে—
রেখে স্থগিত।
ভাবিল,
এইখানেতেই রইল বটে।

আমার সকল জ্ঞানের সাজ করে
দাঁড়ানু দ্বারের পাশে
আমি গৃহী—

বধূ রূপ ধরে।
ডাকিনু অমনি তখন—
শুনে যা আয় ওরে
কোথা আছিস কন্যা আমার
দাঁড়াবি সমুখে এদের।
কি বলিতে চায় যে রে।
বধূ আমি বধূ জানি কেমনে বেরোব শুনি
বাহিরে এসেছে যারা
ভাশুর দেওর মানি আমি।

আর বলব না। লিখতে পারবি নি।

তুই যে কন্যা রত্ন
তাই বাহির হবি সমুখে এদের।
জানিস নাকি বধূ আমি
লজ্জা শরম সবই চাই।

কন্যামণি হেসে হেসে
দাঁড়াল তাদের কাছে—
কি বলিতে চান
শুনি আমি?

মাতৃবিয়োগে এসেছি মোরা
কোথায় আছে পিতা তোমার?
বলে দেবে—প্রীতিভোজে যেতে হবে
তাই এসেছি দুয়ারে মোরা।

বাধ্য হয়ে তাই দাঁড়িয়ে রইনু
ঘোমটা দিয়ে দরজার পাশে।

সবই আমার শোনা চাই।
যদি মেয়ে যায় ভুলে
তবে গৃহস্বামী পতিদেবতা
ছাড়িবে না আমায় তিনি—
কি বলেছে, কি শুনেছ।
কেমনে করিব রক্ষা এই নিমন্ত্রণ।
জান না কি—
ফিরে দিতে হবে সময় হলে।

তাই সবই মনে করে
জ্ঞানের খাতা গুটিয়ে তুলে
সমাজ বন্ধনে 'বন্ধিত' হতে
দাঁড়ানু সেই পুরাতন বধূ আমি,
মারা গিয়েছে প্রতিবেশী শাশুড়ী বলে।

তাহলে এবার বলি শোন।
এমনি করে জ্ঞানের দৌড়
হয় বাড়াতে—
বিচার করে দেখবে সবাই
জ্ঞান বুদ্ধি উপলব্ধি কার কেমন।

নেঃ, এবার এধারটা চুকে গেছে,
এবার ফিরে আসি সেই পুরানো কাজে।
কি রে অমন করে হতবাকে
কেন চাইলি আমার মুখের দিকে।
ভয় নেই তোর,
যেখানে ছেড়েছি আমি
সেইখানেতে ধরব জানি।

রেখেছিনু তুলে ঘরে,
ঘর খুলে বের করব তারে।
কেউ নেবে না সম্পদ আমার
চাবিকাঠি আমার হাতে।
এ যে আমার জিনিস।
আমি ভাল করে জানি তাকে।

যেখানে বিধবা জননীর পেটের কথা চিন্তা করছিলাম, সেখানে জননীরই প্রতিধ্বনি কানে বেজেছে—

বাবা, ভয় নাই ভয় নাই,
ঈশ্বর হয়েছে সদয়।
যশ মানে গিয়েছে ভরে।
কি অন্ন চিন্তা কর তুমি মোদের তরে!
এসেছে এবার বিতরণের সময়।
অবাক হয়ে দেখ তাই।
ভাবনু একি হতে পারে,
এ কি হয়!

জিনিসটা বলতে কত ছোট, কিন্তু সম্পদ আর বিপদ—পার হওয়ার সময় সব কিছুই ধরা যায়।

আমি আমার গণ্ডীকে লক্ষ্য করে
বেড়াজালে জড়িয়ে পরে
ছুটেছিলাম দিকবিদিক জ্ঞান না করে—
কি করে এদের বাঁচাই?
কিন্তু ছিল সেথা সদাই মনে—
এ তো নিঃস্বার্থ কর্ম, আমি না দেখিলে এদিকে
দেখবে সে কোন্‌জনে!

এই রকমই আমাকে সর্বক্ষেত্রে করতে হবে। এই মনে করেই চলতে চলতে আমি যেদিকে গেছি, হয়ত সেদিকে শূন্য। এইখানেই বলতে হবে ঈশ্বরের কি দয়া কি করুণা। ফিরে এসে দেখি—তাদের চতুর্দিক পূর্ণ। আমার কাজের ভার ঈশ্বরই বহন করেছেন। এখানে ছিল না যে আমার মমতা, আমিত্ব, অলসতা, ফাঁকি, ইত্যাদি। তাই তো তিনি এসে এই কাজ গ্রহণ করেছেন বা বহন করবেন। মা বাবা ইত্যাদি যেই হোক না কেন "অনেক পরিশ্রম—করেছিস বাবা, অনেক কষ্ট করেছ তুমি। এই দ্যাখ, কে যেন, চিনি না তাকে, অতি বিনয়ের সঙ্গে বলে দিল পথ মোদের এসে। সেখানে আর বলতে পার কি যে মায়ায় বাঁধা ?

কখন আলো কখন অন্ধকার,
এই করেই চলতে হবে।
শুধু চেয়ে নিতে হবে ঈশ্বরের কাছে মনোবল।
এবার যেদিকেই হোক না কেন
আমি ত্যাগী, আমি নিস্পৃহ নির্বিকার
সেইটাই হবে বিচার।

প্রসাদ—সৃষ্টি রহস্য ভেদ করাই কি সত্যের মাপকাঠি ?

মা-মহাজ্ঞান—সৃষ্টি রহস্য ভেদ করব ইচ্ছা করলেই তাকে সেই রকম পথে পা বাড়াতে হবে। তাকে জানতে হবে তো—কোথা থেকে সৃষ্টি এল, কি ভাবে হচ্ছে, কেন হচ্ছে, কি জন্যে ইত্যাদি ইত্যাদি সব। তাহলেই তো তার ত্যাগ বৈরাগ্য এসে যাচ্ছে, এঁ্যা ? সে নিগূঢ় করে জানতে চাইলে নিগূঢ় করেই তাকে ত্যাগ করতে হবে।

এই যেমন ছোট্ট করে—ছোট্ট গল্প একটা বলি দাঁড়া। আজকে মন্দিরে আমি পূজা করেছি, উঁ ? অনেকদিন আগেই আমি জানতে পেরেছি, আমায় জানিয়ে দিয়েছেন—আর তোমায় পূজা করতে হবে না। যে উপাচারের পূজা নিয়েছিলে, এবার তো বুঝলে পূজাটা কি

জিনিস, আর তোমায় পূজা করতে হবে না।

কিন্তু যে সিঁড়ি ধরে ছাদে ওঠা যায় সেই সিঁড়িকে আমি ত্যাগ করিনি। এখনো ধরে রেখেছি। এবং অন্তর দিয়ে ধরে রেখেছি। সেটা বলার পরেও আমার মন কোথাও নড়ন-চড়ন হয় নি। শুধু এইটুকুনই মাঝে মধ্যে মনে হয়, আমি বুঝতে পারি—খুব যেদিনে সংসারের ঝামেলাতে পড়ে যাই, অনেক দেরি হচ্ছে, সেদিন মনে হয় দেরি হলে তো ক্ষতি হবে না, আমাকে তো বারণই করেছে পূজা করতে। কেন না, এই সব পূজাই তো করতে বলেছে। আমি তো সেই পূজাই করছি তার জন্যে যে আমি খেয়ে নিই বা আরাম করে গল্প করি, তা নয়। খুব ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি—ছেলের অসুখ, কি কাউকে পথ্য দিতে হবে, কি কেউ কোথাও যাবে—এই রকম ব্যাপারে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি।

তা পূজা করে যাচ্ছি। এখন সমস্ত ফুল-টুল গুছিয়ে যেমন দিন মনসাতলায় দিয়ে দিই। সেই যে মনসাতলায় বলেছিলেন, পিছনে ফেললে কি হয়। আমার এটুকুনও নীতির এদিক ওদিক হয় না। ঠিক দিয়ে যাই।

আচ্ছা ছোট এতটুকুন একটা—কাপড় ঝাড়তে যেতে এতটুকু একটা কি জিনিস পড়ে গেল। এমনি ভাবে ফিকা হয়ে গেল, আমি হাত দিয়ে এরকম করে ঠেলে দিলাম। ঠেলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে হল, এই ক্ষুদ্র থেকেই বৃহৎকে জানা যায়। এটা কি ফেলে দিলাম আমি? এঁ্যা? পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এটা ঝুল। উঁ, ঝুল বুঝছি তখন আমার মনে হল—এ কি কথা, এই ভাবে কি সৃষ্টির রহস্য ভেদ করা যায়! না তা যায় না। কয়লার খনিতেই হীরা থাকে। এটা শুধু কয়লাই যদি হয় তা ভেঙে উনানে জ্বাল দিয়ে দেব। আর যদি এর মধ্যে হীরা থাকে তাহলে হীরাটি সংগ্রহ করে নেব। এঁ্যা, এটা মনে হচ্ছে যেন আমি সব জেনে গেছি, আর কিছু জানবার নেই। এ কি কথা, এ তো ঠিক নয়। আচ্ছা, ওর ভিতরে কিছু আছে।

কেন? না, ঝুলটা যদি শুধু হয় তা পাক খেয়েছে ঝুলটা কেন?

পাকানো কেন? ঝুল একটা হাল্কা জিনিস তো, তাতে সে ওজন পেলো কোথায় যে সে ফিকা হয়ে গেল? তাহলে নিশ্চয় তার ভেতর কিছু আছে, তাই ওজন পেয়েছে। দেখ, কাজ করতে করতে গবেষণা চলছে।

উঁ, তখন ঝুলটা যেন আমা থেকে পাঁচ হাত দূরে যেয়ে পড়েছে। আমি সেটাকে কুড়িয়ে নিয়ে এলাম। কুড়িয়ে এনে সেটাকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলাম—কোন একদিন কপালে যে তুলসী পাতা দেওয়া হয়—সেই তুলসী পাতার ডাঁটি ভেঙে রয়ে গেছিল কোথাও, তাতেই ঝুলটা জড়িয়ে আছে।

পাওয়া গেল, কয়লার ভিতরে হীরা? ওটাকে আমি ফিকে দিছিলাম তো। আচ্ছা ফিকে দেওয়া হলে ওটা পা দেওয়া হত। ওটা আরো অনেকে পা দিত, যারা যারা পা দিত, তারা তারা একেবারে কিছু জানে না, তারা চলতি জ্ঞানের উপর দাঁড়িয়ে আছে—মূলতঃই তারা অজ্ঞ। সেই অজ্ঞের অজ্ঞতা—তুমি জ্ঞানী হয়ে কি করলে? তার অজ্ঞতা দূর করলে, না বাড়িয়ে দিলে? সে তো দেখবে না। তোমার কি দেখিয়ে দেওয়া উচিত ছিল না, এঁ্যা? তাহলে এগুলো কি, আত্ম-অংহকার আত্ম-দম্ভ কি না দেখদেখিনি? এঁ্যা, বাইর থেকে কে ঘরে ঢুকতে চাচ্ছে এখন? এগুলো কি ওরা দেখবে, না আমি দেখব? ছোট্ট একটি তুলসী পাতার ডাঁটি তাতে পাওয়া গেল। সংগ্রহ করে ঠিক মতন জায়গায় ফেলে দিলাম। ফেললাম, না খেয়ে নিলাম? না ফেলে দিলাম। এগুলোকেই বলছে, যোল আনার উপর দিয়ে বত্রিশ আনার উপর দিয়ে আটচল্লিশ আনার উপর দিয়ে—এগুলোকে উপর দিয়ে বলছে।

মূলতঃই তো উপাচার—তুলসী পাতা? কিন্তু উপাচার কার উপরে ছিল সেটা? সেই উপাচারকে প্রথম কোথায় তুমি স্থাপন করেছিলে? এঁ্যা? প্রথম তোমার জীবনে কে এসেছিল? সেই চার হাত কালী। সেই কালী খুঁজতে খুঁজতেই তো সব বুঝতে পেরেছ। তাহলে, এককালে যদি তোমার আমি মা ছিলাম, এখন আমি অকর্মণ্য

হয়েছি বলে কি আমার গেটে ব্যবস্থা হবে নাকি? এই যে যা করছে।

তবে একটা কথা, তুমি যে গবেষণা করছ, এ কথা কাউকে জানতে দিও না। কেউ যেন না জানতে পারে। মুহূর্তে মুহূর্তে তোমার মন পাল্টাতে আরম্ভ করেছে। দেখ কেমন আকার ধরেছে মনের মধ্যে। ঐ গুলোকেই বলেছে স্পৃহাকে ঘুরানো। যখনই তুমি গবেষণা করতে বসে যাবে তখনই তোমার চোখ ওখানে স্থির হয়ে যাবে। মন স্থির হয়ে যাবে। বাকী অন্যদিকের কাজ তোমার বয়ে যাবে। তুমি যদি মূলতঃই গবেষক হও তাহলে তো তোমার সময় লাগবে না, এক কথা। দ্বিতীয় কথা, যারা আশপাশে থাকবে তারা তোমার গবেষণা দেখে দাঁড়িয়ে যাবে। এ্যাঁ, তারা তোমায় খাতির অভ্যর্থনা জানাবে। তোমার গবেষণার মনটা উবে যেয়ে আমিত্বের মনটা আগিয়ে আসবে।

প্রসাদ—আচ্ছা মা, এই যে ঘটনাটা বললে, যদি এরকম প্রশ্ন ওঠে—এটা লক্ষ্য করেছ বলেই ফলাও করে বলছ। এমন কত কত তো তোমার অলক্ষ্যে বয়ে গেছে।

মা-মহাজ্ঞান—না, আমার অলক্ষ্যে যায় না। নাঃ কোনটায় আমার অলক্ষ্য হয় নি। যখন আমি কিছু জানতাম না সবে পা বাড়াচ্ছি, তখন যে আগ্রহ ছিল, এখন সর্বত্র জেনেও আমার সেই আগ্রহই রয়েছে—আগ্রহ আমার মরে না। কেন? না মূলতঃই আমি জেনে গেছি—জেনে গেছি বলে সেই অহংটা আমার মধ্যে নেই। জানি না বলেই আমি নিজের মনের কাছে স্থির করে রেখেছি। যা জানি তা কিছু নয়, যা জানি না সেইটেই বৃহৎ—দেখতে দোষ কি? আজো আমার মনে সেটা স্থিত হয়ে রয়েছে।

প্রসাদ—তাহলে তুমি যেটুকু সময় পাও, তার কোথাও তোমার অপব্যয় নেই?

মা-মহাজ্ঞান—না। সময় করে নিই। 'সময় পাও' আবার কি! সময় করে নিই আমি। সবই আমাকে দেখতে হবে, সবই

আমাকে জানতে হবে। আমার লক্ষ্যের মধ্যে যা আসবে, তা জানব সবই। যেটা আমার কানে আসবে, যেটা আমার চোখের উপরে আসবে, যেটা আমার নিকটে আসবে—এই কালকেই দীপুকে একটা কি কথা বলছিলাম—দেখেছিস, এই যে এটা শুনেছি, শোনা অবধি আমার দারুণ কৌতূহল। কি করে এই খবরটা নেব আমি? শেষ পর্যন্ত সেই খবরটা নিলাম।

সকালবেলায় খোকনের মুখে শুনলাম কি—'জান মা, বলাইদা এই সেদিনে বিয়ে করেছে, ওর বৌ-এর কি অসুখ করেছে, বলছে আর বাঁচবে না।' আমি শুনে চম্‌কে উঠলাম—সে কি রে! বলে—হ্যাঁ, হাসপাতালে নাকি ভর্তি করেছে।

এই জানার পর থেকে আমি চঞ্চল হয়ে পড়ি—কোথায় কার কাছ থেকে এই সংবাদটা নেব? কি করে নেব, কি করে নেব, কি হল কি হল? এই চলতে থাকে। আর সেইটা আমার মনে উদ্বিগ্ন ছিল বলেই একবারে স্বয়ং তার স্বামীকে পেয়ে গেলাম আমি।

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম—বলাই, বৌমায়ের কি হয়েছে রে? বলল—না কৈ, কিছু তো হয় নি। আমি বললাম—হ্যাঁ, তবে যেন কে বলল, খুব অসুখ করেছে, না কি করেছে! বলল—'না না, এই তো দিদির বাড়ি গেল মেদিনীপুরে।' তবে গিয়ে শান্তি।

ও অপগ্রাহ্য মন আমার কোনদিনই নেই।

প্রসাদ—তাহলে সময় করে নেওয়ার জন্য তুমি তোমার ব্যক্তিগত আহার নিদ্রা ত্যাগ করছ।

মা-মহাজ্ঞান—হ্যাঁঃ, সে আমার নিজের উপরে।

প্রসাদ—এই ত্যাগের শেষ কোথায়?

মা-মহাজ্ঞান—ত্যাগের শেষ নেই। এ ত্যাগের শেষ নেই। এ খোল ফেললে শেষ।

প্রসাদ—কিন্তু যদি বলি মা, এই ত্যাগের জন্যে তোমার মৃত্যু এগিয়ে আসছে?

মা-মহাজ্ঞান—ত্যাগের জন্য আমার মৃত্যু এগিয়ে আসছে? সেটা তোমাদের ধারণায় তাই হতে পারে। আমার জানায় তা নয়। তোমরা বাস্তববাদী, তাই বলবে। কেন? না, তোমরা যে জিনিস পাচ্ছ, এঁ্যা—তোমাদের মায়া বা মোহ যে, এই সব ক্ষুদ্র জিনিসগুলো না লক্ষ্য করে উনি আমাদিকে এইভাবে বৃহৎ জিনিসই দিয়ে যান। এঁ্যা? এই সব এত ক্ষুদ্র লক্ষ্য করার জন্যেই উনি মৃত্যুর মুখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন। এই কথা তোমাদের মনে হবে। কিন্তু আমি জানি, বৃহৎই হোক আর ক্ষুদ্রই হোক, এই সবই আমার কাজ। এই কাজ যতদিন আমার করার দরকার হবে, ততদিনই ঠিক আমি করব। তারপরে যখন আমার কাজের আর প্রয়োজন হবে না, তখন খোল কিছুতেই থাকতে পারে না। খোল তখন ধরাশায়ী হবেই।

প্রসাদ—তা এ তো এক ধরনের দেহকে অস্বীকার করা হ'চ্ছ?

মা মহাজ্ঞান—হ্যাঁ, অস্বীকারই তো। আবার অস্বীকারও নয়, স্বীকার। ঠিক ওর মধ্যেই আমি ফাঁকে একটুখানি ঘুমিয়ে নিচ্ছি। খেয়েও নিচ্ছি। আমি আহার নিদ্রা যে ত্যাগ করে বসে আছি, তা নয়। সেটা বললে মিথ্যা কথা বলা হয়। সারা দিনে রাত্তিরবেলা কারো বারো ঘণ্টা ঘুমের দরকার হয়। আমার হয়তো চার ঘণ্টা হলেই হয়ে যায়। তিন ঘণ্টা হলেই হয়ে যায়, দু'ঘণ্টা হলে হয়ে যায়। ঠিক এক ফাঁকে আমি সেটুকুন সেরে নেব। এক ফাঁকে বলতে ঐ রাতেরই ফাঁকে। আর দিনে নয়। দশটা থেকে ভোর ছটা পর্যন্ত ঘুমানো। সে জায়গায় আমি—হয়তো রাত দুটোর সময় শুলাম, চারটায় উঠে পড়লাম, কি পাঁচটায়। উঠে পড়লাম। 'এই তিন ঘণ্টা দু'ঘণ্টা। ঠিক না খাওয়া না ঘুম হলে সে খোল থাকতে পারে না।

আহারও সেই রকম পরিমিত করছি, তোমরা দেখছ আমি কিছুই খাই না। কিন্তু আমার মতন আমি ঠিকই খাচ্ছি। ঠিকই সকাল বেলা এক কাপ দুধ, তাতে এক মুঠো মুড়ি ফেলে দিয়ে, কি এক গোঁদল চা—এঁ্যা? কি দুপুরে ঠিক ভাত। তোমরা পাঁচ তরকারী দিয়ে দশ তরকারী দিয়ে খাও, আমি হয়তো দুটো তরকারী ডাল দিয়ে খাই, কি এক তরকারী ডাল ভাত।

সত্যে সত্যে কোন বিরোধ নেই। সত্য মিথ্যায় যদি গণ্ডগোল বেধে যায় তাহলে ? সত্য সে মূলতঃই জ্ঞান হওয়ার জন্য, কোন ধাক্কা সহ্য করতে পারে না, তাই মিথ্যাকে এড়িয়ে যায়। কিন্তু এ সংসারে সর্বত্র মিথ্যায় মিথ্যায় সংঘর্ষ অনিবার্য। এবং একটা স্বাভাবিক বা অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এগিয়ে আসে। এই হল কৃতকর্মের ফল।

তাহলে কি মা এ কথা বলা চলে যে মিথ্যায় মিথ্যায় সংঘর্ষ ও সংঘাতের মূলে যা দাঁড়ায় তাকেই বলে ভবিতব্য ? কারণ সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন যে সংগ্রাম ও অসাধ্য সাধন করেছ, তা বহু-ক্ষেত্রে দেখা গেছে, স্বাভাবিক পরিণতি স্তব্ধ করে দিয়েছে বা মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। তাহলে এ কথা বলা চলে যে সত্য সাধনা মিথ্যা তথা ভবিতব্যকে খণ্ডন করতে পারে। আবার এমনও দেখা যায় বাস্তবে, জ্ঞানী ও অভিজ্ঞকে অনুসরণ করলে অনেক ভবিতব্যের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। সত্যের প্রকাশটাই যদি ভবিতব্য হয় তাহলে সাধনা করা কিসের জন্য ?

এই যে মা স্বামী তার বিয়ে করা বৌকে ঘরে নেয় না, এর কারণ কি ? আর তুমি তো বলছ, মাদুলি যা সত্য তাই উত্তর দেবে। তাহলে নিশ্চয় মাদুলি ভবিতব্যকে খণ্ডন করবে ? উত্তরে শ্রীগুরু বলেন—

করবে ঠিক কথাই। যদি নিষ্ঠাবতী ও ধৈর্যশীল হয় তবেই। এ তো এক কথায় বলা আছে যা সত্য তাই উত্তর দেবে এর মধ্যে কোন মিথ্যা থাকলে চলবে না।

এবার আর একটা পয়েন্ট এখানে আছে, যদি মনে কর কোন কারণবশতঃ দৈবাৎ কোন কাজ হয়ে যেয়ে থাকে তাহলে একটা খণ্ডনের পথ আসতে পারে। কেন, না সে ডবল ধৈর্যশীল এবং নিষ্ঠা পালন করে। 'কি জানি কি একবার হয়ে গেছে। আর যেন না হয়।' এই যে অনুতাপের আগুন সেই আগুনে অষ্টপ্রহর নিজেকে পুড়িয়ে ফেলছে, সেইখানেই বল, পাপকে ঘৃণা কর পাপীকে ঘৃণা করো না। ঠিক এবার বুঝে ছাখ, মূলতঃই সত্যের উত্তর দেবে।

৮ই শ্রাবণ, ১৩৭৮

মিথ্যায় মিথ্যায় সংঘর্ষ অনিবার্য। অর্থাৎ তুমিও তোমার স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য দাঁড়িয়েছ। তুমি তোমার সেই আমিত্ব আসক্তি রিপু-গুলিকে সব বজায় রেখেছ। রেখে তুমি আমার সঙ্গে এসে মিশতে যাচ্ছ। আমিও আমার আমিত্ব আসক্তি রিপুগুলিকে সব বজায় রাখতে চাচ্ছি। অর্থাৎ আমি মুখে যে বাক্য বলছি, সেটি কিন্তু সত্যের নাম দিয়ে মিথ্যা বাক্য বলছি। তুমিও যে বাক্য বলছ, সত্যের নাম দিয়ে মিথ্যা বাক্য বলছ। এই উভয়ে উভয়কে তখন চিনতে পেরে যায়। 'ই' বলছে ওর স্বার্থ পূরণ করে নিল 'উ' বলছে এর স্বার্থ পূরণ করে নিল। এই মিথ্যায় মিথ্যায় তখন সংঘর্ষ লেগে গেল । উভয় উভয়কে চিনতে পেরে গেল অনিবার্য এই সংঘর্ষ।

কিন্তু একজন যদি প্রকৃত সত্যবাদী হয়, আর একজন যদি মিথ্যা-বাদী হয়, তাহলে পরে প্রথমতঃ সেই সত্য দাঁড়িয়ে মার খায়। কিন্তু যিনি মিথ্যা, তিনি হলে 'স্যারেণ্ডার' করে, ছিটকে পড়ে। সংসারে এইটিই সর্বত্র।

প্রত্যেকজনই মিথ্যাবাদী। যে যার স্বার্থ পূরণ করছে। এবার কেউ কম কেউ বেশী । আর ঐখানেই ঠোকাঠুকি এসে যাচ্ছে। 'ই' বলছে আমায় ঠকাল 'উ' বলছে আমায় ঠকাল।

সত্যের প্রকাশটাই যদি ভবিতব্য হয় তাহলে সাধনা করা কিসের জন্য ?—এর অর্থ কি গুরুদেব ?

মা-মহাজ্ঞান—কি সাধনাটা করছ বলদেখিনি তুমি ? সত্য সাধনা। তাহলে ? সাধনাটা তাহলে তো ঐজন্যই করতে হচ্ছে। সত্যের প্রকাশটাই ভবিতব্য, আবার মিথ্যার প্রকাশটাও ভবিতব্য। মিথ্যার ভবিতব্যকে সত্যের ভবিতব্য যেয়ে খণ্ডন করছে।

প্রসাদ—তাহলে এক কথায় ভবিতব্যের সংজ্ঞা আমরা কি পাচ্ছি ?

মা-মহাজ্ঞান—এক কথার এর কিছুই দাঁড়াবে না। এখানে সত্যের ভবিতব্য গিয়ে খণ্ডন করবে, আর মিথ্যার ভবিতব্য গিয়ে তাকে ধ্বংস করবে। তোমার মনে কর সত্যে সত্যে যে সংঘর্ষ—তার যে

ভবিতব্য হল না, এখানে সত্যের কিছু নেই। ব্যস, ধ্বংসই হয়ে গেল। আর কিছুই দেখতে পেলে না। মিথ্যায় মিথ্যায় যে সংঘর্ষ হল, সেই সংঘর্ষের ফলে যে ভবিতব্য, সেই ভবিতব্যের ফল তোমাকে নিতেই হবে। ব্যস আর কোন কথা নেই।

প্রসাদ—আচ্ছা, একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন মা। আজকে এই চন্বের যে দুর্দিন এগিয়ে আসছে, এখানে আপনার বিশাল সত্য, আমাদের একটা সত্য খেলছে। এবার আমরা যদি একান্ত মনে চাই সকলে—মা, এ ভবিতব্য খণ্ডন হোক, তাহলে কি খণ্ডনের পথ আছে কোন ?

মা-মহাজ্ঞান—হ্যাঁ, খণ্ডনের পথ আছে। সত্য-য় মিথ্যায় সংঘর্ষ। তোমরা মিথ্যা আমি সত্য। না, সত্য-য় সত্য-য় সংঘর্ষ হচ্ছে। কেন, না তোমাদের মিথ্যা—তোমরা তো তা করতে চাচ্ছ না। তোমরা পারছ না, তোমরা মূলতঃই পেরে উঠছ পেরে না! উঠছ না বলেই তো এই সব চোরামির পথগুলো নিচ্ছ। তাহলে সত্য-য় সত্য-য় সংঘর্ষ। এখানে হচ্ছে মিথ্যা পুরাটাই আংশিক তার সত্য। সেই সত্য নিয়ে এটার এত বড় বৃহৎ সত্যকে তোমরা আঁকাড় করে ধরতে এসেছ। সত্য-য় সত্য-য় সংঘর্ষ লাগছে।

কিন্তু সত্য-এ সত্য-এ সংঘর্ষ হয়ে, 'উঁ, এর যা ভবিতব্য সেই ফলটা তোমাদিগে নিতে হবে। এর ফলটা অন্যরকম হচ্ছে। বিভিন্ন ধারায় বিভিন্ন কথা বেরিয়ে যাচ্ছে।

এখানে সত্য হচ্ছে ষোলআনা। এ্যাঁ ? আর তোমাদের কাছ থেকে—মিথ্যার কাছ থেকে সত্য আসছে একআনা। তাহলে ষোল-আনার সঙ্গে একআনার সংঘর্ষ চলছে। করতে করতে যতক্ষণ না ষোল-আনায় এসে পৌঁছাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এর ফল কেউ পেতে পার না। এই সংঘর্ষই চলবে, চলে ভেস্তে যাবে জিনিসটা। ও তোমরা একআনাতেই দাঁড়িয়ে রইলে। এর আর ভবিতব্য কিছু নেই, এর আর ফল কিছু নেই।

প্রসাদ—কেন, যেটুকু সংগ্রাম সেটুকুই তো ফল ?

মা-মহাজ্ঞান—হ্যাঁ, সে ফলটা এমন কিছু কার্যকরী নয়। সেটা হাতে-কলমে পেয়ে যাচ্ছ।

প্রসাদ—কালকে অনিমা যে শেষ হয়ে গেছিল—

মা-মহাজ্ঞান—ঐ তো হাতে হাতে পেয়ে যাচ্ছে। স্থিত স্থায়ী কিছু নয়। একটা বিপদ হয়ে গেল, উঠে পড়লে। যেমন ছেলে আছাড় খেলে উঠে পড়ে। এ্যাক্সিডেন্ট কিছু নয়। তেমনি তোমাদের বুকে যে বচ্ছি গেড়ে দিচ্ছে—মনে যে স্থিত করে দিচ্ছে, তা দিচ্ছে না। সাময়িক বিপদ হল, অভাব পড়ল, অনটন পড়ল, তোমাদের একটা পেয়ে গেলে কিছু। পেয়ে যেয়ে তোমরা তোমাদের মতন আবার সেই স্পৃহার খাদে ছুটতে রইলে। আবার দীর্ঘপথ যেয়ে আবার পড়ে গেলে। আবার তখন সেই পিছনের দিকটা লক্ষ্য করলে—তাই তো, অমুক জায়গায় অমুকটা হয়েছিল। আবার 'ব্যাক' করে ছুটে এসে আবার সেটাকে কুড়াবার চেষ্টা করলে। এবারে কখনো কুড়াতে পারবে, কখনো বা আর এতদূরে চলে যাবে যে আর আসতেই পারবে না।

প্রসাদ—তাকেই যদি মা চায়—আমি যখন বিপদ ভঞ্জন আমার মাকে পেয়েছি, কোনমতেই আমি বিপদকে আসতে দেব না? তারও তো পথ আছে?

মা-মহাজ্ঞান—তাহলে তো সে একআনা থেকে বাড়িয়ে যাচ্ছে।

আমার জ্ঞানে তোদের মনে
বেঁধেছি মরাই ঘরের কোণে।
মরাই দেখে করবি বড়াই—
আছিস তোরা কে কোন্ খানে।

মহাজ্ঞান ও মহাশক্তি প্রসঙ্গে মাকে সাধারণ ভাবেই প্রশ্ন করি। কেনই বা পুরাণে ঈশ্বর-পিতা মহাজ্ঞান ও ঈশ্বর-মাতা মহাশক্তি—এমন কল্পনা করা হল?

সৃষ্টির গোড়ার কথা থেকে "মা-মহাজ্ঞান" শুরু করলেন—পুরুষ

জ্ঞান—সেই বীর্য শক্তি থেকেই তার যা কিছু জ্ঞানের প্রকাশ। আর নারী ধারণ করে বলেই সে শক্তি।”

মা-মহাজ্ঞান—আগে জ্ঞান, না আগে শক্তি?

প্রসাদ—আগে জ্ঞান। শক্তি আর জ্ঞান তো অবিচ্ছেদ্য। একে অন্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

মা-মহাজ্ঞান—শক্তি থেকেই জ্ঞানটা আসছে।

প্রসাদ—আবার জ্ঞান থেকেই শক্তি। কেন? না, জ্ঞানের পথ অবলম্বন না করলে সে শক্তিমান হবে কি করে!

মা-মহাজ্ঞান—শক্তি থেকেই জ্ঞান আসে। শুরুতে আগে শক্তি। তারপরেই শক্তিকে চেপে দেওয়া হয়। জ্ঞান তার উপর দিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু নিখুঁত করে খুঁজে দেখতে গেলেই গোড়ায় শক্তিকেই পাওয়া যাচ্ছে। খুঁজে দেখবে আগে শক্তিকেই পাবে তোমরা।

প্রসাদ—একটি শিশু জন্মাল, সেখানে আগে শক্তি, তারপর যখন সে বড় হচ্ছে তখন ধীরে ধীরে তার জ্ঞান আসছে।

মা-মহাজ্ঞান—এবং জ্ঞানের কার্যালয়টা বেশী বলে, ছড়িয়ে পড়ে বলে, সেইজন্য জ্ঞানের প্রচারটা বেশী হয়ে যায়। শক্তি একটু চাপা থাকে।

প্রসাদ—আচ্ছা তুমি বলছ, পুরুষ হচ্ছে খাপ-খোলা তলোয়ার এবং নারী হচ্ছে সেই খাপ। সেই অর্থে একটি জ্ঞান একটি শক্তি।

মা-মহাজ্ঞান—দেখেছ তো, পুরুষ হচ্ছে খাপ-খোলা তলোয়ার। লক্ষ্য করছ? তাহলে সেই তলোয়ারটাকে একটা শক্তি যেয়ে আটকে দিচ্ছে। দেখতে কি? না, একটা খাপ। খাপটা এবারে চিন্তা কর খাপটার কাজ কি। খাপের কর্ম কি? শক্তি। আটকে দিচ্ছে যেয়ে। কিন্তু ব্যাখ্যাটা কার বেশী? তরোয়ালের। খুন করে সে। রক্ত দেখা দিচ্ছে কার জোরে? খাপের মূল্য কি বেশী? না। কেন, না এটা খাপ বলে। কিন্তু এরই ব্যাখ্যা বেশী পাচ্ছে তোমরা তরোয়াল। বুঝেছ?

এবার বল এই খাপ যদি না থাকতো এই তরোয়ালকে গাইড করে চলতো কে? তরোয়ালের শক্তি কে? ঐ খাপটা। সে মূলতঃই শক্তি।

প্রসাদ—তরোয়ালের নিরাপত্তা বলা যায়। নিরাপদ রেখেছে।

মা-মহাজ্ঞান—নিরাপদ রেখেছে মানে সব সময় সে গার্ড করে রেখেছে। একে আগে দরকার হয়েছে। তরোয়াল যখনই করেছে একটা খাপ চিন্তা করতে হয়েছে! খাপ না হলে একে রাখা যাবে কি করে? ছুটোকেই ঠিক প্রয়োজন পড়ে যাচ্ছে।

প্রসাদ—শক্তি বলতে নারী আর জ্ঞান বলতে পুরুষ—মানব কেন? যদি এমন বলা যায় যে, উভয়ের কাছে তরোয়াল আছে উভয়ের কাছে খাপ আছে? একটি বড় তরোয়াল একটি ছোট তরোয়াল। একটি বড় খাপ একটি ছোট খাপ।

মা-মহাজ্ঞান—নাঃ, তা বলতে পার না। নারীকে শক্তি অর্থেই ধরবে। তরোয়াল নারী নয়। এইজন্য বলা হচ্ছে—নারী যে তরোয়াল না, সে তরোয়াল মরচা ধরা। কার্যকরী নয়। তাকে ধার না দিলে সে ধার পায় না। তার যেটুকু নিজস্ব ধার উঠে না, সঙ্গে সঙ্গে তার ধার যাবারও রাস্তা আছে। ধার উঠেও যেমন, ধার পড়েও তেমন। একদিকে ধার উঠছে আর একদিকে ধার পড়ছে। কিন্তু পুরুষের জ্ঞানের যখন ধার উঠছে না, ধার পড়বার আর রাস্তা নেই। এমন একটা জায়গায় যেয়ে তার ধার পড়ছে, সেই জায়গায় সে তরোয়ালের কাজ করলেও ধার পড়বে, না করলেও ধার পড়বে। আর এর ধার উঠছেও যেমন ধার পড়ছেও তেমন।

ধার আছে ঠিক কথা। তরোয়াল ঠিক কথাই। কিন্তু তরোয়ালের ধার পড়ে যাচ্ছে যে। এমন কতকগুলো জিনিস নারীর কাছে আছে বা শক্তির কাছে আছে, বল—শক্তির কাছে এমন কতকগুলো জিনিস আছে যে, সমস্ত সে শক্তি দিয়ে দমন করে দিচ্ছে। এঁ্যা? আচ্ছা, জ্ঞান যেমন যে—এমন কতকগুলো জায়গায় পা ফেলে পেরিয়ে যাচ্ছে, আবার এমন কতকগুলো জায়গা আছে যে, সেখানে সে যেয়ে আটকে

যাচ্ছে। আটকে গেলে সে জ্ঞানের দ্বারাতে আবার অন্য রাস্তা দিয়ে বেরোচ্ছে। বেরোলেও, ঐখানে যে পড়ে গেছিলো, সেটা রাষ্ট্র হয়ে যাচ্ছে। এবং শক্তির দ্বারাতেই তাকে তুলে আনা হচ্ছে। সেই শক্তি।

প্রসাদ—তাই তো? তা যদি বল মা এখন জ্ঞান আর শক্তি অবিচ্ছেদ্য তো? তাহলে আমাদের একক জীবন কেন? যখন শক্তি ব্যতিরেকে জ্ঞান হয় না, তখন? আমরা সেই জ্ঞান সাধনায় এসছি তো? তাহলে আমাদের পাশে শক্তি কোথায়?

মা-মহাজ্ঞান—আচ্ছা। এবার বল। সে শক্তি তোমাদের পাশে আসতে পারে, আসা উচিত, কিন্তু সেখানে আসছে না। 'জ্ঞান' বিচার করে দেখছে, আমরা 'শক্তি'কে রাখতে পারব না। এ্যাঁ, শক্তির খোরাক যা, সেটা আমরা দিতে পারব না। তার যে খরচ, সেটা আমরা বহন কবতে পারব না। সেখানে 'জ্ঞান' বিচার করে দেখছে, দেখে সরে যাচ্ছে শক্তির কাছ থেকে।

আমাদিগে যেমন একদিকে সে শক্তি দেবে, আবার অনেক দিক থেকে আমাদের বে-ঘটন ঘটাবে। কিন্তু শক্তি সে কোথাও হরণ করবে না। সে জ্ঞানের কোথাও হরণ করবে না। কিন্তু সময় দেরী করিয়ে দেবে বেশ কিছু।

কিন্তু খাপ না থাকলে তো তরোয়াল এলোমেলো চালানো হয়ে যাবে, দিলীপের এ কথার উত্তরে না গিয়ে "মা-মহাজ্ঞান" বলে চলেন নিজের ধারায়।—আচ্ছা। এবার বল, সেই শক্তি তোমাদের কাছে এসেছে। সেটা মহাশক্তি রূপে এসেছে। আচ্ছা, সেই খাপই তোমাদের কাছে এসেছে। মহাখাপ হিসাবে এসে গেছে। তরোয়াল অনুযায়ী এ খাপ আসে নি।

প্রসাদ—তাহলে কি বলতে হবে যে, তোমাকে যারা পায় নি জীবনে বা তোমার মত যাদের জীবনে কেউ নেই, তাদের জ্ঞানের অপপ্রয়োগ হবে?

মা-মহাজ্ঞান—হুঁ। হয়েছে। হয়ও হবেও। হয়েছে হয় হবে। একটা পুরুষের কাছে যা আছে একটা নারীর কাছে তা নেই।

তাহলে তুমি পুরুষ তোমাকে সেই নারী দরকার—তার কাছে সেই পাওনা দরকার, অনেক কিছুই আছে। এখানে তোমাকে খাপের চাইতে ঢের বেশী দেওয়া হচ্ছে। তরোয়াল খাপ খোলা হলই বা। একটা খাপের মধ্যে একটা তরোয়ালকে রাখতে তার খাপটা কতটুকু দরকার হয়, এ্যাঁ? কিন্তু এ করল কি গোটা গণ্ডীটায় ছাউনি দিয়ে দিল। গোটাটায় চালা ফেলে দিল। কংক্রিট করা ছাদ ফেলে দিল। গোটাটাকেই সে ঘেরে ফেলল খাপ হয়ে।

প্রসাদ—তাহলে গোটা ছাউনির মধ্যে যতগুলি তরোয়াল আছে তাদের মধ্যেই তো গণ্ডগোল লেগে যাবে।

মা-মহাজ্ঞান—আচ্ছা করে দিল তো? দিয়ে আটকে দিল। যতগুলো আছে ততগুলোর মধ্যে করছে না কিন্তু। একটির উপরেই করছে এত বড় ছাউনিটা। আবার যতগুলোকে বলছ কেন! আচ্ছা যতগুলির উপরে তত ছাউনি পড়ছে। একটির উপরে কি করে হতে পারে এটা।

মহাশক্তি। সে তো শুধু শক্তি নয়। অর্থাৎ কি না, নারী—সেই নারীই তোমাদের জীবনে এসেছে। এবার নারী কে? মা। সব কিছুই তোমাদের সে দিয়ে যাচ্ছে। উঁ? আচ্ছা। একটি জায়গায় তোমরা অভাব বোধ করছ। যে জায়গায় তোমরা অভাব বোধ করছ না, তার উপর দিয়ে স্তূপাকার করে ভরে দিচ্ছে সে। সেইখানে তোমরা সেই স্তূপাকারে দাঁড়িয়ে দেখছ—ওটা নিচু। আমরা দাঁড়িয়ে আছি তার চেয়ে উঁচুতে।

অর্থাৎ কি না আমার জীবনে যদি বিয়ে করতাম—একটি শক্তিকে ডাকতাম, তার এই এই ব্যবস্থা। সমস্তই মায়ের কাছ থেকে আমরা পাচ্ছি শুনতে দেখতে বুঝতে। অতএব আমরা নারাজ। সেই উঁচুতে দাঁড়িয়ে নিচুটাকে দেখতে পাচ্ছ। ঐজন্যে শক্তিকে আর দরকার হচ্ছে না।

প্রসাদ—তবু বাস্তব মা একটা কথা তো বলবে—সর্বদিকের জ্ঞান দিয়ে ভরিয়ে দিলেও আমার একদিকের জ্ঞান নেই। বেটা সেই

সহজাত বা সাধারণ বোধ থেকে আসছে। নারী পুরুষের যুক্ত জীবন থেকে আসছে যে জ্ঞানটা।

মা-মহাজ্ঞান—সেইটার জন্যই, ঐ যে উঁচু থেকে দেখতে বলছে না, এতগুলোর বিচার ফেলে দিচ্ছে না—এই বিচারের মাধ্যমে বলছে, তুমি এই নিচুতে নেমে এসো। আমার আপত্তি নেই তাতে। এ্যাঁ, মহাশক্তি কিন্তু আপত্তি করছে না। নেমে এসো। মা কিন্তু আপত্তি করছে না। কিন্তু নেমে এসে সমস্ত দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে। সেখানে তুমি 'না' করতে পারবে না। মায়ের একটা কথা শুনলে আর একটা কথা শুনতে হচ্ছে। মা তো না করে যাচ্ছে না। না করছি না তো।

যে সংঘর্ষ লাগবে সেই সংঘর্ষে যে তাপ উঠবে সেই তাপ তোমাকে বহন করতে হবে। তুমি সেইখানেই বলছ—না, আমি জ্ঞানী। আমি তাপ সহ্য করতে পারব না। আমার চামড়া এত পাতলা—না পুড়ে যাবে। পুড়ে গেলেই আমার সাদা রং বেরিয়ে যাবে। জ্বালা করবে। বারণ কিন্তু করবে না সে।

প্রসাদ—স্বামী স্ত্রীর একত্র জীবনে মা, যে প্রত্যক্ষ যৌন জ্ঞানটা, আর একটা সন্ন্যাসীর জীবনে যে পরোক্ষ যৌন জ্ঞান—এই দুয়ের তফাৎ কি মা ? ধরে নিই বীর্য ধারণ শক্তির উৎস, জ্ঞানের গোড়ার কথা।

মা-মহাজ্ঞান—স্বামী স্ত্রীর জীবনে প্রত্যক্ষ যে যৌন জ্ঞান আসছে, তার চাইতে যদি সেটাকে কেউ দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করে—করে ত্যাগী হয়, ত্যাগ করে, তাহলে পরে সন্ন্যাসীর চাইতে সে অনেক উচ্চ স্তরে দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু তুমি জেনে রেখো, স্বামী স্ত্রীর জীবনে কোনদিন এভাবে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। আমি বলে যাচ্ছি। বুঝতে পারছ ? অতএব সন্ন্যাসীরই জ্ঞান বেশী হবে ওখানে।

স্বামী স্ত্রীর জীবন গণ্ডীর মধ্যে। কতটুকু তারা বলতে পারবে। বেশী বলতে পারবে না। সন্ন্যাসী সে পরোক্ষে জ্ঞান কি ভাবে লাভ করবে ? বহু ভাবে বহু রকমে রূপান্তরিত তাকে দেখা দেবে। এসে

এসে তার কাছে পড়তে থাকবে। সে সমস্ত খুলে খুলে বিচার করতে থাকবে। করে পেয়ে যাবে যৌন জ্ঞানটা। সন্ন্যাসীর জীবনে ক'জন? কজন শুনতে পারবে? কিন্তু স্বামী স্ত্রীর জীবনে? শুনতে পারবে। একক জীবন তাদের। তারা স্বামী স্ত্রীর কথাই বলতে পারবে।

আর সন্ন্যাসী? সকলেই তো তার পায়ে এসে পড়ছে। এ্যাঁ? এমন একটা অবস্থা আসবে যে তার কাছে সকলকেই ছুটে আসতে হবে। সাধারণ সন্ন্যাসী যদি হয় তার কাছে ছুটে আসবে। এবার বোঝ যদি অসাধারণ সন্ন্যাসী সে হয়, তাহলে অসাধারণ ভাবে তার কাছে খুলে খুলে এসে পৌঁছে যাবে। সাধারণের কাছে যা আসবে, তার কাছে গৃহস্থ দাঁড়াতে পারবে না। বহু লোক এসে একটা জায়গায় বেদনা জানায়। একটা জায়গায় এসে তারা বেদনা জানায় কি, উঁ?

ধন যৌবন অস্থায়ী। তারা যখনই অস্থায়ী হয়, তখনই সে ধর্মের আশ্রয় নেয়। তারা স্থায়ী নয়। সে সেইভাবেই জানতে পারবে। উঁ?

.কোন স্বামী স্ত্রীতে একক জীবন কাটিয়ে তারপরে সে যখন দাঁড়ায় —আমি সাধনা করব, জেনে রেখো, আমি বলে রেখে যাচ্ছি—তারা জীবনের শেষ সময় বিধ্বস্ত অবস্থায় যেয়ে দাঁড়াতে চায়। তখন দাঁড়ালে পরে যেভাবে তারা খরচ করেছে, জানবে, জ্ঞানের বহু ধাপ নিচে নেমে গেছে। তার নেই কিছু। বার্ধক্যে সে যেয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সে কোথা পাবে সে জ্ঞান!

এ্যাঁ, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করতে হলে প্রত্যক্ষ সময় দাঁড়িয়ে, ঠিক সময়ে বিচার নিয়ে আসতে হবে। অর্থাৎ কি না, ষোল বছর আঠারো বছর কুড়ি বছর বাইশ বছর চব্বিশ বছর।

প্রসাদ—কেন, কেউ স্বধর্ম পালনের মধ্যে যদি মা, পরিমিত বোধ নিয়ে আসে?

মা-মহাজ্ঞান—পরিমিত? পরিমিত বোধ আনতে পারে? পরিমিত আনতে পারে, কিন্তু ত্যাগ?

প্রসাদ—পরিমিত বোধটাই তো একটা ত্যাগ।

মা-মহাজ্ঞান—উঁ? ভুল করছ। পরিমিত বোধটা ত্যাগ, সে কি

কথা বলতে চাচ্ছ তুমি? স্বধর্ম পালন করছে। পরিমিত বোধ এঁ্যা,—পরিমিত ভাবে সে খাচ্ছে। সেই পরিমিতটা যদি সে একভাবেই রেখে যায়?

প্রসাদ—না, কমাবে।

মা-মহাজ্ঞান—এই, সেইটিই এসো।

প্রসাদ—তাহলেই ত্যাগ আসছে।

মা-মহাজ্ঞান—এই। এবং পরিমিতটা কমাচ্ছ কখন যেয়ে? সেটা হিসাব করে নেব আমি। পরিমিত তোমার কখন কমাচ্ছ, কখন কমছে? সেই হিসাবটা আগে দিতে হবে আমাকে। পরিমিত যেয়ে যদি তোমার বার্ধক্যে আসে, তাহলে বলব তা বার্ধক্যের ওজন। তার গুরুত্ব নেই।

প্রসাদ—কিন্তু একটা সন্ন্যাসীর যৌবনে নিজেকে নিয়ে খেলা যা, একটা সংসারীর যৌবনে স্বামী স্ত্রীর খেলা—এ দুয়ের মধ্যে খুব একটা তফাৎ হবে কি?

মা-মহাজ্ঞান—তফাৎ হবে। অনেক তফাৎ হবে। একটা সন্ন্যাসী—সে নিজেকে নিয়ে খেলছে। বৎস, নিজেকে নিয়ে খেলা—কি কারণে, কেন নিজেকে নিয়ে খেলছ? পুড়ে যাচ্ছে ভিতরটা। আমি ত্যাগী সন্ন্যাসী। আমার ভিতরে এই স্পৃহা—আমি পোড়াতে পারছি না মারতে পারছি না। না না, আমাকে মারতেই হবে মারতেই হবে। তার মধ্যে দু'মিনিট দু'সেকেণ্ড খেলা চলে এলো, উন্মাদনা চলে এলো। চলে এসে বাকী সমস্ত দিক তার ভেস্তে দিল। দু'মিনিট আমি সব ভুলে গেলাম, দু'মিনিটের আগে দু'ঘণ্টা কি চিন্তা করেছি পরে বিশ ঘণ্টা কি চিন্তা করছি?

একটা স্বামী স্ত্রীর জীবনে, কি? দু'ঘণ্টা আগে কি চিন্তা করেছি আর পরে তিন ঘণ্টা কি চিন্তা করেছি—এত ঘণ্টাও যেতে হবে না, তিন ঘণ্টা।—আঃ! আজকের খাওয়াটা আমার তৃপ্তি হল। পরিতৃপ্তি হল। সঙ্গে সঙ্গে টুকা হয়ে গেল।

সন্ন্যাসীরও টুকা হল, সংসারীরও টুকা হল। উঃ? কি?

এখানে আরো অনেক কথা আছে, অনেক কথা আছে। বহু কথা আছে। এই একটা একটা পয়েন্ট ধরে সাধানায় বসবে। একটা একটা। কলম হারিয়ে গেলেও জানবে, বাণী কখনো হারাবে না। বাণী পড়ে রইল। এক একটা ধরে বিচার আনতে চাইবে। কলমটা হারিয়ে গেলেই কি হয়ে গেল? এ্যাঁ-হ্যাঁ? কলমের কাজ সব পড়ে রইল। খুব বিচার করতে চাইবে।

প্রসাদ—এবার আসি পরম ব্রহ্ম—সেখানে পিতা-মাতার চিন্তা করা হচ্ছে। সেখানে মহাজ্ঞান অর্থে পুরুষ এবং মহাশক্তি অর্থে নারী বলা হচ্ছে কেন? সেখানে তো সৃষ্টির সাধারণ কথা নেই, চাওয়া-পাওয়ার প্রশ্ন নেই?

মা-মহাজ্ঞান—আচ্ছা এই যে দুটো রূপ দিয়েছে—জ্ঞান আর শক্তি, এ দুটো রূপের মানে কি বল দেখিনি? সৃষ্টির মধ্যে এ দুটো প্রয়োজন। সেইজন্যে একককে দু'ভাগ করা হয়েছে। মূলতঃই একক—শক্তি। ঐ একটি কথা। এবার শক্তি থেকে একটা ধারায় একটা খণ্ড করা হয়েছে জ্ঞান। মহাজ্ঞান আর মহাশক্তি। এবার মহাশক্তি বিভিন্ন ধারায় বেরিয়ে যাচ্ছে। মহাজ্ঞানও বিভিন্ন ধারায় বেরিয়ে যাচ্ছে। মহাজ্ঞানেরও বহু নাম পাবে, মহাশক্তিরও বহু নাম পাবে। কিন্তু সবকে যখন গুটিয়ে নিয়ে এসে খাপে পোরা যাবে, তখন এক 'শক্তি'। আর কিছু নেই। বুঝতে পারছ?

প্রসাদ—তুমি তাহলে বলছ মা, আদি বলতে মহাশক্তি। এবং সেই মহাশক্তিরই একটা রূপ হচ্ছে মহাজ্ঞান। কেন, এমন কল্পনা করা হয়েছে কেন? যদি আদিই হবে মহাশক্তি তবে মহাজ্ঞান কেন তার উপরে আসন পেল?

মা-মহাজ্ঞান—কৈ আসন পায় নি তো।

আচ্ছা এবার দেখ পরিচালনাটা কার বেশী?—পুরুষের। সেইজন্য গুরুত্বটা তাকে দেওয়া হচ্ছে বেশী। বুঝতে পারছ?

বাড়ির মধ্যে যখন একটি রাঁধুনী নিয়ে এসেছ—তোমার বয়স যখন

পাঁচ বছর তখন বাড়িতে একটি রাঁধুনী ছিল তোমাদের। তোমার বাবা সেই রাঁধুনীটিকে নিয়ে এসেছিল। সেই রাঁধুনীর বয়স তখন ছিল বছর আঠারো কি কুড়ি। বুঝেছ? এখন তোমার বয়স হিসাব করা যাচ্ছে তিরিশ থেকে পঁইতিরিশ। তাহলে এবারে রাঁধুনীটির বয়স কত হচ্ছে? হিসাব কর।

এবার তোমার একটা কোন সমস্যা এসেছে। যখন তোমার বাবা নিয়ে এসেছিল তখন তোমার বাবা মা—অনেকেই ছিল হয়তো পরিবেশের মধ্যে। আজকে তুমি দেখছ তোমার ডায়ে বাঁয়ে কেউ নেই। তখন কোন একটা কাজ করতে গেলে সেই রাঁধুনীর কথামত যাও আর আসো কেন বলদেখিনি, তাকে জিজ্ঞেস কর কেন? সে তো মূলতই তোমার বাড়ির রাঁধুনী।

প্রসাদ—এ উদাহরণ কেমন হল মা! মহাজ্ঞানের বাড়ির রাঁধুনী নিশ্চয় মহাশক্তি নয়।

মা-মহাজ্ঞান—মহাশক্তির বাড়ির রাঁধুনী হচ্ছে মহাজ্ঞান। তার গুরুত্ব তোলা হয়েছে। তার কাজকর্ম দেখে তাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ঐ তো বললাম তোমাকে আমি। তোমার বাবা সেই রাঁধুনীটিকে এনেছিল তখন তার এই বয়স ছিল। আঠারোএ এসে ছিল। ষাটের পঞ্চাশের কোঠায় এখন সে। এখন তুমি বাড়িতে একা পড়ে গেছ। তুমি কার ছেলে বলদেখিনি প্রথমতঃ? এ্যা, কার ছেলে তুমি—সেই মুনিবের ছেলে?

তুমি বন্ধুর কাছে বলছ—না ভাই, মাসীমা বকবে তাড়াতাড়ি যাই। বকবে আমাকে, দেরী হয়ে গেছে। না ভাই ছেড়ে দে!—আরে থাম, তোর মাসীমা বকবে! তা কি হয়েছে তাতে?—নারে নারে মাসীমা ভীষণ রাগ করবে, না আমাকে ছেড়ে দে ছেড়ে দে।—আরে, মাসীমা মাসীমা করছিস কি, ও তো তোদের বাড়ির মূলতঃ রাঁধুনী।—এই, ওকি কথা বললি! আমি তাহলে তোর সঙ্গে আর কথাই বলব না। তুই মাসীমাকে এইরকম কথা বলছিস! নাঃ ও রকম কথা কখনো বলবি না।

কিন্তু সে ভাল করে জানে, তার বাড়ির রাঁধুনী। তার যোগ্যতা এতদূর উঠেছে বলে, আজকে তারা রাঁধুনী বলতে চায় না তাকে। এবং ছেলেটি জানে—আমার বাড়ির রাঁধুনী। কিন্তু আমি যদি দেরী করে যাই, আমাকে মাসীমা বকবে। কেন না, মায়ের পর্যায়ে তাকে আসন দেওয়া হয়ে গেছে। সে এতদিন এভাবে কাজ করে আসাতে, এঁ্যা, তার কর্ম দেখে তাকে এই বিচার করা হয়েছে।

সে এখন রাঁধুনী নয়। সে এখন মায়ের পর্যায়ে বসেছে, বাড়ির গিন্নী। কেন ? না তার সত্য সততা দেখে, তার কর্ম দেখে। কোনদিন মায়ের অভাব তুমি পাও না। কোন বিষয়েই তুমি কোন অভাব বুঝতে পার না। সে সব জায়গায় তোমার অভাব পূরণ করেছে। পূরণ করেছে বলেই সে হয়ে গেছে কি ? না, মা। কিন্তু সে তাহলে মূলতঃই কি তোমার মা ? তোমার মনের মধ্যে কে স্থান পাচ্ছে ? উঁ ? গর্ভধারিণী মা আর মাসীমা। কিন্তু ভাবে ব্যাখ্যায় হয়ে গেছে কি, এই আমাদের বাড়ির মা।

আসা যাওয়া করছে লোকজন দেখছে একটি গিন্নী বেরোচ্ছে ঢুকছে। ছেলে তার কাছে যেয়ে খাবার চাইছে। ছেলে তাকে নিয়েই সব করছে। মা অন্তরায়। বুঝেছ ? সেইরকম জানবে মহাজ্ঞান মহাশক্তিতে খেলছে।

প্রসাদ—ও, তাই তুমি বলছ—সবের উপরেই শক্তি। জ্ঞানের বিচার জ্ঞানের প্রয়োগ ইত্যাদি দেখে জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া হয়েছে।

মা-মহাজ্ঞান—সে অন্তরায় হয়েছে, সরে গেছে। আছে সে। সেই মহাজ্ঞানের কাছেই মহাশক্তি রয়েছে। উঁ, মাসীমা ভাল করেই জানে এর মা আছে। আর মনে মনে মাসীমা গুরুত্বও দিচ্ছে তাকে ঠিকই। কিন্তু সব সময় কি বলবে, এর মা ছিল, এর মা আছে এর মা আছে ? এ কথা তো বলা যায় না।

কার্যকলাপে কি ?—আঃ বেশ জ্ঞান তো ? আঃ সুন্দর—অসাধারণ জ্ঞান, এ্যাঃ ? মহাশক্তি থেকেই এই অসাধারণ জ্ঞান, এই মহাশক্তি

থেকেই এই মহাজ্ঞান—এরকম কি বল ? না মহাজ্ঞান মহাজ্ঞান বলেই কথাটা বল ? তাহলে বল বলে মহাশক্তির সব শেষ হয়ে যাচ্ছে না কি ? সে তো রয়ে গেল জিভের তলায়। জিভের ডগে যেটা, সেইটিই ব্যাখ্যা হতে রইল।

প্রসাদ—যথা সত্যের বিভিন্ন ব্যাখ্যা কি যুক্তিগ্রাহ্য ? যদি যুক্তি রাখতে পারে, তাহলেই গ্রহণীয় হবে, ব্যাখ্যা বিভিন্ন হতে পারে। একটা অঙ্ক নানাভাবে করা যেতে পারে, কিন্তু উত্তর তো একটাই হবে।

মা-মহাজ্ঞান—হুঁ, হুঁ।

প্রসাদ—আচ্ছা, আদি সত্যে উপনীত হওয়ার পথ কি বিচিত্র ? হতে পারে, কেউ সংসার করবে, কেউ সংসার করবে না। সে যদি বলে ভোগের মধ্যে দিয়ে পাব, না করার কিছু নেই। বিচিত্র পথে আমরা যে যেখানে পৌঁছাই না কেন, প্রাপ্তি তো একটা কথাই বলে। যেমন, অঙ্কের একটাই উত্তর হয়, প্রাপ্তিও নিশ্চয় একটা কথাই বলে ? সেই সূত্রে সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে বিজ্ঞান এক কথা বলবে, অধ্যাত্ম ভিন্ন বক্তব্য রাখবে—এ কি করে হয় ? বাইবেল সৃষ্টি সম্বন্ধে এক কথা বলছে। বিজ্ঞানীরা ডারউইন থেকে শুরু করে মতামত একরকম নিয়ে আসছেন। কিন্তু সবকে সমন্বয় করে—সমন্বয় ঠিক নয়, সবকে নস্যাৎ করে, নস্যাৎ তো ঠিক নয়, সবকে একপাশে সরিয়ে মা-মহাজ্ঞান তাঁর বক্তব্য রাখলেন।

মা-মহাজ্ঞান—আর একটা কথা বল, সাবেক কোন কথা না শুনে নিজের কথাই নিজে বলে গেল।

প্রসাদ—নিজের কথাই নিজে বলে গেলেন তো। আমি দেখলাম যে, তুমি তোমার বক্তব্য রাখার জন্যই মা সব একপাশে পড়ে গেছে, সেটা বিচার হবে।

মা-মহাজ্ঞান—সেটা এবারে তুমি যেমন বিচার এনেছ, সেইরকম

বিভিন্ন ধারায় সবাই বিচার আনবে।

প্রসাদ—এখন মা একটি জিজ্ঞাস্য—যার যা গবেষণা বা উপলব্ধি তার তাই প্রাপ্তি। এখন "মা-মহাজ্ঞান" জীবন দর্শন যে পরম প্রাপ্তির কথা বলে, তা কে কাকে বোঝাবে?

মা-মহাজ্ঞান—তাই তো, কেউ কাউকে বোঝাতে পারবে না।

প্রসাদ—তাহলে এখানে একটা সমস্যা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে না কি? যেমন চিরকালের সমস্যা—বাইবেলের সঙ্গে ডারউইনের গণ্ডগোল চলছিল। আজ আবার সেটা উঠে পড়েছে আমেরিকায়, সেরকম এটা নিয়েও কি চলবে একসময়?

মা-মহাজ্ঞান—হ্যাঁ।

প্রসাদ—কেন চলবে তা?

মা-মহাজ্ঞান—স্বীকার করে নিতে পারবে না।

প্রসাদ—যথার্থ সত্যকে কেন মানবে না।

মা-মহাজ্ঞান—মেনে নিতে পারবে না ঝপ্ করে।

প্রসাদ—কেন না, পর পর যুক্তির ধারায় যেগুলো পড়ছে তাকি—

মা-মহাজ্ঞান—যুক্তির ধারায় যেগুলো পড়ছে তারা ঝপ্ করেই সংস্কারবশতঃ মেনে নিতে পারবে না।

প্রসাদ—কিন্তু এককালে গিয়ে মানবে না কি? এককালে যেয়ে প্রত্যেকেই কি একমত হবে না?

মা-মহাজ্ঞান—হ্যাঁ, তা হতেই হবে। হতেই হবে। যত বুদ্ধিজীবী আসবে যত যুক্তি আসবে, ততই সেই যুক্তির ধারায় পড়ে যাবে।

প্রসাদ—আচ্ছা এখানে কি মা একটা ফাঁক নেই এইরকম যে, তোমার যুক্তিগুলো সমস্ত তো সাধারণ বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়। সাধনাসাপেক্ষ। সাধনা ক'জন করতে আসবে মা?

মা-মহাজ্ঞান—সাধনা করতে হবে না। সাধনা করতে হবে না বা সাধনা করতে হবে। জন্মাবার পরই সাধনা শুরু হয়ে গেল। উঁ? বেশ? না মানুষের চলার পথ জীবন ধারাই তার সাধনা। এবার সেই সাধনাকে সীমিত করে কেউ নিয়েছে, কেউ বা সীমাহীন করেছে।

ধারার বিভিন্ন মুখ ঘুরে গেছে। যা কিছু করছ, সবই সাধনা। সবই সাধনা। প্র্যাকটিক্যালের উপর দাঁড়িয়ে আছে। তোমার মনে একটা উদয় হল সেইটা নিয়ে তুমি ধরলে সেই নিয়ে তোমার গবেষণা শুরু হল। তারই বিভিন্ন ধারায় তুমি সব উত্তর বের করতে রইলে। করে তুমি সাধনায় উত্তীর্ণ হলে। যে কোন ধারায় যাও সাধনার প্রশ্ন আছে।

এখন বলবে—এদের নাম কেন সাধনা দেয় নি? এগুলো কিছু গ্রাহ্যের মধ্যে আসতে পারছে না বলে। সেইজন্য এদের সাধনা নাম দিয়ে যাচ্ছে না। একে শুধু জীবন্ত অবস্থায় বাস্তব গ্রাহ্যের মধ্যেই ফেলে রাখা হচ্ছে। অধ্যাত্ম গ্রাহ্যের মধ্যে একে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না বলেই সেইজন্যে সাধনা এর নাম নয়।

তুমি চেয়েছ, খেয়েছ, পেয়েছ, চাওনি খাওনি পাওনি, এক ধারা। কিন্তু তুমি চেয়েছ, খেয়েছ, খাওয়ার স্বাদ বিতরণ করেছ। যে খাওয়াতে সকলে অভ্যস্ত—যে খাওয়ার জন্য সকলে পাগল—যে খাওয়ার জন্যে সকলে প্রত্যাশায় বসে আছে, সেই খাওয়াকে অতিক্রম করে তুমি কি খাওয়াই খেয়ে আছ। ঐখানেই গ্রাহ্যের হয়ে গেল। বিচার হয়ে গেল। সেই বিচার্য বিষয়টিকে নিয়ে গবেষণা শুরু হয়ে গেল। তারই নাম সাধনা। এবং তুমি না খেয়ে করেছিলে সেই দৃষ্টান্ত পড়ে রইল। কি কি করেছিলে।

এটা একটা কথায়—এক কথাতে বলা যাক। পুতুল। মাটির পুতুল, কাঁচের পুতুল, সোনার পুতুল, পিতলের, লোহার—এই এক একরকমের। হীরার পুতুল। সব চেয়ে নিকৃষ্ট যেটি সেটি হল মাটির পুতুল। ধুয়ে গেলেই সবার সঙ্গে মিশে গেল।

প্রসাদ—আচ্ছা মা, অভিজ্ঞতা যেমন প্রমাণ সাপেক্ষ, উপলব্ধিও কি তেমন প্রমাণ সাপেক্ষ?

মা-মহাজ্ঞান—নাঃ, উপলব্ধি সব সময় প্রমাণ সাপেক্ষ বলতে পারি না। তবে কিছু দূর বলা যেতে পারে।

প্রসাদ—কিছু প্রমাণ। যেমন তুমি বলছ—

মা-মহাজ্ঞান—কিছু কেন, বেশ কিছু কে প্রমাণ রেখে যাবে। প্রকৃত উপলব্ধি হলে বেশ কিছু প্রমাণ রেখে যাবে।

প্রসাদ—মা, আপনার 'সৃষ্টি রহস্য ভেদ' প্রচ্ছন্ন ভাবেই বলছে—যা কিছু সব একান্ত স্বাভাবিক নিয়মের ডোরে বাঁধা, হয় ছয় নয় যাবতীয় সব 'অটোম্যাটিক'।

মা-মহাজ্ঞান—হ্যাঁ।

প্রসাদ—তাহলে কি কোথাও কারো কোন ভূমিকাই নেই?

মা-মহাজ্ঞান—না।

প্রসাদ—ঈশ্বর বলে একজনকে স্বীকার না করলে তো ভয় থাকে না। এবং ভয় না থাকার দরুন যা কিছু বিভ্রান্তি বা ব্যভিচার চলে আসে।

মা-মহাজ্ঞান—সেটা কথা হচ্ছে "মানি তো আপসে নইলে মানায় কার বাপসে"। ঈশ্বর বলে স্বীকার করাটা সেটা যে যার ব্যক্তিগতর উপর নির্ভর করছে। এবার সেই ব্যক্তিগত এলো কোথা থেকে? না 'পাওয়ার' অনুযায়ী।

স্বাভাবিক ধারায় নিয়মের ডোরে বাঁধা। যা হবার তাই হচ্ছে। আচ্ছা, এবার কথা হচ্ছে, ভূতই বল আর ভগবানই বল—একটা ভয় সৃষ্টি করা হয়েছে। এবং সেই ভয় যে কি, সে আবিষ্কার এখনো পর্যন্ত হয় নি। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই ভয় আছে, এবং ভয়ের রূপ বিভিন্ন ধবনের। একই রকম তার রূপ নয়। কেউ ভগবানকে ভয় করে, কেউ ভূতকে ভয় করে, কেউ ডাকাতকে কেউ গাড়ি-ঘোড়াকে ইত্যাদি ইত্যাদি। নানা ধরনের ভয়। তাহলে সমগ্রকে নিয়ে বিচার করতে গেলে, একটা ভয়। তাহলে দেখেছ, ব্যক্তিগতর উপর নির্ভর করছে ভয়টা। ভগবান বলেও কিছু নেই আর ভূত বলেও কিছু নেই। এ যেন অটোমেটিক সৃষ্টি করা। একটা পাওয়ার বলতে পার।

প্রসাদ—তাহলে পরে এই অনাচার বা ব্যভিচারের হাত থেকে মানুষকে যে একটা ভয় দেখিয়ে সরিয়ে রাখা—'জন্মান্তর আছে।

বুঝলি, এ জন্মে যা করবি পরজন্মে তার ফলভোগ করতে হবে'—এই যে কথাগুলো আছে, এ কথাগুলো কি বাধা দেয় কোন ?

মা-মহাজ্ঞান—হ্যাঁ। অবান্তর নয় কথাগুলো।

প্রসাদ—তা এই যে আপনি ভেঙে দিলেন সব,—কিছু নেই, কোথাও কিছু নেই, এর দরুন কি মানুষ বেপরোয়া হয়ে যাবে না ?

মা-মহাজ্ঞান—আচ্ছা, যেমন বেপরোয়া হবে তেমন স্বাবলম্বী হবে। যা করব এই জন্মেই। তার যত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সব এ জন্মেই আমার। জন্মান্তর বলে কিছু নেই। আচ্ছা এই একটায় যাবে। তাহলে মানুষ একটা সত্যের ধারাকে বুঝতে পারবে।

আবার একটা কথা বল যে এই যে ভয় দেখানোটা—এতে লাভও ছিল ক্ষতিও ছিল। তখনো যেমন লাভ-ক্ষতি ছিল, এখনো তেমনি লাভ-ক্ষতি আছে। আমি যে এটা ভেঙে দিচ্ছি, এই ভেঙে দেওয়ার মূলে লাভও ছিল ক্ষতিও ছিল। তখনও ঠিক ভেঙে দেওয়ার মূলে লাভও ছিল ক্ষতিও ছিল। অযথা একজনকে ভয় দেখিয়ে তাকে যা তা করা হত।

এবার বল, ভয় দেখালেই কি ভয় দেখবে ? ভয় দেখবে না। কেউ কাউকে ধর্মের ভয় দেখালে সে কি দেখে ? কেউ কাউকে ডাকাতের ভয় দেখালে কি দেখে ? দেখে না। আবার যে দেখে সে দেখে। তাহলে সবই যদি নিয়মের ডোরে বাঁধা, তাহলে এগুলো কিছু নয়।

প্রসাদ—যথা সত্য ব্যক্ত হল ঠিকই। কিন্তু যদি কেউ মনে করে এর জন্যে মানুষের পাপ পুণ্যের বোধ ঘুচে যাবে—সে ইচ্ছামত এ জীবনে পাপ করবে, তা কেন করবে সে ? যদি সে করে, সে করবার মতন বলেই সে করবে। উ, যদি সে না করে, তাহলে সে করবার মতন নয় বলেই সে করবে না।

মা-মহাজ্ঞান—হুঁ। আবার একটা কথায় এসো। জন্মান্তর আছে বা নেই সেটাও ব্যক্তিগতর উপরে বলেই বলে যাচ্ছি। তুমি নেই জন্মান্তরটাকে বলতে পার না। (বলিষ্ঠ 'না') জন্মান্তর আছে তাও বলতে পার না। (হাল্কা 'না') বলতে পার না। না হলে বলবে,

এখানে স্বরটা কেন নেমে গেল ? তা নয়। তাহলে মূল বিচার কি হচ্ছে ? 'আছে' না নেই—'হ্যাঁ' কি 'না' মূল বলে দেন। কি করে তা বলব, 'হ্যাঁ' কি 'না'। তোমার ব্যক্তিগতর উপরে তো। আপনি কি বলতে চান ?—আমি বলছি 'নেই'। আমি বলছি 'নেই'। শেষ কথা নেই। শেষ কথা 'আমি বলছি নেই'। কিন্তু তোমার মধ্যে 'নেই' পৌঁছতে পারব না আমি।

তুমি তোমার আত্মীয়-পরিজনকে যে ভাবে চিন্তা করিয়াছ ঠিক সেই চিন্তাধারায় আর একটা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা। সম্ভাবনা নয়, সত্য। এ সব আমি আগেই সব বলেছি। নূতন করে আর কিছু বলার নেই।

প্রসাদ—না। আচ্ছা মা, মানুষ মাত্রেই চিরকালের নাবালক। সে এতখানি স্পৃহার কাছে অসহায় যে সাবালকত্ব তার কোনদিনই আসে না। প্রকৃত জ্ঞান গবেষক যে, সেই হয়ত সাবালক হতে পারে। তা একটা শিশুকে যখন ভয় দেখানো হয়—ও বাবা, যাস না ওখানে জুজু। সে ভয়ে সে সেখানে যায় না।

মা-মহাজ্ঞান—আবার চলেও যায়।

প্রসাদ—যে সাহসী শিশু সে চলে যায়। তা এটা ভেদ করতে পারে নি বলেই মা জন্মান্তর আছে, সুকৃতি কর্মফল এ সবগুলো এসছে। কিন্তু ভয় দেখানোর মন নিয়ে তো আর তারা বলে নি।

মা-মহাজ্ঞান—না। ভয় দেখানোর মন নিয়ে তারা বলে নি, যা বলেছে তারা সত্যিই বলেছে।

প্রসাদ—তারা পায় নি বলেই তাই।

মা-মহাজ্ঞান—তা যে ছল-চাতুরি করেছে, তা করে নি। তবে একবারেই যে করে নি, তা নয়। সেটা বললেও আবার কেমন। একবারে যে করে নি সেটা নয়। কথাটা এতটুকু তাকে রং রূপ দিতে দিতে সে এত বেশী বড় হয়ে গেছে যে ঐ যে তোর বাবা এসেছে ডাকছে খাবে, ঐ যে তোর মা এসেছে খেতে মাগছে, ঐ যে শুলো পাশের ঘরে ঐ যে উঠল। রং রূপের দ্বারাতে বেড়েছে।

প্রসাদ—এমন কি মা দোষারোপ করা যেতে পারে যে, আদি সত্য ব্যক্ত করার ফলে সমস্যা বেড়েই গেল। কল্যাণের মানে অকল্যাণ হল ?

মা-মহাজ্ঞান—বল বল ঠিক বলছ। কল্যাণের নামে অকল্যাণ হল। কথাটা অত্যন্ত সত্য কথা। আবার অত্যন্ত মিথ্যা কথা। অবান্তর কথা। মিথ্যা নয় অবান্তর কথা। কেন ? না, কতকগুলি ডোবা আর আঁকড় গাছগুলি কেটে দেওয়া ভাল। এবং আঁকড় গাছ কেটে দিলেই ডোবাটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ডোবার গহ্বরটাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সেখানে জল ভটভট করছে। দেখলে পরেই তখন জনতার ভিড় জমবে, মাটি চাপা দিয়ে দিবে। দিয়ে খানিকটা জমি পাওয়া যাবে। সেই জমিতে আবার ঘর-বাড়ি করতে পারবে। কতকগুলো ডোবাতে জায়গা ঘিরে রেখেছে। আর কতকগুলো ঐ রকম আগাছাতে জায়গা ঘিরে রেখেছে। ভিটিয়ে জমি ফেলে দাও। কিছু না হলেও যদি ঘর করতে নাও পারে সেখানে খানিকটা মাঠ পড়ে থাকবে। ডাঙা ডহর পড়ে থাকা ঢের ভাল, তবু সেখানে আবর্জনার সৃষ্টি যেন না হয়।

আদি সত্যের রূপ ব্যবহার করে দেওয়াতে—এই যে এত নাম, গান, কীর্তন, পূজা পদ্ধতি এই যে হচ্ছিল এত, এই হওয়াটা ধীরে ধীরে কমতে শুরু হয়েছে। এই কমার মূলে বলবে, ঘর ঘর আর সে ধরনের কেউ তো ঈশ্বর আচরণে ছুটবে না। না ছুটলেও তারা একটা অন্য কিছু করবে। অন্য কি করবে ? তারা খারাপও করতে পারে। খারাপও করবে। খারাপ করলেও তারা জানবে, একটা খারাপ কাজ করছি। কারো আড়ালে নয়। আড়াল রাখা হচ্ছে না।

পর্দার ভিতরে কি করছ পর্দাটা ফেলে দিয়ে একটা সো সীন, এসবগুলো না রাখাই ভাল। সো-টা তুলে দাও। দিয়ে যা করছ দেখতে পাবে সবাই।

বলবে এর দ্বারাতে পর্দার ভিতর থেকেই তো কাজ হবে। এরকম করে এই সংস্কার বন্ধনে বাঁধতে বাঁধতেই তো ঠিক আড়াল করা যাবে

এবং নতি স্বীকার করবে বাধ্যতা আসবে। যেমন ঐটা বলছ, তেমন আবার আর একদিক থেকে বলতে হবে যে, আড়াল খুলে দিয়ে তারা আর একদিকের স্বাবলম্বী ও মনোবলের অধিকারী হবে।

সবই নিয়মের ডোরে বাঁধা। জীবের যখন সৃষ্টি হল তখনই তার মধ্যে সব রকমের সৃষ্টি হবে। ভয়ও হল আর জয়ও হল। হল... হল, অন্যায়ও হল ন্যায়ও হল। এই সব একের পর এক তৈরি হতে রইল।

কৈ এর থেকে ও সেরকম তো আমায় দেখাল নি, বলল নি। আমি তো, উপলব্ধি করে কিছু পেলামও নি। 'দেখাল নি বলল নি' বলতে একজন দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। তা নয়, আমি উপলব্ধি করে পাই নি। আমি আমাকে দিয়েই বলছি আমি যা উপলব্ধি করেছি তা আমার দেখাতে এই রকম।

সৃষ্টির আদি হল মহাশক্তি; তারই সার্থক রূপ মহাজ্ঞান। মহাশক্তি বলতে, নারী—মা এবং মহাজ্ঞান বলতে, পুরুষ—বাবা, এ নিছকই মানুষের কল্পনা।

সকল সৃষ্টির মূল হল সেই 'ভেপার'। এমন ধারায় ভেপার আসছে যে প্রাণ সৃষ্টির সময় দু'টি দু'রকমের মূর্তি হয়ে যাচ্ছে। একই আকার, কিন্তু খুঁজে দেখতে গেলে দু'রকম পাওয়া যাচ্ছে। খুঁজে বুঝে দেখলে দেখা যাচ্ছে, এর মধ্যে যা পাওয়া যাচ্ছে ওর মধ্যে তা নেই, ওর মধ্যে যা আছে এর মধ্যে তার অভাব। সেটা সূক্ষ্ম হিসাবে। কিন্তু মোটামুটি ধারায় উভয়ই একই জিনিস।

প্রসাদ—সৃষ্টির আদিতে অর্থাৎ শুরুতে নিশ্চয় একটি পুরুষ ও একটি নারীর সৃষ্টি হয়েছিল। তার থেকে এতগুলি এবং দিনে দিনে বেড়ে চলেছে।

মা-মহাজ্ঞান—না না না তা নয়। প্রথম এক ঝাঁক সৃষ্টি হয়। শুধু মানুষ কেন যারাই মায়ের গর্ভে হয় বাপের ঔরসে, সেই সকল প্রাণীই শুরুতে ঝাঁকে ঝাঁকে সৃষ্টি হয়ে যায়। সৃষ্টির গোড়ায় তো কোন গর্ভ

ঔরসের প্রশ্ন ছিল না। ঝাঁকে বেরিয়ে এসে ধারায় দাঁড়িয়ে গেল। আবার ঝাঁক আসছে, সেই ধারার মধ্যে এসে পড়ছে। যেমন যেমন ঝাঁক এসেছে তাদের থেকে সৃষ্টি আবার তেমন দেখা গেছে। এবং বর্তমানে যাচ্ছে। কিন্তু ওখান থেকে যখন আসছে তখন ঝাঁক ধরেই আসছে।

প্রসাদ—জীব-জন্তু ও মানুষ সৃষ্টির জন্য 'ভেপার' একটা গর্ভ আশ্রয় করছে। তাহলেই একটা খোল দরকার হচ্ছে। কিন্তু প্রথম তো খোল পায় নি।

মা-মহাজ্ঞান—সেই যে গোলাকার (গর্ভ) যেন এক অগ্নিকুণ্ড, সেখানেও সৃষ্টির জন্য একটা খোল দরকার হয়েছিল। সেই হল আদি খোল। একবারেই কি প্রথম এসে একটা প্রমাণ মানুষ দাঁড়িয়ে গেল? তা হয় নি। একটা বিশেষ 'ভেপার' থেকে মানুষের জন্ম হয়।

প্রসাদ—সে খোল নিশ্চয় এ খোল নয়?

মা-মহাজ্ঞান—না। সেটা একটা অন্য খোল। আর একটা কথা জানবে, ঝাঁকে শুধু মানুষ বা জন্তু-জানোয়ার নয়, সব প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রসাদ—আচ্ছা মা, ঝাঁকে যদি মানুষই এসেছে তাহলে এমন মানুষ আগে পাওয়া যায় নি কেন? এমন জ্ঞান এমন বিবেক বুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষ আগে জন্মায় নি কেন?

মা-মহাজ্ঞান—প্রথম এই জিনিসটাকে দিয়ে কিছুটা সহ্য আনিয়ে নিল। আঘাত ধাক্কার মূলে ধীরে ধীরে এল সহ্য ধৈর্য। মানিয়ে মানিয়ে শেষকালে আসল জিনিসটা আসছে। যেমন 'রাফে' আগে করে, শেষ 'ফেয়ার' কর? সেইরকম 'রাফ' চলছিল। ঐ যে এক আনা পরিমাণ পরমাত্মার বোধ ছিল মানুষের মধ্যে, সেই বোধটাই ধীরে ধীরে বিশাল আকার নিচ্ছে। ফলে এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি দেখা যাচ্ছে।

প্রসাদ—মানুষ এককালে গরিলা বাঁদর ছিল, এ বললে দোষ কি? ধীরে ধীরে রূপ চেহারারও পরিবর্তন হয়েছে।

মা-মহাজ্ঞান—দেহের পরিবর্তন ? সেরকম কিছু হয় নি। মানুষ থেকে মানুষই হয়েছে এবং হচ্ছে। ব্রেনের বিকাশ দেখা যাচ্ছে। তার জন্য যেটুকু দেহের আকারের রূপান্তর দেখা যাচ্ছে। ওরকম জিনিস আমি পাই নি আমার উপলব্ধিতে। যদি বিজ্ঞান বলে আছে—বিজ্ঞানের সঙ্গে আমার যুক্তি-তর্ক নেই। বিজ্ঞানকে আমি পাচ্ছি না। কিন্তু আমি উপলব্ধি করে যা জেনেছি, তাতে যে সব প্রাণী তোমরা এখন দেখতে পাচ্ছ, সেই রকম ধারায় এককালে সব সৃষ্টি হয়েছে। বাঁদর থেকে মানুষ হয়েছে—এ আমি পাই নি উপলব্ধি করে। এক এক ঝাঁকে বেরিয়ে এসেছে তারপর ধারায় দাঁড়িয়ে গেছে। তারপর সেই ধারার অদল-বদল চলছে—রূপান্তর চলছে। কিন্তু এ ধারা থেকে ও ধারায় সৃষ্টি—তা আমি পাই নি।

প্রথম সৃষ্টিটাই—যখন বাঁদর হবার বাঁদর হল, বাঘ ভালুক হবার বাঘ ভালুক হল, গাছপালা হবার গাছপালা হল, মানুষ হবার মানুষ হল—যা দেখেছ, আজও তাই। ব্রেনের উন্নতি আছে, জ্ঞানের আছে, দেহের নয়। দেহ সুশ্রী হয়েছে। যদি বাঁদর থেকে মানুষ হয়েছে তাহলে কিছু বাঁদর রয়ে গেল কেন ? প্রথম সবই ঝাঁকে ঝাঁকে এল তারপর ধারায় ঘুরে গেল। এক এক ঝাঁকে সব সৃষ্টি হয়েছে। কোথাও কোন জলাশয়ে বা ডাঙায় বা বনে পাহাড়ে দেখা গেল কি সব যেন কিলবিল করছে। তা ধীরে ধীরে প্রমাণ আকার নিল। মানুষের জন্ম হল।

সেই আদি খোল—একটা যেন আগুনের গোলাকার পিণ্ড, তার থেকে ধারায় ধারায় 'ভেপার' বেরোচ্ছে। যে রকম যে রকম ঝাঁকে 'ভেপার', সেইরকম সৃষ্টি। প্রথম যখন মানুষটা এল, কি করে এল—ঐ তারপর তারপর তারপর তারপর করতে করতে যেয়ে আমি ঐ একেবারে তারপর দাঁড়িয়ে যাব!

প্রসাদ—তাহলে আদি যে খোলটা সেটা আর কিছুই নয় একটা 'ভেপার'। এই যা রহস্য যে, এখন যদি সেই 'ভেপার'কে পুরুষের ঔরস মারফৎ নারীর গর্ভে ধারণ করতে হয়, তবে সেই 'ভেপার' তখন

আপনা ইচ্ছায় রূপ নিয়ে বেড়ে উঠল কি করে?

মা-মহাজ্ঞান—সেই অগ্নিকুণ্ডই সবের সৃষ্টির মূল। আদি-জঠর। বিভিন্ন ধারায় সৃষ্টি ভাগ হয়ে গেল। এক এক ঝাঁকে এক এক কালে পড়ে যায় এবং বড় হতে থাকে। খাদ্য খুঁজে নিয়ে জীবন সংগ্রামে টিকে গেলে—ধারায় ধারা বয়ে চলেছে। আজো আসার কামাই নেই।

আর একটা কথা, জড়ের সৃষ্টি নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাবার নেই, কিন্তু এমন এক জায়গায় ভাগ করা যায়, যার উপরে প্রাণের সৃষ্টি একমাত্র পুরুষের ঔরস ও নারীর গর্ভ ছাড়া সম্ভব নয়। কিন্তু তার নীচে—পোকা-মাকড় কীট-পতঙ্গের মধ্যে দেখবে তাদের দু উপায়ে সৃষ্টি হয়—এক নারী পুরুষের সংগমে আর এক আপন ইচ্ছায়।

চালে পোকা জন্মায় কি করে? খাবার-দাবারেও যেমন, গুয়ের মধ্যেও তেমনি, বিভিন্ন প্রাণের আপনা ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়। উন্নত প্রাণের সৃষ্টি বড় বলেই ঐভাবে ঘুরে গেল, আর এদের সৃষ্টির দু উপায়েই বজায় থাকতে পারে তাই দু উপায়েই চলছে।

হাঁস মুরগীর বাওয়া ডিম সে সম্বন্ধে তোমরা সকলেই জান। এমন কি মানুষের মধ্যেও অনেক নারীকে দেখতে পাবে—রক্তের ঢেলা ভাঙা। অবশ্য সব ক্ষেত্রে নারীর নয়—একক্ষেত্রে রোগ অন্যত্র তা তেজ। ভিতরের উত্তেজনাই এই ঢেলা সৃষ্টি করে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে একটা বিশেষ অবস্থা, পরিস্থিতি চাপ ও তাপ দরকার একটা বিশেষ ভেপার সৃষ্টি করার জন্য। চালের ড্রামের পোকার সঙ্গে গুয়ের পোকার মিল নেই। আবার ভিজা চালের পোকা পুরানো চালের পোকা একরকম নয়। ঠিক আদিতে যখন এক ঝাঁকে মানুষ জন্ম নিয়েছিল, তখন মানুষ সৃষ্টির জন্য পরিস্থিতি ও ভেপার ছিল, তারপর ভেপার বলে—আর সে পরিস্থিতি নেই। আবার বলতে পার—সেই আদি 'ভেপার'ই নেই।

প্রসাদ—সৃষ্টির গোড়ায় কি ছিল মা সে তুমিই জান কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগে পাওয়া গেছে অতিকায় সব জীব-জন্তু ও বিরাট-দেহী মানুষ। অনেক অনেক জীব-জন্তু বর্তমানে আর দেখতেই পাওয়া যায় না। মানুষের আকারই বা ছোট হয়ে যাচ্ছে কেন?

মা-মহাজ্ঞান—সেই একই 'ভেপার' আজো চলছে। তফাৎ এই যে ঘনত্ব পাতলা হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবী সেইরকমই। জড়ের চলছে

প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুন ওলটপালট। কিন্তু দিনে দিনে প্রাণের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। তাই 'ভেপারের' ঘনত্ব গাঢ় থাকা সম্ভব হয় নি। এক গ্লাস জলে দশ চামচ চিনি দিয়ে যে মিষ্টি হয় তার স্বাদ নিলে। এবার সেই শরবত-এ আরো এক গ্লাস জল ঢেলে দিলে। সে এক-কম মিষ্টি। এবার সেই সবটুকুতে আরো পাঁচ গ্লাস জল ঢেলে দিলে। একেবারেই পানসে বা বেস্বাদ দাঁড়িয়ে গেল।

যে যুগের কথা বলছিস সে যুগে যদি লক্ষ প্রাণের সৃষ্টি হয়েছিল আজ সে জায়গায় চিন্তা করে দেখ, কোটি কোটি অসংখ্য। তাহলে সেই ভেপার এতগুলোর মধ্যে ভাগ হলে তো আকার ছোট হয়ে আসবেই।

সেই যুগে ভেপারের যে ঘনত্বের জন্য অতিকায় প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছিল, তারা কোন এক সময় (যখন যে গেছে) যখন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তারপর ভেপারের সে ঘনত্ব আর কৈ যে তারা আবার আপনা ইচ্ছায় সৃষ্টি হবে! তাছাড়া আগেই বলেছি—ঝাঁকে ঝাঁকে যা সৃষ্টি হবার হয়ে যায়, তারপর ধারা ধরে চলে।

'ভেপারের ঘনত্বের উপর শুধু কি রূপ চেহারার অদল-বদল হয়েছে, রং-ও পাল্টে গেছে। লক্ষ্য করে দেখবি দিনে দিনে মানুষের গায়ের রং কিভাবে বদলাচ্ছে। আগে চামড়া কালোই ছিল। এখন কালো চামড়ার লোক খুব কম।

আফ্রিকার লোকদের কথা তুলতে মা বলেন—'দেখবি ওখানে গরম বেশী এবং বন জঙ্গলে ঘেরা দেশ, লোকজনও তুলনায় নিশ্চয় কম। এবার সব কেটে ছেঁটে ঘর-বাড়ি তুলে লোকজন বাস করতে শুরু করুক, দেখবি, রং রূপ বদলাতে শুরু করবে। দেখবি যা, পাল্টাচ্ছেও। 'ভেপারে'র সেই একই অবস্থা কোথাও স্থায়ী ভাবে বজায় থাকতে পারে না।'

মা-মহাজ্ঞান—কত মনুমেন্টের উপরে সে যে তার ঠিক নেই। একটা ধারণায় আনবার জন্যে আমি এই মনুমেন্টের কথা বলছি। আচ্ছা সেইখানে হঠাৎ দেখা গেল কি রকম একটা জিনিস। মানে কেউ যেন তার উপরে রয়েছে। কেউ যেন রয়েছে, অনুমান। সেখানে মনে হল একটা কি রকম জিনিস ঝট করে নিয়ে ফেলে

দিল। ফেলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা আকার ধারণ করল সে।

ফেলল কোথায় তা দেখতে পেলাম। আচ্ছা কিরকম ফেলল? না, একবারে অসংখ্য কাঁটা-তার, তার-কাঁটা—তার ভিতরে ছোট ছোট নানা রকমের হাবিজাবি ফুল, দু' একটা ভাল ফুলও হয়তো রয়েছে, ঘাস-'ই' সে, তার ভিতরে। পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি দেখলাম আমি নিজেই। আমি তখন হাকাচাকা খেয়ে বললাম—"আমি কোথায়, আমি কোথায়?" তখনই বলল—ঐ উঁচু থেকে। তখন যেন মনে হচ্ছে একটা রশ্মি আমার কাছে পড়ে গেল—'তুমি আমারই কাছে'।

'তুমি আমারই কাছে।' তখন আমি ভাবলাম,—আমি আর উঁচুতে চেয়ে কোন 'এ' পাচ্ছি না। ঐ রশ্মিটা ধরে—রশ্মিটা যতদূর যাচ্ছে এরকম ধরে, দেখে আমার আর চোখের নাগাল কুলাচ্ছে না। তখন চারদিকটা গোল করে ঐ বেড়াটা দেখিয়ে দিল। দিয়ে বলল—এবার তুমি চোখ বুজাও তো। চোখ বুজালেই দেখতে পাবে। এ্যাঁ, আমি চোখ বুজালাম।

চোখ বোজানোর আগেই বলছে—দেখ তো এই গোলটা চারদিকে। এই গোলটা চারদিক দেখেই, একটা জায়গায় দেখছি—এই রকম গোলটা—এরকম একটা জায়গায় কোণাটির একটা জায়গাতে যেন মনে হচ্ছে—একটা ছোট এতটুকু দরজা রয়েছে। ছোট একটা দরজা রয়েছে।

আচ্ছা চোখ বুজাও তো এইবার। এই কথাগুলো যেন সেই রশ্মি থেকে পাচ্ছি আমি। চোখ বুজালাম। যেই চোখ বুজালাম ব্যস তারপরে আমি আর কিছু জানি না। আমি আর কোনটাই জানি নি। একবারে জানি না জানি না জানি না চলছে চলছে চলছে—আচ্ছা একবারে এই বয়সে এসে একটা দৈববাণী হল—ডাক। তখন আমার বয়স তের বছর।

হঠাৎ এই তেরো বছরে একটা ডাক, এই ডাকটা চলছে ডাকের সময় অনেক কথাই তোমাদের বলে রেখেছি, বলেছি। এ কথা জান। সেইটা বেশ কিছুদিন—বছর পাঁচ সাতেক, কি বছর দশেক কাটার পর, ঐ জিনিসটা ঘুরিয়ে—ঐ যেদিনই ঐ গোলাকার অগ্নিপিণ্ডটা দেখলাম—যেদিন তার থেকে লেখা বেরিয়ে বেরিয়ে আসতে রইল।

ঐ তারই দু'একদিন আগে—'এটা কি তোমার মনে পড়ে? মনে পড়ছে কি?' তার আগে অনেক হয়ে গেছে। এই জিনিসটা।

এই তা থেকেই আমি ধীরে ধীরে সৃষ্টিকে উপলব্ধি করতে রইলাম। তাহলে যে যার সে তার।

এবার বিচারে দেখে নিলাম, ঐ বেড়াটা কি? ঐ তার বাঁটার বেড়াটা কি? মানুষের স্নায়ু, শিরা। তার ভেতরটা কি? আগে বেড়াটা—বন্ধন। সমস্ত মানুষের শিরা স্নায়ু ইত্যাদি নিয়ে কাঠামো বন্ধন। কাঠামোর ভিতরে ঐ যে নানা জাতের ফুলগুলো, ওগুলো মানুষের এক একটা রিপু। ফুল, আচ্ছা সেখানেই আসতে হয়েছে। গর্ভ। এটা গর্ভ......

কোন এক সময় যেয়ে একটা ঝাঁক সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন করে আজ আমি এসেছি ধরায়। যেমন করে আমি ধরায় এসেছি। আমার কি কোন বাপ মায়ের জিনিস এটা। কারো কোন জিনিসের পাওয়া কি আমার এটা? এ্যাঁ?

আচ্ছা আবার হঠাৎ একদিন বেশ কিছুকাল পরে একদিন আশেপাশের লোক আমাকে দীক্ষা নেওয়ার একটা খুব ব্যবস্থা করল। আবার এক দৈববাণী হলো—"দীক্ষা! কে তোমায় দীক্ষা দিবে? যে তোমায় দীক্ষা দিতে এসেছে, তাকে দীক্ষা নেওয়ার জন্যে তৈরি হতে বল গে যাও।" সেই আবার দৈববাণী হলো। আবারও শুনিয়ে যাচ্ছি। তাহলে পরে আমি তো দীক্ষা নিই নি। দীক্ষার আশ্রয়ে শিক্ষার আশ্রয়ে—কোন কিছুর আশ্রয়ে কি আমার এই জিনিসটা? কোন কিছুর আশ্রয়ে নয়। আমি বেশই বুঝি জিনিসটা আমার মধ্যে। সেই পাওয়ারকে আমি বুঝি। পাওয়ার সেটা একটা। সেইরকমই পাওয়ারে মানুষের সৃষ্টি হচ্ছে। সেইরকমই পাওয়ারে পশুর সৃষ্টি হচ্ছে, ঝাঁকে ঝাঁকে। কেউ কার থেকে হচ্ছে তা নয়। তা আমি পাই নি। ঐখান থেকেই আমি উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি।

চেষ্টা মানে, উপলব্ধি আমি করে—চেষ্টা কোন করিনি। এ কথা অতি সত্য। কোন চেষ্টাই করিনি। আমি আমার চোখ বুজিয়ে বা আমি চেয়ে চেয়েই বা আমি গল্প করতে করতেই আমি সেই জিনিসটা বুঝতে বা দেখতে সবই পাই।

প্রসাদ—আপনার জন্ম রহস্যের সঙ্গে—মা, এই স্বাভাবিক সৃষ্টিকে আপনি মিলিয়ে দিচ্ছেন কেন ?

মা-মহাজ্ঞান—কেন স্বাভাবিক সৃষ্টিকে বলছ ? একটা বিরাট কিছু পাওয়ার তো একটা ? সেই পাওয়ারটা পৃথিবীকে দিতে আসা হয়েছে। কেন ? পৃথিবী এমন কিছু একটা অবস্থায় দাঁড়িয়েছে বা দাঁড়াচ্ছে যে, যাতে এবার এটা দরকার। এই জিনিসটার এবার দরকার। আজ থেকে যদি একে ছড়ানো যায় তাহলে একশো বছর পরে কি দুশো বছর পরে কি পাঁচশো বছর পরে এর উন্নতিটা দেখা যাবে।

তেমনি করেই যেদিন মানুষ সৃষ্টি হয়েছিল সেদিন এই রকম করেই একটা পাওয়ারের দরকার হয়েছিল। একটা পাওয়ারের দরকার হয়েছিল। গাছ পালা ঘাস এই সব পাওয়ারে। তারা পাওয়ারেই এসেছিল। সব পাওয়ার জানবে। এক একটা পাওয়ারে তারা এসেছে এক একটা ঝাঁকে। তারপর উন্নত জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল মানুষ। মানুষ পাওয়ারটা নিল, এবার মানুষকে উন্নত করতে করতে মানুষের ব্রেন উন্নতি হতে হতে হতে এই পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে এসে। এখন মানুষের দেখ প্রকাশ বিকাশ যা, আর খুব আগেকার যুগে যেয়ে মানুষকে দেখ কোন মিল নেই। এখনের মানুষের সঙ্গে তখনের মানুষ। বলবে —সেগুলোই তো বনমানুষ। যারা কাঁচা মাংস খেত, যারা গাছের বাকল পরত ইত্যাদি। এখন সেগুলোকে বনমানুষ বলবে।

তাহলে এখন মানুষ উন্নত। কিন্তু উন্নত হয়ে মানুষ আবার অবনতির দিকে রাস্তা নিচ্ছে। সেই অবনতিটা না করতে দিয়ে এই উন্নতিটাকেই রাখা হবে। শান্ত করে দেওয়া হচ্ছে।

তাহলে বিরাট একটা পাওয়ারের দরকার। সেটা বিরাট পাওয়ার দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তাহলে আমার উপলব্ধিতে তো আমি পাচ্ছি না, রূপান্তরিত।

সৃষ্টির পর থেকে এক এটা পাওয়া যাচ্ছে। প্রথম কুমীরটা যেদিন সৃষ্টি হয়েছিল, সেদিন কি সেই তার বাচ্চা থেকে হয়েছিল ? কোথায় বাচ্চা, কোথায় কি ? তাহলে একদিনেই এসেছিল। হঠাৎ একটা কিছু ভেপারে তার জন্ম হয়ে যায়। হয়ে যেয়ে—সেই জন্যেই বলছে—যে বাঁচার হবে সে ঠিকই বাঁচবে, যে মরার হবে সে ঠিকই মরবে। তাহলে

সে বাঁচল কি করে ? সে বাঁচল কি করে ?

আচ্ছা দেখ, এখন তোমরা কুমীরের বাচ্চা দেখতে পাও ? তাহলে সংগম। সংগমের ব্যবস্থা হল। তাহলে একটা নারী একটা পুরুষ জন্মাল। একটার মধ্যে পুরুষালী শক্তি জন্মালো, একটার মধ্যে নারীর শক্তি উদ্ভব হল। একটার মধ্যে পুরুষের আকার নিল, একটার মধ্যে নারীর আকার নিল। এ্যাঁ। দোয়াতও জন্মালো কলমও জন্মালো। কলম দোয়াত হয়ে যাবে না, দোয়াত কলম হয়ে যাবে না।

তোমাকে দিয়ে কাজ করাব।

প্রসাদ—বহুদিনের ইচ্ছা।

মা-মহাজ্ঞান—বহুদিনের ইচ্ছা। তাহলে বহুদিন ধরে, তাহলে উন্নত করতে করতে করতে এমন একটা জায়গায় এসেছে যে এইটা হলে এবারে পূর্ণ হবে। এটা হলে পূর্ণ হবে, মুনি ঋষি যোগী যে সব ছিল—এই প্রথম এই শেষ। (অর্থাৎ সব নিয়ে বিচার করে।) এটা যা দিয়ে যাওয়া হচ্ছে এর পরে আর কেউ এসে আবার নূতন কিছু বলবে, এ পর্যন্ত তা আমি কিছু পেলাম না। এবং আমিই যে আবার ফিরে আসব, তাও আমি বলে যাচ্ছি না। সেটাও আমার উপলব্ধিতে কোথাও পড়ে না।

কেন ? না, আমাকে যারা চিন্তা করবে খুব বেশী, আমার ভাবরূপ হয়তো কিছু পাবে কিন্তু আমার আদি কেউ পাবে না।

প্রথম সৃষ্টিটাই আসমানে হয়ে যায়। তারপর তার বীজ ছড়ায়। যে কোন জীবেরই প্রথম সৃষ্টিটা আপনা থেকে হয়ে যায়। তারপরে কিন্তু, সেই সৃষ্টিটা হয়ে যাবার পরে, তারই ফল ফুল বীজ—এই চলতে রইল।

আসমান সৃষ্টিটা হচ্ছে। সংগমের মধ্যে যে সৃষ্টিটা, তা নয়। প্রথম সেই ভেপারটাই এসে চালের উপর পড়ল। সেই চালে পড়তেই একটা চাল আর একটা চালকে জড়িয়ে ধরল। জড়িয়ে ধরতে একটা উত্তাপ এল। উত্তাপ আসতেই তাদের নড়ন চড়ন শক্তি এল। মনে কর মাটির তলা, এমন একটা ভেপার আসল তার ভিতর একটা ফল ধরল, ফলটা রূপ নিল।

প্রথম সৃষ্টিটা কিন্তু আসমান থেকেই হয়েছে।

পৃথিবীতে চেয়ে দেখবে, যা কখনো জানি না, দেখিনি সেটা কি

করে হল। যা কখনো জানিনি দেখিনি সেটা সৃষ্টি হচ্ছে কি করে? তেমনি করে মানুষেরও সৃষ্টি হয়েছে। মানুষটার বেলায় এত এ করছ কেন? হাতীর সৃষ্টি হল কি করে?

প্রসাদ—বড় জীব বলেই তো এত প্রশ্ন।

মা-মহাজ্ঞান—ও বড়টার বেলায়ই তোমরা এত প্রশ্ন করছ। ক্ষুদের দিকে ঐ যে।

ক্ষুদ্র সমস্যা নাহি যার,
কি হবে উপায় তার?

আচ্ছা হাতীর সৃষ্টিটা মানুষের চাইতেও তো বড়। তাহলে তার সৃষ্টিটা হল কি করে? কোথা থেকে কিসে রূপান্তরিত হল বল?

প্রসাদ—সৃষ্টি রহস্য ভেদ। তাহলে সৃষ্টিতে যা রহস্যময়, তাকে তুমি ভেদ করেছ। সেই কারণে এ পুস্তকের নামকরণ করেছেন—সৃষ্টি রহস্য ভেদ। তা 'রহস্য' কথাটা কেন? রহস্য বলতে আমরা কি বুঝি?

মা-মহাজ্ঞান—মানে কি ধরনের একটা রহস্যজনক খেল। সেই খেলকে কোন ধরার মধ্যে—আয়ত্তের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে না। সেই-খানেই রহস্য। আসা যাওয়াটা যেন কারো হাতেরই নয়। এই এই কারণ হলে আসবে এই এই কারণ হলে যাবে। এই কতকগুলো কারণ! অথচ সেই সেই কারণগুলোকে ধরতে গেলে আর পাওয়া যাচ্ছে না। সব সময় যে সেই কারণেই সেই জিনিসটা হচ্ছে, তা নয়। সেইখানে সেই তেজ কম আছে। সেই জিনিসটা হলেই যে এসে যাচ্ছে, তা নয়। সেখানে তার শক্তি বেশী আছে। উঁ?

কি ধারায় প্রকৃতির কিরকম ধরনের খেলা—এ যেন কোন হদিশ বার করতে পারা যাচ্ছে না। এইজন্যই রহস্যময় বলছি। সেইটাকেই ভেদ করে দেখা যাচ্ছে যে, এর মধ্যে আর কিছুই নেই। কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না, এটা একটা প্রকৃতির নিয়ম হিসাবে আসা যাওয়া চলছে। সেই প্রকৃতির নিয়মকে ধরে যখন বলা যাচ্ছে, এর উপরওয়ালা কেউ আছে কি, এ্যাঁ, তখনই বলা—আছে হয়ত। ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। পরম ব্রহ্ম যাকে বলে। আচ্ছা সেই মহান শক্তি কিছু একটা অনুভব করা যাচ্ছে। সেই শক্তি কোন ধর্তব্যের মধ্যে নয়। যে প্রকৃতির

দ্বারাতে সৃষ্টিটা হচ্ছে সে প্রকৃতি সে তেজ পাচ্ছে কোথা থেকে ? প্রকৃতি সেই তেজটা পাচ্ছে কোথায় ? যার দ্বারাতে চলে যাচ্ছে, সেই বা চলে যাচ্ছে কি করে ? নিস্তেজই বা হচ্ছে কি করে ? তেজ আসছে কি করে, নিস্তেঁজই হচ্ছে কি করে।

এ সবগুলোকে চিন্তা করে দেখতে গেলে মনে হচ্ছে—হ্যাঁ, একটা কিছু আছে। সেই একটা কি ? তাকে আমরা নাম দিচ্ছি ভগবান। কখনো নাম দিচ্ছি নিরাকার ঈশ্বর। কখনো বলছি না, ঈশ্বরই সে। এইরকম। তাহলে সবের মূলে টেনে-টুনে বলতে গেলে দেখা যাচ্ছে যে, একটা কিছু শক্তি বটে। একটা কিছু শক্তি বটে। সেই শক্তিটা আবার কি ? না সেইটাই উপলব্ধি করে আমি যা পেয়েছি, সেটি একটি গোলাকার অগ্নিপিণ্ড। আর কিছু নয়। শুধু তাপ তার। আর কিছু পেলাম না সেখানে। কোন আকারও পায়নি। কিছুই পাই নি। মনে হল কতকগুলো লেখা যেন ভেসে বেরিয়ে এল। সেখান থেকে কিছু কিছু লেখা যেন ভেসে আসছে। কিন্তু সে লেখার যে শেষ আছে তাও দেখলাম না। আর সেটা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল সেটাও দেখলাম না। সে তার ধারাতে যেন—চির অমর সে জিনিসটা রয়েছে। তার কোন ক্ষয় নেই। অক্ষয় জিনিস একটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেইটি ভগবানই বল, ঈশ্বরই বল, নিরাকারই বল, আকারই বল—যাই বল তুমি, বলতে পার। এবার তোমার কল্পনা দিয়ে তুমি তৈরি করে এক একটা রূপ দিচ্ছ। কিন্তু সে কোন ধরা-ছোঁয়ার বস্তু নয়।

কেবলমাত্র এইটুকুনই বলে যাচ্ছি যে, আমি তাকে চাক্ষুষ উপলব্ধিব চোখে দেখেছি। কিন্তু তাও যেদিন দেখেছি বারে বারে দেখেছি, তাও নয়। কিন্তু সেই দেখার পরে আমার নিজের ভিতরে আমি একটা কিছু অনুভব করতে পারি। বুঝতে পারি, একটা জিনিস আছে!

প্রসাদ—সেই 'একটা' কি জিনিস ? তা কি শক্তি, না জ্ঞান ?

মা-মহাজ্ঞান—না, শক্তি বলে নয়, সেটা একটা জ্ঞান বলে বুঝতে পারি। আচ্ছা তার সঙ্গে যে শক্তি নেই, তা নয়। কিন্তু জ্ঞানটাই বড় পাই ওখানে। শক্তিটা হাল্কা পাই। কেন ? জ্ঞানটা ক্রিয়া করে যত শক্তিটা ক্রিয়া করে না তত। এমনই মনে হয় যে, জ্ঞানেতে ওটা বুঝতে পারছি, কৈ শক্তি তো নেই ? আগাতে তো পারছি না।

আগাতে পারি না।

আচ্ছা সেখানে আর একটা জিনিস বুঝতে পারি যে, এটা হচ্ছে খোলের ধর্ম। খোল যে আতঙ্ক, ভয়, আনন্দ বহন করতে এসেছে, তার দ্বারাতে এখানে জ্ঞানকে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। এগুলো হচ্ছে আর কিছু নয়, খোলের আতঙ্ক। মায়া, আচ্ছন্ন। মায়াতে যে খোলকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তার জন্যই ভয়টা আসছে।—তাই তো এটা কি হবে, তাই তো ওটা কি হবে? তাই তো কি হল, তাই তো কেন হবে? নিগূঢ়ভাবে ভবিতব্যকে একটা কিছু বুঝতে পেরেও যেন ঠিক ঠিক জায়গায় প্রয়োগ করতে পারিনি। তার কারণ? না, সেটা হচ্ছে খোলের ধর্ম, মমতা, ভয়, লজ্জা, ঘৃণা, পরিস্থিতি, পরিবেশ তারপর আতঙ্ক। নানা কারণে তাকে ব্যক্ত করতে পারিনি।

হয়তো আমি ঠিকটা বলে দিলাম। আমার ঠিক বলার সঙ্গে সে ঠিক তো তার গ্রহণ করার মতন হয় নি। সে গ্রহণ করবে কি করে! আমি তো ঠিকটা বলে দিচ্ছি। আমার ঠিকটা না বললে তো সে গ্রহণ করতে পারবে না। সে গ্রহণ করতে না পারলেই বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। অতএব তার মন কি চাচ্ছে কি বলছে সেইরকম বুঝে যদি বলি। তাও তো তার মনোগত হয়ে যাচ্ছে। সেটাও তো বলতে পারি নি। তাও তো বলতে পারিনি। তখনই সেই আমতা আমতা ভাবটা চলে আসে। তখনই আমতা আমতা করে বলতে হয়। এই এটা হতে পারে। এটা হবে, সেটা হতে পারে, সেটা হবে, এইরকম।

যেখানে জানি যে এ জ্ঞান আমার নিরেট ভাবে তার কাছে চলে যাক, এই নিয়ে সে বিক্ষিপ্ত হবে না, সে রাস্তা পাবে, সেখানে সেই বাণী উপচে পড়ে। তা ছাড়া সর্বত্র বলতে পারি না। সর্বত্র বলতে যেয়ে আটকায়, সেটা খোলের ধর্ম, সমাজকে লক্ষ্য করতে হয়, পরিস্থিতিকে লক্ষ্য করতে হয়, অবস্থাকে লক্ষ্য করতে হয়, মায়াকে লক্ষ্য করতে হয়। সবরকম দিক দিয়ে—

সমাজকে ঠিক ঠিক ভাবে লক্ষ্য করতে পারব না। ঠিক ঠিক লক্ষ্য করতে পারছি না কিন্তু। লক্ষ্য করে যাচ্ছি একটা মোটামুটি। আচ্ছা, নিখুঁত করে যদি সমাজকে লক্ষ্য করতে যাই, তাহলে এ জিনিস ব্যক্ত হয় না। অতএব সবের মধ্যে একটা সমন্বয়ের চেষ্টা করছি। সমন্বয় ভাবটা সব সময় নিয়ে আসতে চাচ্ছি। সমাজকে যদি আমি দারুণ-

ভাবে এড়িয়ে যাই তাহলেও বাঁচতে পারি না। আর সমাজকে নিয়ে যদি খুব বেশী মাখামাখি করি তাহলেও এ ব্যক্ত হয় না। এই দু'য়ের মাঝখানে আমাকে সবসময় চলতে হচ্ছে। এটা হচ্ছে খোলের ধর্ম। যেখানে উচিত বলা সেখানে বলছি। সেখানে ঠিকই বলে যাচ্ছি।

তবে এখন পাঁচটা কথা জিজ্ঞেস করলে না আমি আটকে যাই। জিজ্ঞেস করলে আটকে যাই লক্ষ্য করবে। আমি নিজেই বুঝতে পারি। কি জানি কি বলেছি! আবার কি জিজ্ঞাসা করছিস্। আবার কি নূতন করে বলব! নূতন করে আর কিছু বলার তো নেই। এগুলোকে আর ফেনানোর কি আছে!

প্রসাদ—কেন, আপনার এটা মনে হয় না গুরুদেব—জানা জিনিস জানতে আসছি না? আমরা পড়ে যেখানে বুঝতে পারছি না, অজানা—

মা-মহাজ্ঞান—না এই রকম পড়তে গেলেই মনে হবে বুঝতে পারছি না। কিছু কিছু জায়গায় হয়তো ভেঙে দিলাম। কিন্তু ভাঙতে গিয়ে যদি আরো বেশী বলা হয়ে যায়? তাহলে তো আরো গুলিয়ে যাবে। বা ভাঙতে গিয়ে যদি কম বলা হয়ে যায়?

প্রসাদ—না, গুলিয়ে যাবে কেন বলছেন মা?

মা-মহাজ্ঞান—তোমার গুলিয়ে যাবে না?

প্রসাদ—কেন, একটা সূত্রকে ব্যাখ্যা করলে সূত্রটা বুঝতে সুবিধা হয় তো।

মা-মহাজ্ঞান—সূত্রটা ব্যাখ্যা করতে যেয়ে হয়তো অনেক বেরিয়ে গেল। তার আবার ব্যাখ্যা কর। যখন বলার কমতি হয়ে যাবে, তখন তো তোমার সেই মনটা আমি বুঝতে পারি, তখন ঝট্ করে তোমার মনে হবে—'এ কি সমন্বয় পাচ্ছি না যে কথাটায়? তাহলে, এটা কেন বলল ওটা কেন বলল? লেখা নেই তো! ভুল বলছে না কি?' —এই যে একটা সন্দেহজনক মন এসে গেল, এই সন্দেহের মনে তুমি পিছিয়ে যাবে। আগাতে আর পারবে না। সেইজন্যে একটু চিন্তা করে আমাকে বলতে হবে। বলি, বলবও, তবে চিন্তা করে বলতে হবে।

আমি যা বলে দিয়েছি তা ঠিক বলেছি, ভুল কোথ্থাও বলিনি।

—